প্রথম প্রকাশ : অগাস্ট ১৯৭২

প্রকাশ করেছেন :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা/১
বাংলাদেশ ।

প্রচ্ছদ এঁকেছেন :
সৈয়দ ইকবাল

ছেপেছেন :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা/১
বাংলাদেশ ।

মূল্য/ষোল টাকা ।

ভূমিকা

কিছুদিন আগে একটি ফরাসী কবিতা পড়ার সুযোগ হয়েছিল---ইংরেজী অনুবাদে। কবিতাটির শুরু অনেকটা এরকম :

'পিকাসো একটি আপেলের ছবি আঁকার চেষ্টা করছেন। আপেলটি রয়েছে একটি টেবিলের ওপর, পিকাসো তুলির টানে আপেলটিকে ক্যানভাসের ওপর ফুটিয়ে তুলতে চান। কিন্তু আপেলটি তার রক্তিম অনিন্দ্য অবয়ব নিয়ে এমন অনুপম হয়ে ফুটে রয়েছে যে কিছুতেই তিনি তাঁর তুলির টানে আপেলটির সেই অনুপম রক্তিমতাকে ক্যানভাসের বুকে তুলে আনতে পারছেন না। অস্বস্ত, অনিশ্চিত ও দ্বিধান্বিত তুলির আঁচড়ে তিনি ক্লান্তিহীন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই বলা যায়, পিকাসো আপেলটির সংগে নিয়োজিত রয়েছেন এক অসম উদ্ধাররশ্মিত যুদ্ধে।'

বলা বাহুল্য, এই যুদ্ধ শুধু পিকাসোর সংগে তাঁর আপেলের নয়, প্রতিটি শিল্পীর সংগে তাঁর আরাধ্য ঈপ্সিতের। একজন প্রকৃত শিল্পীর প্রধান বিপত্তিই এখানে যে, যে বিষয়কে তিনি শিল্পে প্রকাশ করবেন তা তাঁর চেতনায় ধরা পড়ে পৃথিবীতে প্রথমবারের মত। প্রথম অনুভবের মুহূর্তে বিষয়টি তাঁর কাছে এমন অপরিচিত ও নতুন ঠেকে যে তিনি অনুভব করেন শিল্প রচনার কোনো পরিচিত বা গতানুগতিক পথেই ঐ বিষয়টিকে শিল্পে রূপায়িত করা সম্ভব নয়। তিনি টের পান ঐ সম্পূর্ণ অজানা ও অভাবিত বিষয়টিকে কবিতায় ফোটাতে হলে তাঁকে এগোতে হবে শিল্পের এক সম্পূর্ণ পদচিহ্নহীন অপরিচিত রাস্তায়—এমন অপরিজ্ঞাত রেখায় সুরে শব্দে ছন্দে ঐ বিষয়টিকে রূপায়িত করতে হবে যা তাঁর চারপাশের সবার কাছেও সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অজানা। কাজেই একজন প্রকৃত শিল্পীর পথ হয়ে দাঁড়ায় রীতিমত সংগ্রাম-বহুল, তাঁর চারপাশের সাধারণ বিত্তহীন অসংখ্য ভেদাভেদরহিত শিল্পীর সহজ পরিচিত গতানুগতিক পথ থেকে আলাদা, সাফল্যের মসৃণ-সম্ভাবনা-প্রত্যাখ্যাত, স্বেদবহুল ও দুরূহ—চেষ্টা শ্রম ও অধ্যবসায়ে গ্রস্ত ও কন্টকাকীর্ণ। আর তাই তাঁর প্রতিটি শিল্পকর্মের শরীরেই প্রয়াস ও পরিশ্রমের এই নিশ্চিত স্বেদচিহ্ন, সংগ্রাম ও রক্তক্ষরণের এই ক্লিষ্টতা কমবেশী থেকে যায়ই। প্রতিভার পরিণতির সাথে তার শিল্প-অবয়ব তুলনামূলকভাবে নিটোল, মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই। কিন্তু, তবু বাইরের ঐ আপাত-পরিতৃপ্তি ও নির্লিপ্ততার ভিতর থেকে অন্তরের প্রচণ্ড অশান্তি ও রক্তক্ষরণ কারো চোখ এড়াবে না। বিশেষ করে একজন শিল্পী যখন থাকেন তাঁর শিল্পপ্রয়াসের সূচনাপর্বে, শিল্পীসত্তার গঠনের প্রাথমিক যুগে, যখন তাঁর চারপাশের গতানুগতিক ও প্রথাগত শিল্পের ভ্যাপসা ভিড়ের ভিতর থেকে নিজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট ও স্বকীয়তা নিয়ে জেগে উঠতে থাকেন চেষ্টা ও শ্রমের কঠিন ও নিরাপোষ অগ্রযাত্রায়, কিংবা এগিয়ে যান নিজেরই পুরোনো পরিচিত ধারা থেকে নবতর কোনো অভাবিত উত্তরণে,

সে সব ক্ষেত্রে তাঁর শিল্প শরীরে ঐ সময়ের সংগ্রাম ও প্রয়াসের চিহ্ন কমবেশী ধরা পড়বেই। একজন বিত্তহীন শিল্পীকে এরকম কোনো অনিশ্চিত সমুদ্রের দুঃসাধ্য বিপদসংকুলতায় ভেলা ভাসাতে হয় না। কোনো অভাবিত দুর্লংঘতার দ্বারা বিপ্রস্ত হবার সৌভাগ্যও তাই তাঁর নেই। ফলে তাঁর শিল্প প্রয়াসের ভিতরে সংগ্রামের এই প্রচণ্ডতা, বহুমুখিতা ও তীব্রতা স্বাভাবিকভাবেই কমে আসে। আর ঐ সব ব্যর্থতা, প্রয়াস ও যন্ত্রণা থেকে অনায়াসে বেঁচে যান বলে তিনি শেষ পর্যন্ত যে শিল্পের জন্ম দেন তা আলোহীন, প্রতিভাহীন এক ধরনেব জোলো নিরাপদ ও গৃহপালিত পদার্থ।

হয়ত এজন্যেই একজন অ-শিল্পী যত তাড়াতাড়ি শিল্পেব ঈপ্সিত মসৃণতা ও নিটোলতা খুঁজে পান (অথবা আরো সঠিকভাবে বললে: খুঁজে পান বলে আপাতভাবে মনে হয়), একজন প্রকৃত শিল্পী তা পান না। রুক্ষ, বন্ধুর ও অনিশ্চিত পদযাত্রায় তাঁর শিল্পশবীর অনেক বেশি প্রয়াস-কঠিন ও ক্ষতবিক্ষত। একজন প্রতিভাহীন সমালোচক—যিনি শিল্পেব এই অনিবার্য সংগ্রাম সম্বন্ধে অজ্ঞান—নিশ্চিতভাবেই একজন জাতশিল্পীর এই আপাত বন্ধুরতাকে বুঝে উঠতে পারবেন না, বরং তাঁব কাছে একে শিল্পেব স্বাভাবিকতাব ওপব দুঃশীল বলৎকাবই মনে হবে। শিল্পের এই বন্ধুরতাকে তাঁব কাছে মনে হবে অর্থহীন, অকাবণ, প্রতিভাবিবোধী, উদ্ভট ও অস্বাভাবিক। অন্তত অমনটাই মনে হয়েছে বশীব আল-হেলালের কাছে আবদুল মান্নান সৈয়দ ও ষাটের দশকের অমসৃণ গদ্যযাত্রাকে, যখন 'ছায়ানট' সংকলিত 'মুক্ত করো হে বন্ধ' প্রবন্ধগ্রন্থের আলোচনায় ঐ 'কন্টকিত' গদ্যপ্রবণতাকে সার্বিকভাবে আক্রমণ কবে তিনি ঐ গদ্যের পরিবর্তে 'স্বাভাবিক' ও সহজ গদ্য বচনার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর এ আহ্বান আন্তবিক কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা যায় ঐ 'স্বাভাবিক' শব্দটির দ্বারা তিনি অস্থিমজ্জাহীন একধরনের প্রতিভাবর্জিত গদ্যকেই বোঝেন। কথাটা স্পষ্ট হয় যখন ঐ গ্রন্থের মধ্যে স্বাভাবিক গদ্যের উদাহরণ হিসেবে তিনি শুধুমাত্র সন্তোষ গুপ্তের নাম উল্লেখ করেন। জনাব হেলালের ভাষায়: "১৯৪৭ এর পরে বাংলাদেশে এক বিচিত্র গদ্যের সৃষ্টি হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই গদ্যের নমুনা, আমার মনে হয়, আলোচ্য গ্রন্থের এক সন্তোষ গুপ্ত লিখিত প্রবন্ধটি ছাড়া আর সব প্রবন্ধে কমবেশী বর্তমান। সন্তোষ গুপ্ত বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত গদ্যই মোটামুটি ব্যবহার করে থাকেন।" সন্তোষ গুপ্তের ব্যক্তিত্বের প্রতি পুরোপুরি শ্রদ্ধা রেখেও একথা বলতে অসুবিধা নেই যে তাঁর (শ্রীগুপ্তের) গদ্যকে যাঁর কাছে বাংলা আমাদেব সময়ের গদ্যের অনুসরণীয় আদর্শ বলে মনে হয় তিনি নিঃসন্দেহে গদ্যের এক অতি বিত্তহীন আদর্শে বিশ্বাসী এবং এমন সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক যে ঐ ব্যক্তির পক্ষে সমকালীন গদ্য প্রয়াসের অপ্রত্যাশিত নতুনত্ব ও দীপ্ত শক্তিকে, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ছাড়া, অনুধাবন করা আদৌ সম্ভব কি না। শিল্প-প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা যাঁর কাছে রুচিহীন বিদ্রূপের বিষয়, মেধা যাঁর দৃষ্টির অগোচর, তাঁর কাছে একজন নতুনত্ব-সন্ধানী, উদ্ভাবনক্ষম তীব্র ও অগতানুগতিক লেখক কি সহৃদয় লালন প্রত্যাশা করতে পারে? অথবা কি পাবে নতুন জীবনানুভূতিতে অস্থির সেই তরুণ লেখক যিনি দাঁড়িয়েছেন তাঁর নিজের ও পরিপার্শ্বের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনো জটিল নতুন নাম-সংজ্ঞাহীন উপলব্ধির

মুখোমুখি, এবং সেই অস্পষ্ট অস্ফুট অপ্রত্যাশিত বিষয়কে শব্দের অনিশ্চিত বিশৃংখল আঁচড়ে প্রাণপণে ফুটিয়ে তোলার জন্যে অসহায়ভাবে যুঝছেন ?

২.

গত বছর আমার সম্পাদিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'কণ্ঠস্বর'-এর দশম বর্ষে পদার্পণের সমসময়ে একজন কলেজী তরুণ আমাকে এমন একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে গত দশ বছরে আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'কণ্ঠস্বরের' প্রধান অবদান কি বলে আমি মনে করি। কোনো বিশেষ লেখক অথবা লেখকগোষ্ঠী, কবিতার কোনো নতুন ধারা বা চেতনা অথবা অন্যকিছু ? আমি জবাবে জানিয়েছিলাম, 'কণ্ঠস্বরে'র প্রধান অবদান, আমার ধারণায়, এর নতুন ও স্বতন্ত্র গদ্য। আমি বিশ্বাস করি— তাঁকে জানিয়েছিলাম আমি—গত দশ বছরে 'কণ্ঠস্বরে'র পৃষ্ঠায় রচিত হয়েছে এমন এক বিশিষ্ট গদ্যরীতি—যা আজকের তরুণ লেখকদের অনিবার্য ভাষা।

বলা বাহুল্য 'কণ্ঠস্বরে'র গদ্য বলতে আমি ষাটের দশকের গদ্যকেই বুঝিয়েছি। এর কারণ প্রধানত হয়ত এই যে 'কণ্ঠস্বর'-এর পৃষ্ঠাকে আশ্রয় করেই এই গদ্য প্রথম সর্বাঙ্গীন স্পষ্টতা পেয়েছিল।

একথা আশাকরি সবাই মানবেন যে আমাদের সাহিত্যে ষাটের দশকই সম্ভবত সেই সময় যখন গদ্যকে প্রথম শিল্পের মর্যাদা দিয়ে চর্চা করা হয়েছে। অবশ্য এর আগে যে গদ্যকে কেউ শিল্পের মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করেননি এমন নয়। আবদুল হকের মতন লেখকের আদ্যান্ত রচনাই সুন্দর শৈল্পিক গদ্যের উদাহরণ। উন্নত ও পরিশীলিত গদ্য উপহার পেয়েছি মোতাহের হোসেন চৌধুরী সহ কয়েকজন অনন্য প্রবন্ধকারের হাত থেকে। তবু তাঁদের অধিকাংশের গদ্য প্রধানত বক্তব্য প্রকাশের বাহন, নিশ্চিত শিল্পচর্চার মাধ্যম নয়। ষাটের দশকেই প্রথম একটি পরিপূর্ণ লেখকগোষ্ঠী শৈল্পিক গদ্যের চর্চায় সমবেতভাবে নিয়োজিত হয়েছিলেন। ঐ গদ্যে, তাই, স্বাভাবিক কারণেই, শিল্পের উল্লেখিত সংগ্রাম তুলনামূলকভাবে বেশি প্রত্যক্ষ। এই গদ্য প্রতিভাবান, শাণিত, নিরীক্ষাপ্রয়াসী, কবিতাক্রান্ত ও বন্ধুর ; সূক্ষ্ম, কুটিল, বৈপরীত্যময় ও দ্বন্দ্বজটিল। কখনো উজ্জ্বল সুতীব্র মননোদ্ভাসে আশ্চর্যরকম দীপ্র ও দ্যুতিময়, কখনো মগ্ন চৈতন্যের আলোছায়ায় রহস্যময়, প্রতীকী ও জটিল। স্পষ্ট বোঝা যায় : আমাদের সাহিত্যে একটা স্বতন্ত্র ও সাবলীল গদ্যভাষার জন্ম আসন্ন যার অগ্রযাত্রায় অনেক লেখকের অংশগ্রহণে সংঘটিত এ এক বিশাল নিরীক্ষা পর্যায়। 'সাম্প্রতিক ধারার প্রবন্ধ' মূলত ষাটের এই বিশিষ্ট গদ্য নিরীক্ষারই প্রবন্ধপর্বের দলিল।

ষাটের এই শিল্পাশ্রিত গদ্যপ্রয়াস প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি দৃষ্টিভঙ্গিকে উপস্থিত করেছিল। এগুলো হল : [১] সাহিত্য শিল্পকে প্রধানত শিল্পের মানদণ্ড থেকে বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি এবং [২] প্রধানত মার্কিয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোয় শিল্পকে বীক্ষণের প্রয়াস। এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত লেখকেরাও মোটামুটিভাবে ঐ দুই ধারায় বিভক্ত। আকরম হোসেন, আবুল কাসেম ফজলুল হক, মনসুর মুসা, অসীম সাহা এবং আংশিকভাবে হুমায়ুন কবির দ্বিতীয় ধারার এবং বাকী সবাই বিভিন্ন তারতম্যে প্রথম ধারার সংগে সংলগ্ন।

৩.

প্রশ্ন উঠতে পারে: ১৯৪৭-এর ভারত বিভাগের পর ষাটের দশকে এসে আমাদের গদ্যের ক্ষেত্রে হঠাৎ এ নিরীক্ষা পর্যায় কেন? কেন গদ্য রচনার ক্ষেত্রে এই সচেষ্ট সশ্রম সচেতনতা—হঠাৎ? যা জনাব হেলালের ভাষায় 'অস্বাভাবিক'; কিংবা 'মৃগীরোগের নান্দীপাঠ?' একি শুধু ঐ লেখকদের শৈল্পিক গদ্যপ্রয়াসের ফলশ্রুতি? নাকি এর পেছনে রয়েছে আরো গূঢ় গভীর কোনো কারণ—এমন কিছু যা ভাষাদেহের অনিবার্য ঐতিহাসিক বিবর্তনের সংগে প্রতিকারহীনভাবে সম্পৃক্ত।

এই প্রশ্নের জবাবে অন্য একটি কথা এসে পড়ে। জনাব হেলাল কথিত ঐ চিত্তবিকারময় গদ্যভাষা সৃষ্টির জন্য কি শুধুমাত্র ষাটের গদ্যকারেরাই এককভাবে দায়ী? নাকি এর সূচনা ঘটেছিল আরও আগে—আরও আগের লেখকদের হাতে—ষাটের দশকে এসে তা পরিপূর্ণ স্পষ্টতায় প্রথমবারের মত দৃষ্টিগোচর হয়েছিল মাত্র? সে যাই হোক, এ গদ্যের সূচনা যে ষাটের দশকে নয় বরং তার অনেক আগে, তা জনাব হেলাল, বিশ্লেষণসহ অনুধাবন না করলেও, অস্ফুটভাবে টের পান। তাঁর মতে '১৯৪৭-এর পরে বাংলাদেশে এক বিচিত্র গদ্যের সৃষ্টি হয়েছে,' যা, তাঁর ধারণায় বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত গদ্য থেকে আলাদা। (এখানে 'বিচিত্র' শব্দটির বিদ্রূপাত্মক ব্যবহার লক্ষণীয়)। কিন্তু কি কারণে হঠাৎ ১৯৪৭-এর পরে আমাদের সাহিত্যে ঐ 'বিচিত্র' গদ্যের আবির্ভাব তার কারণ নির্ণয়ে তিনি বিরত, অনীহ এবং সম্ভবত বিভ্রান্তও। অথচ উক্তিটিতে জনাব হেলাল 'বিচিত্র' শব্দটির দ্বারা যে গদ্যকে স্বাভাবিকতাবর্জিত, বিকৃত এবং অগ্রহণযোগ্য বলে তাচ্ছিল্য করেছেন, আমার বিশ্বাস, সাতচল্লিশ-পরবর্তী সেই জটিল, অমসৃণ ও বন্ধুর গদ্যই, বাংলাদেশের আগামী দিনের মার্জিত ও পরিণত গদ্যভাষার প্রাথমিক, অপরিণত, উত্তরণ-প্রত্যাশী, প্রয়াসক্লিষ্ট নিরীক্ষাপর্ব মাত্র।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে ১৯৪৭ সালের পর আমাদের এখানে একটা 'স্বতন্ত্র' সাহিত্য জন্ম নিতে শুরু করে যা আবহমান বাংলা সাহিত্যের পটভূমি থেকে উদ্ভূত হলেও আমাদের নতুন ভৌগোলিক রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় আলাদা ও একক বৈশিষ্ট নিয়ে জেগে ওঠে। সাতচল্লিশের দেশবিভাগের পর, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের নতুন ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বাস্তবতায়, একটি জাতির অঘোষিত জন্মের ভিতর এই সাহিত্যের ভিত্তি সূচিত হয়ে, বিকাশের পূর্ণতর ও অগ্রবর্তী স্তরে, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক কাঠামোতে আজ 'বাংলাদেশী সাহিত্য' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। 'কণ্ঠস্বর'-এর একাদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় মুহম্মদ নূরুল হুদা তাঁর অনবদ্য প্রবন্ধ 'আমাদের কবিতা প্রসংগে'-তে অত্যন্ত ন্যায়সংগতভাবেই ১৯৪৭-এর ভারত বিভাগের মুহূর্ত বা ১৯৭১-এর বাংলাদেশের রাষ্ট্রগত অভ্যুদয়ের সময়কে চিহ্নিত না করে ১৯৫২ সালকে এই 'বাংলাদেশী সাহিত্যে'র জন্মলগ্ন বলে সনাক্ত করেছেন। তাঁর মতে (আমার বিশ্বাস আমার মত অনেকের কাছেই মতটি গ্রহণযোগ্য হবে) ১৯৪৭ এ ভারতবিভক্তির ফলে ভৌগোলিক সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে এই জাতির অলিখিত জন্ম ঘটলেও ১৯৫২ সালই সেই সময় যখন আমাদের সাহিত্য দীর্ঘকালাবাহী সাম্প্রদায়িক চেতনা (থিসিস) ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার (এ্যান্টিথিসিস) দ্বন্দ্বের শেষে পুরোপুরি

পিনথেপিসে উত্তীর্ণ হয় ('যাতে এ্যান্টিথিসিসের বিজয় সূচিত হয় শতকরা নিরানব্বই ভাগ') এবং বাংলাদেশের সাহিত্য তার মৌলরূপ—'অসাম্প্রদায়িক ও জাতীয়তাবাদী—নিয়ে সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

নবোদ্ভূত এই সামাজিক রাজনৈতিক ভৌগোলিক পরিবেশের ভিতর এই নবীন সাহিত্য অল্পদিনের মধ্যেই সমস্যা সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ভিতর স্বতন্ত্র চরিত্র, পৃথক জাতীয় বৈশিষ্ট ও বিপুল আবেগৈশ্বর্য নিয়ে জেগে ওঠে। স্বভাবতই, এই নতুন সাহিত্য, তার অন্যান্য ক্ষেত্রের মত, নতুন দেশকাল চেতনার উপযোগী তার বিশিষ্ট সাহিত্য ভাষাটিও গড়ে নিতে সচেষ্ট হয় যার ফলে তা এতদিনের অখণ্ড-বাংলার সাহিত্য ভাষা থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র চেহারা নিয়ে ফুটে ওঠে। এই সাহিত্যের কাব্যভাষা সম্বন্ধে মুহম্মদ নূরুল হুদার মন্তব্য : "৫২ সালের ভাষা আন্দোলন রাষ্ট্রভাষা হিসেবে যে বাংলাভাষার স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল, সে বাংলাভাষা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোনো অখণ্ড বাংলার রাজধানী বা তার আশেপাশের ললিত-মধুর ভাষা নয় ; সে ভাষা বরকত সালামদের মুখের ভাষা, সে ভাষা আঞ্চলিকতার দোষে দুষ্ট, সে ভাষা প্রতীক্ষারতা বয়সিনী মায়ের মুখের মত সৌন্দর্যহীন সৌন্দর্যের স্মারক। আজ ক্রমে ক্রমে সেই ভাষাই হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের কাব্যভাষা।"

'বরকত সালামদের মুখের ভাষা' বলে যে আলাদা ভাষাকে চিহ্নিত করা হল, 'প্রতীক্ষারতা বয়সিনী মায়ের মত' সে ভাষার সৌন্দর্যহীন সৌন্দর্য' 'স্বাভাবিক ভাষার' তথাকথিত প্রবক্তাদের কাছে কিছুটা অযৌক্তিক লাগবে সন্দেহ কি।

সমাজমানসের মৃদুতম পরিবর্তন সর্বপ্রথম ফুটে হয় কবিতাশরীরে—এর সজীব, সচেতন, স্পর্শকাতর শব্দরাজির দীপ্ত আবেগৈশ্বর্যের ভিতর। গদ্যের বিস্তৃততর পরিসরে এই সংক্রাম অপেক্ষাকৃত ধীর ও মন্থর। হয়ত এই কারণেই আমাদের সাহিত্যের স্বতন্ত্র কাব্যভাষা পরিণতির দিকে যত দ্রুত এগিয়েছে, গদ্যভাষা ততটা নয়। গদ্যকে এখানে পেরোতে হয়েছে (এবং হচ্ছে) প্রযাস, শ্রম এবং চেষ্টার এক বিস্তৃত বন্ধুর অধ্যায়—সংগ্রাম ও নিরীক্ষায় বিস্রস্ত এক দীর্ঘ রক্তকণ্টকিত সরণী। দুরূহ ক্লেশ সাফল্য ও ব্যর্থতার তিতিক্ষাদষ্ট পথে এই গদ্যযাত্রাকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে আমাদের আগামী দিনের স্বকীয় গদ্যের মসৃণ, নিটোল পরিপূর্ণতম রূপটি খুঁজে পাবার জন্য, পার হতে হচ্ছে এক বিশাল ক্লিষ্ট অতিস্থায়ী নিরীক্ষাপর্যায়। কাজেই, মনে রাখতে হবে এই গদ্য বাংলাদেশের আগামী দিনের পরিপূর্ণতর গদ্যরূপের প্রস্তুতি পর্বের গদ্য মাত্র। এ কথা ভুলে গেলে এই এ গদ্যের চক্ষুচেতনাহীন সমালোচকদের মত উগ্র ক্ষুব্ধ আক্রোশে অকারণে অর্থহীনভাবে উৎক্ষিপ্ত হতে হবে শুধু।

আমাদের গদ্যের এই অস্বাভাবিক চরিত্রটি একসময় বুদ্ধদেব বসুকেও কৌতূহলী করেছিল। ১৯৪৭ সালে একবার তাঁর দর্শনপ্রার্থী হলে তিনি এ বিষয়ে আমার ধারণা জানতে চান এবং কথা প্রসংগে জানান যে তাঁরা (পশ্চিমবঙ্গের লেখকেরা) যখন সংস্কৃতভাষা ভালভাবে জেনেও তাঁদের গদ্যে সংস্কৃতপ্রবণতা থেকে দূরে থাকছেন, তখন বাংলাদেশের লেখকেরা সংস্কৃত ভাষা না জেনেও যেভাবে গদ্যকে সংস্কৃত কন্টকাকীর্ণ করে তুলছেন, তা তাঁর কাছে খানিকটা অস্বাভাবিক লাগে।

আমি উত্তরে তাঁকে জানিয়েছিলাম যে বাংলা সাহিত্যের গত শতকের মাঝামাঝির লেখকেরাও (রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল, প্রথম পর্যায়ের বঙ্কিম, শেষ পর্যায়ের প্যারীচাঁদ ইত্যাদি) আজকের পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের মতই কমবেশি সংস্কৃত ভাষা জানতেন। (অনেকে আবার যথেষ্ট জানতেনও না) কিন্তু কার্যত তাঁরা করেছিলেন আজকের পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঠিক উল্টো। তাঁরা তাঁদের ভাষায় হয়ে উঠেছিলেন দুরূহরকম সংস্কৃতঘেঁষা। এ ছাড়াও তাঁদের ভাষা-আচরণে অসংখ্য অযৌক্তিক, অস্বাভাবিক, দুরূহ ও এমনকি অসুস্থ উপাদানও সুলক্ষ্য। এর কারণ : তাঁরা সবাই ছিলেন আধুনিক বাংলা গদ্যের গঠন যুগের লেখক। এই গদ্য গড়ে তুলতে হয়েছিল তাঁদের অনেক সাধনায়, পেরোতে হয়েছিল প্রয়াস শ্রম ব্যর্থতা নিরীক্ষার এক দীর্ঘ দুরূহ স্বেদবহুল পথ যা আজকের লেখকদের আর পেরোবার দরকার নেই। মনে রাখতে হবে, তাঁদের সংস্কৃত-প্রবণতার মত ভাষার অন্যান্য অস্বাভাবিক স্বভাবগুলোও আরাধ্য গদ্য সম্বন্ধে তাঁদের অনিশ্চিত, অস্বস্ত, দ্বিধাগ্রস্ত সিদ্ধান্তহীনতারই ফল। পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের উন্নত সুষম নিটোল ও সহজ গদ্য—জনাব হেলালের ভাষার 'বাংলা সাহিত্যের স্বাভাবিক গদ্য'—এই নিরন্তর প্রয়াস নিরীক্ষারই ফলশ্রুতি।

আমার ধারণা, আমরাও রয়েছি আজ বাংলাদেশের আগামী দিনের সম্পন্ন, উন্নত, মসৃণ ও সুষম গদ্যভাষার গঠন পর্বে : আর তাই এই গদ্য-শরীর প্রযাসে, প্রচেষ্টায় নিরীক্ষায় এবং স্বেদে এমন অমসৃণ ও বন্ধুর। ষাটের দশকে যে এই উর্বর নিরীক্ষাধর্মী গদ্যযাত্রা এমন উজ্জ্বল স্পষ্টতায় ঝিকিয়ে উঠেছিল তার কারণ : ষাটের দশকই সেই সময় যখন একদল সত্যিকার প্রতিভাসম্পন্ন গদ্য লেখক প্রথমবারের মত সমবেতভাবে এই সশ্রম নিরীক্ষাপ্রয়াসে হাত বাড়িয়েছিলেন।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

সূচীপত্র

আবদুল হাফিজ

সুধীন্দ্রনাথের গদ্য

একদা দুর্বোধ্য বলে সুধীসমাজে নিন্দিত, অযথা বিনয়ী বলে কপট নামে আখ্যায়িত, অপরিচিত ও অপ্রচলিত তৎসম ও সংস্কৃত শব্দাবলী ব্যবহারের জন্য এতকাল অনধীত এবং সর্বোপরি আভিজাতিক ও ধ্রুপদী মেজাজের জন্য এ যাবত অবহেলিত কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে পাঠক সাধারণের উৎসাহ সাম্প্রতিক হলেও এই উৎসাহ অপুরস্কৃত তো নয়ই বরঞ্চ তাঁর গদ্য-পদ্যের অসমান উপলখণ্ড দুহাতে সরালে সাবধানী ও অধ্যবসায়ী পাঠকচিত্ত অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার আবিষ্কারে আনন্দিত হতে বাধ্য। যুক্তি নয়, ভাবোচ্ছ্বাসের এবং ভাবোচ্ছ্বাসের অকল্পনীয় স্ফীতি, সাংগঠনিক দৃঢ়তা নয়, অনির্বচনীয় শৈথিল্য এবং চিন্তার ক্ষেত্রে ঐক্য ও সংগতি নয়, দৌর্বল্য ও অসংগতিই যেকালে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ, তখন সুধীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা ও স্বভাব অবাঙালী তো বটেই, তদুপরি নিজস্ব বিশ্ববীক্ষা ও সাহিত্যের প্রকরণের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডে তাঁর অনায়াস গতিবিধি ও একাধিকবার বাঙলার সীমান্ত অতিক্রমণ বিস্ময়াবহ। রবীন্দ্রানুসারী কিংবা রৈবিক ঐতিহ্যে বীতশ্রদ্ধ কবিসমাজ তো দূরের কথা যখন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেও স্ফীত কাব্যরস পীড়াদায়ক অথবা যেকালে কল্পনার বল্গাহারা রথ নিরুদ্দেশে নিত্যই উধাও, প্রেরণার প্রাবল্যে কবিচিত্ত উদ্বেলিত, তখন সুধীন্দ্রনাথের শিক্ষিত প্রতিভাই অনুভব করেছিলেন যে অধ্যবসায় ও পরিশ্রম, যুক্তি ও অভিজ্ঞতা এবং ভাব, ছন্দ ও ভাষার সার্থক পরিণয়ই কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টির মৌলিক পরিমণ্ডল রচনা করে।

কোনও বিশেষ মতবাদে বিশ্বাসী না হয়েও একথা উপলব্ধি করি যে সাহিত্যপ্রতিভাও ঐতিহাসিক, কালিক ও পারিবারিক প্রতিবেশের মুখাপেক্ষী এবং সুধীন্দ্রনাথ তো ননই বরং সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অভিশাপ

ঔপনিবেশিকতা কদর্য গ্লানি, স্ব-পরিবারের আভিজাতিক উন্নাসিকতাকে আজীবন বহন করেই তিনি সুধীন্দ্রনাথ। কিন্তু এসব ছাড়াও সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত শিক্ষা, রুচি ও নিরীক্ষা তাঁর সৃষ্টিকে প্রভাবিত ও তাঁর ধ্যান-ধারণাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। একদিকে পিতার বৈদান্তিক ও নিশ্চিত ব্যক্তিত্বের নিরপেক্ষতার ও অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের পরম সান্নিধ্য থেকে অবিরাম পরিশ্রমের মূল্য সম্পর্কে তিনি অবহিত হয়েছিলেন। জীবদ্দশাতেই দু-দুটো সর্বনাশা যুদ্ধ এবং রাশিয়ায় ও জার্মানীতে দু-দুটো বিপ্লবকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগও তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু এহ বাহ্য।

সুধীন্দ্র-প্রতিভা সুনিশ্চিতভাবে জ্ঞানার্জনী—ফলস্বরূপ আজীবন তিনি একনিষ্ঠ পাঠক। জ্ঞানমার্গের সমস্ত শাখাপ্রশাখায় তাঁর সাবলীল পরিক্রমা, স্বদেশে-বিদেশে সর্বত্র সহজ পদচারণ, এমন কি শত্রুভাবাপন্ন আবহাওয়াতেও তাঁর অনায়াস নিঃশ্বাস গ্রহণ আশ্চর্য ঠেকে। বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান ও দর্শনের মতো তত্ত্ব ও তথ্যসংকুল বিষয়াদি সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা মনোজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও একাধিকবার তিনি নিজেকে মূর্খ ও পল্লবগ্রাহী বলে ঘোষণা করেছেন অর্থাৎ আসলে নিউটনী বিনয়ে তিনি অদ্বিতীয়।

ইতিহাস শিক্ষা দেয় যে প্রতিভারও সীমাবদ্ধতা থাকে কারণ প্রতিবেগ তো বটেই, অদৃষ্ট বহু ঘটনাও ব্যক্তিজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। জ্ঞানীদের মতেই জ্ঞানমার্গ বিপজ্জনক : জ্ঞানমার্গের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে প্রখর ধীমানকেও ভাবতে হয়। কাণ্ডজ্ঞানহীন হওয়ার আশঙ্কা তো বর্তমান থাকেই ; আদিমাতা ইভের মত নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের দরুন স্বর্গচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক। সুধীন্দ্রনাথ পরাধীন ভারতে নিরীহনিগ্রহ তো দেখেছিলেনই—কিন্তু সে নাটকের ভয়ঙ্কর অনুষ্ঠান সভ্যজগতের সর্বত্র প্রত্যক্ষ বলে সভ্যতার অগ্রগতিতে তাঁর আস্থা ছিল না। উপরন্তু তিনি এমন এক সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যা এক কথায় সর্বনাশী। 'কুলায় ও কাল-পুরুষের' প্রগতি ও পরিবর্তন' প্রবন্ধটিতে তিনি প্রথমেই উচ্চারণ করলেন 'মনো-বিকলনে ধরা পড়ে যে মানুষ মাত্রেই পরিবর্তন বিমুখ'···এবং আরও ঘোষণা করলেন যে 'ইতিহাস পুনরুক্তিময়'। কারণ···'বিপ্লবের রক্তগঙ্গায় আভিজাতিক শাসকগোষ্ঠীকে ডুবিয়েও মনুষ্য সংসার প্রজাতন্ত্রে এসে কূল পায় না, গণ-নায়কদের বেবন্দোবস্তে একাধিক যুদ্ধবিগ্রহে হেরে স্বৈরাচারে আশ্রয় চায়··· এমন কি বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গলও একটা কথার কথা।' এবং প্রগতি ও পরিবর্তনের ব্যাপারে তাঁর শেষ কথা, 'অতএব মানবচৈতন্য সদাসর্বদা

উভয় সংকটের সম্মুখীন ; এবং উভয় সংকট স্বভাবতই গতি পরিপন্থী বলে, মানুষের সংস্কার শত সহস্র বৎসর ধরে নির্বিকার রয়েছে।···সুতরাং সভ্যতা মঙ্গলাকার ও সীমাবদ্ধ এবং তার স্বভাব চক্রবর্তী ও আত্মঘাতী। অর্থাৎ তার জীবনের প্রথমার্ধ বর্ধিষ্ণু আর শেষার্ধ ক্ষীয়মাণ ; যেখানে তার যাত্রারম্ভ, সেখানেই তার যাত্রা শেষ এবং উন্নতি তথা অবনতি একই অন্তঃপ্রেরণার অবশ্যম্ভাবী ফল।' এই প্রবন্ধেই তিনি দুই মনীষা মার্কস ও পারেতোকে টেনে এনে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে মার্কসবাদ বা ফ্যাসি-বাদ মানুষের মোহমুক্তির উদ্‌গাতা হতে পারে না ; কেননা আসলে প্রাণ-প্রবাহই সুস্পষ্টভাবে মতবাদ বিরোধী। তাঁর মত ··· প্রাণপ্রবাহ আসলে একটা ঘূর্ণাবর্ত, যার কেন্দ্রে অবস্থিত নাস্তি আর পরিপার্শ্বে বর্তমান অসেতু শূন্যতা।' এইভাবেই তাঁর সন্ধানী তথ্যজিজ্ঞাসু প্রতিভা অবিরাম সন্ধান করেও খুঁজে পেল শূন্যগর্ভ দর্শন ; অপমৃত ঈশ্বর আর দুঃখময় নৈরাশ্যবাদ। অবশ্য সুস্থির সমালোচকেরা সুধীন্দ্রনাথের অস্থির জীবনদর্শনের ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে বলেন যে নাস্তি থেকে ক্ষণবাদ এবং শেষ পর্যন্ত অস্তিত্ববাদে তাঁর নোঙ্গর স্থিতিলাভ করে কিন্তু এ সব সত্ত্বেও দ্বিধাদ্বন্দ্ববিজড়িত সুধীন্দ্রনাথের জীবনবেদ আমৃত্যু অপরিবর্তনীয়ভাবে অস্থির। তাঁর বিশ্ববক্ষায় অন্য কিছু আছে কিনা জানি না কিন্তু এক করুণ দ্বন্দ্বে তা ক্ষতবিক্ষত, যন্ত্রণাময় ও কান্নাময়। তাঁর এই উপলব্ধি তাঁকে বাংলা সাহিত্যে একক স্থান দান করেছে বলে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুগোষ্ঠী মনে করেন, এ যুগে এত নিঃসঙ্গ, নিরাশ্রম, নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত সাহিত্যসেবী আর নেই।

এ প্রবন্ধের উপজীব্য বিষয় সুধীন্দ্রনাথের কাব্য নয়, তাঁর গদ্য রচনাবলী যা তাঁর কবিতার মতোই বাংলা সাহিত্যে একক ও অনন্য। অবশ্য এ প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে তাঁর সমস্ত গদ্য রচনাবলীর পরিচয় প্রদান অসম্ভব বলে সম্বন্ধে ও রবীন্দ্রনাথ-আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যগুলো যথাসম্ভব আলোচনা উপস্থিত করবার চেষ্টা করা যাবে।

কাব্য সম্পর্কিত তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ 'কাব্যের মুক্তি'। এ প্রবন্ধে কাব্যের জন্ম, তার ক্রম-পরিণতি, কাব্যের উপজীব্য, কাব্যে সাম্প্রতিকতা ও আধুনিকতা ইত্যাদি বিষয়ে সুধীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবে তাঁর মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন। কাব্যের জন্মপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'প্রথম কবিতার আবির্ভাব হয়েছিলো কোনো ব্যক্তিবিশেষের মনে নয়, একটা মানবসমষ্টির মনে···।' তাঁর এই স্বীকারোক্তির কথা ভাবলে অবাক লাগে কারণ সচেতনভাবে

জীবনে তিনি কখনও যূথবদ্ধ মানুষী প্রচেষ্টাকে স্বীকার করেন নি বরং যূথবদ্ধ সমাজকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'সে-সমাজ পিপীলিকাধর্মী : তাতে ব্যক্তিবৈচিত্র্যের অবকাশ নেই, স্তরভেদের সুযোগ নেই, ভৌগোলিক পরিস্থিতি তার ভাগ্যবিধাতা'···এমন কি···'কারও প্রচেষ্টাতে বিধ্বস্ত সমাজে প্রাগৈতিহাসিক শান্তি ও শৃঙ্খলার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না।' (উদয়াস্ত : কুলায় ও কালপুরুষ)। কবিতার পরিণতি সম্বন্ধে তাঁর মত সর্বনাশা, 'প্রথম কবিতার প্রসার শুধু একটি মানুষের উপর নয়, সমগ্র জীবনের উপরে, প্রাথমিক কবিতার উদ্দেশ্য বিকলন নয়, সঙ্কলন। সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত কাব্যের বিশ্বম্ভর মূর্তি কেবল ক্ষয়ে গেছে···ফলে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন কাব্যের পরিণতি এইখানেই সমাপ্ত কিনা। আমার তাই বিশ্বাস।···এর পরেও আবার যদি কাব্যের মধ্যে একটা তীব্র জ্যোতি দেখা যায়, তবে বুঝবো সে জ্যোতি পথচ্যুত উল্কাব চিতাগ্নি।'

কাব্য সম্পর্কে তাঁর এই চূড়ান্ত রায় ইতিপূর্বেই অগ্রাহ্য কারণ আমার সামান্য বুদ্ধি দিয়েও আমি বুঝি যে কাব্যেব ইতিহাসে একটি যুগাবসান আর একটির শুভাগমনের সঙ্কেত মাত্র এবং আরম্ভের প্রাক্কালে যদিও বা ভ্রান্তিবিলাসই পথরোধ করে তবু সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতের প্রত্যাশা দুরাশা নয় অন্তত আমার স্বপক্ষে আমি একাধিক প্রমাণ হাজির করতে পারি। আমাদের সৌভাগ্য যে সুধীন্দ্রনাথ কাব্যের অধঃপতনেব জন্যে আধুনিক কবিকে দায়ী করেন নি বরং শ্রদ্ধান্বিত কণ্ঠে উচ্চারণ কবেছেন যে সভ্যতাব স্টীমরোলার যখন চিরকালের কীর্তিস্তম্ভগুলোকে ভাঙতে ব্যস্ত তখনও কবিরাই সৌন্দর্যের দরজা আগলে রেখেছেন।

ঊনিশ শতকের শেষ দশকে ইউরোপীয় মনীষা দেখতে পেয়েছিল যে কবিতার ক্ষেত্রে এক মহাশূন্যতার আবির্ভাব হয়েছে এবং অতঃপর সংশয় আর দ্বিধা দাঁড়ালো পথরোধ করে কিন্তু এলিয়ট-ইয়েটস ও অন্য-দিকে ফরাসী প্রতীকীদের প্রচেষ্টার ফলে নানান ভুলভ্রান্তি সত্বেও কাব্য আরও একবার মৃত্যুকে জয় করেতে পেরেছিলো। কাব্যের মুক্তির পথ সেদিন এঁরাই দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সে কথা থাক। সুধীন্দ্রনাথ কাব্যের মুক্তি সম্বন্ধে বলেন,···আড়ম্বরের মোহ অবশ্য পরিত্যজ্য, অন্তঃ-সারশূন্য বস্তুমাত্রার আমূল উচ্ছেদ অত্যাবশ্যক। কেননা শুধু নূতন করে অট্টালিকা নির্মাণে কোনো সার্থকতা নেই, হর্ম্যখানাকে বাসোপযোগী ও কালোপযোগী করা চাই, দেখা চাই যাতে আকাশের আলো তার ভিজে

দেওয়ালে বাধা না পায়, বিশ্বের বাতাস ফিরে না যায়, তার অর্গলিত দ্বারের শিকল নেড়ে। সেজন্য একটা নগণ্য বাহ্য সৌন্দর্যের দিকে নজর রেখে ইটের পর ইট সাজানো যথেষ্ট নয়, বাড়িতে যারা থাকবে, তাদের ভুললে চলবে না তারা মানুষ, ভুললে চলবে না তারা রক্তে-মাংসে-গড়া. দুঃখ-আনন্দের দাস, পরিবর্তনশীল, বর্ধিষ্ণু। তাতে যদি প্রথাগত স্থাপত্য বর্জনীয় ঠেকে তবে তাই স্বীকার, তাতে যদি নাস্তিক, বস্তুবাদী ইত্যাদি অন্যায় অপবাদ ঘাড়ে পড়ে, তবে তাও বরণীয়। প্রথম দফার দরকার অবৈকল্য, দ্বিতীয় দফায় দরকার অবৈকল্য, তৃতীয় দফায় দরকার অবৈকল্য, শেষের দফায় অবৈকল্য। বিংশ শতাব্দীর মূল মন্ত্রই হচ্ছে অবৈকল্য আর অকপটতা।' বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না উপরোক্ত পংক্তিগুলো সুধীন্দ্রনাথের যিনি কবিতার মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত। কিন্তু এই পংক্তিগুলো থেকেই আভাস পাওয়া যায় যে কবিতার অন্তিম মুহূর্ত এখনও ঘনায় নি তবে নতুন করে বাঁচবার সঙ্কল্প এবং এতকালের প্রচলিত বিধিব্যবস্থার আশু পরিবর্তন দরকার। অন্যত্র তিনি বলেন, কবিতার একটা বৃহৎ লোকোত্তর (!) পটভূমি না জুটলে কবিতার নাকি বেড়ে ওঠা সম্ভব নয় এবং সেইজন্য কবির কালজ্ঞান ব্যতীত নাকি গত্যন্তর নেই। কালজ্ঞান তথা মানুষের অবিচ্ছিন্ন সংস্কৃতি প্রবাহের ঐতিহাসিক সত্যে আমরা সবাই বিশ্বাসী কিন্তু লোকোত্তরই কাব্যের পটভূমি রচনা করে কিনা সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ তো আছেই অধিকন্তু একমাত্র মানবিক প্রচেষ্টা ও প্রয়াসই কাব্যের শ্রদ্ধেয় পটভূমি; সুধীন্দ্রনাথের তৃতীয় বক্তব্য, কবির প্রয়োজন নিরাসক্ত আত্ম-বিলোপ। কারণ ব্যক্তি যখন বিশ্বমানবের মধ্যে নিঃশেষে ডুবে যায়, তখনই পিঞ্জরিত ব্যক্তিস্বরূপ পায় মুক্তি। তাঁর এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য কেননা বর্তমান বিশ্বে ব্যক্তি ও ব্যষ্টির প্রভেদ অগ্রাহ্য। ব্যক্তির স্বার্থ-ত্যাগে যেমন সমষ্টির কল্যাণ তেমনি সমষ্টির ক্রমাগত প্রগতিতে ব্যক্তি-স্বরূপের সম্পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। গদ্য ও কবিতার ভাষা ও বিভিন্নতা সম্বন্ধেও তাঁর উক্তি স্মরণীয়। তার মতে, 'দৈনন্দিন ভাষা আর কাব্যের ভাষা বস্তুতই বিভিন্ন, বৈধ মতেই বিভিন্ন। এই প্রভেদ গদ্যের ও পদ্যের স্বভাবগত। গদ্যের অবলম্বন বিজ্ঞান, কাব্যের অন্বিষ্ট প্রজ্ঞান।' এ ছাড়াও সুধীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে একমাত্র ব্যক্তি যিনি শব্দ সম্বন্ধে আধুনিক সচেতনতা প্রদর্শন করেন এবং এ প্রসঙ্গে মালার্মে প্রতিভার সঙ্গে সুধীন্দ্র-নাথ তুলনীয়। শব্দ সম্পর্কে তাঁর উক্তি ও নির্দেশ বার বার স্মরণ করা

দরকার, তিনি বলেন, 'শব্দের স্বভাব টাকার মতো, বহুব্যবহারে তা ক্ষয়ে যায়, হস্তান্তবে তাতে কলঙ্ক জন্মো, বয়স তাকে অচল করে, আবাব কালে সে স্থান পায় গ্লাস্কেসে। কিন্তু ম্যুজিয়মভুক্তি বিলুপ্তির নামান্তর নয়, অবস্থাবিশেষে কাজে লাগে....রূপদক্ষের হাতে পড়লে, পুরনো শব্দও কাব্যের বাদ সাধে না....এবং ক্ষেত্রবিশেষে, বিশিষ্ট ভাবানুষঙ্গের খাতিরে আধুনিক কবি সাধু-অসাধু, নবীন-প্রবীণ, দেশী-বিদেশী সকল শব্দকেই সমান প্রশ্রয় দেয়।' আধুনিক কবি প্রেরণাকে আজ আর ঐশী-শক্তি বলে মনে করে না এবং কাব্যসৃষ্টি যে নিবন্তর পরিশ্রমের ফল আর ছাড়া কিছু নয় একথাও সুধীন্দ্রনাথ প্রথম অনুভব করেন। কিন্তু এই শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধেই আমাদের মতো অন্ধকে দিক-নির্দেশ করেও তিনি 'কাব্যের কল্পতরু'কে বর্ণনা কবেন এভাবে, 'তার দেহ পঙ্কিল, তার পরিসর খর্ব, তার তলায় ছায়া নেই, ফল নেই তার শাখায়, আছে শুধু একটা অহেতুক আন্দোলন, আর আছে ফুল, নির্মম রক্তাক্ত ফুল।' এবং আধুনিক কবির অনিন্দনীয় আত্মত্যাগের প্রশংসা করেও তাঁর মন্তব্য ধ্বংসসূচক, 'ইতিমধ্যে মণ্ডলাকার প্রগতির পরিক্রমা হয়তো মার শেষ হয়েছে, আর অগ্রগমনের স্থান নেই, এর পরেই হয়তো মৃত্যু।' এবং এ অবস্থা জেনেও যে কবির চরণে শ্রান্তি নেই সে হয়ত, 'এইটুকু বুঝতে চায যে শূন্যগর্ভ মায়ার মধ্যে তার সৃষ্টি আরো শূন্যময়।'

আধুনিক কবিরা পরীক্ষা নিরীক্ষায় অক্লান্ত, কারণ বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের অভাব, রূপকল্পের (form) প্রাচীনত্ব, এমন কি প্রকরণের গতানুগতিকতাই তাকে এ পথে ঠেলে দিয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর আর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ 'ধ্রুপদ-খেয়ালে' পাঠক ও কবির সম্বন্ধ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেন যে সাধারণ পাঠক তার অবজ্ঞার পাত্র এবং এ অবজ্ঞাও নাকি তার প্রাপ্য। তবে পাঠকেরও বলার আছে, 'কাব্যের বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া দেখে তার বঞ্চনা-বোধও একেবারে গর্হিত নয়।' উদাহরণস্বরূপ ই. ই. কামিংস ও এডিথ সিটওয়েল থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন যে, এদুজন কবি রূপকল্পে বা ছন্দে স্বেচ্ছাচারী স্বকীয়তার পক্ষপাতী। আধুনিক কবি 'ছন্দ-মুক্তিতে সন্তুষ্ট নয়, বাক্যরণ দ্বিও তাদের কাছে দূষণীয় ঠেকে। অজ্ঞাতকুলশীল পূর্ববর্তীদের রচনা-উদ্ধার, বিনা প্রয়োজনে বিদেশী শব্দ-কোষের ঋণস্বীকার, ছেদবর্জন ইত্যাদি সমস্ত উপচারই সাম্প্রতিক কাব্যের দুরূহতাপ্রীতির পরিচায়িক। আর এক জায়গায় তিনি বলেন, 'বস্তুতঃ

কামিংস প্রমুখ আধুনিকেরা শেক্‌স্‌পীয়ার অথবা অন্য কোনোও পূর্বগামীর অনুকরণে বদ্ধপরিকর নন। তাঁরা ব্যস্ত তাঁদের স্বকীয়তা প্রমাণে; এবং ধ্রুপদী ঢং বর্তমান কাব্যের ছদ্মবেশমাত্র, তার তন্মাত্র স্বকীয়তা, উগ্রচণ্ড, আত্মজ্ঞ স্বকীয়তা।' সুধীন্দ্রনাথ এই স্বকীয়তাকে আধুনিক অনর্থের মূল হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন এবং এই মায়ামৃগ শেষপর্যন্ত আমাদের ভোলায় যে 'সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য লেখকের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে পাঠকচৈতন্যের উদ্বোধন।' স্বীকার করি যে আতিশয্য সর্বদা বর্জনীয় কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের পরীক্ষা নিরীক্ষাকেও শ্রদ্ধার চোখে দেখাও আমাদের কর্তব্য। কামিংসের রূপকল্পের সাংগঠনিক আতিশয্য যা অনেক সময় দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয় তাতেও শিশুসুলভ পবিত্রতার সংবাদ আমরা পেয়েছি। অবশ্য সুধীন্দ্রনাথের সংগে আমরা একমত যে 'অনন্ত স্বকীয়তা নিজের কলে পড়ে নিজেই মরে।'

উপরোক্ত প্রসঙ্গেই তিনি একদিকে কামিংস ও সিটওয়েলকেও অন্য-দিকে এলিয়ট ও রবার্ট ফ্রস্টকে উপস্থিত করে বোঝাতে চেয়েছেন যে সিটও-য়েলের উদ্ভটতা এবং কামিংসের বালসুলভ স্বকীয়তা শেষ পর্যন্ত পরাজ মানতে বাধ্য। তার কারণ সুধীন্দ্রনাথের শিক্ষিত মননশীলতা এলিয়টের সার্বিক ও সর্বগ্রাসী প্রতিভায় মুগ্ধ এবং অন্যদিকে ফ্রস্টের অপটু ও অশিক্ষিত কবিতায়—যেখানে উপমা নতুনত্বহীন, প্রসঙ্গ-নির্বাচন সনাতনপন্থী, ভাষা সরল ও শব্দবিন্যাস সহজ—সেখানে তাঁর জটিল মানসিকতা সহজ সারল্যে স্নিগ্ধ পারিপার্শ্বিকতায় স্নাত। কিন্তু শুধুমাত্র এসব কারণেই কামিংস বা সিট্‌ওয়েল প্রমুখদের প্রচেষ্টা নিন্দার যোগ্য নয় বরং যেকালে সংশয় আর দ্বিধা, অনিশ্চয়তা আর সন্দেহ বর্তমান তখন নূতন পথের সন্ধান অনিবার্য। সার্থকতা ও বিফলতা ভবিষ্যতের প্রশ্ন তার নিঃসংশয় বিচার করবার সময় এখনো আসে নি।

কাব্য ও কবি সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের মতামত কখনো কখনো আশ্চর্য-রকমের তীক্ষ্ণ মনে হলেও তা একদেশদর্শী অন্তত কবিতার পরিণাম সম্বন্ধে তো বটেই কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্য বা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর আলোচনা ও সমালোচনা অবিশ্বাস্যভাবে নিরপেক্ষ। কেননা এতকাল রবীন্দ্র-সমালোচনা মানে বুঝেছি রবীন্দ্রনাথের নির্জলা প্রশংসা অথবা প্রাজ্ঞ সমালোচকের হাতে রবীন্দ্রকাব্যের নিপুণ ব্যবচ্ছেদ। কিন্তু এই প্রথম জানা গেল যে তাঁর অন্তর্নিহিত দুর্বলতা আছে, তথাপি তা অমানুষী নয়। রবীন্দ্রনাথের

আবির্ভাব অসামান্য ঘটনা এবং ফ্রয়েডকে সাক্ষী মেনে সুধীন্দ্রনাথ বলেন, 'অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্বও ফ্রয়েডী অনুমিতির পরিপোষক ; এবং ফ্রয়েডের মতে সাধ বা সাধ্য থাকলেই মানুষ মহাপুরুষের পদে পৌঁছায় না, উক্ত সন্ধান সে তখনই পায় যখন তার মুখ্য উপলব্ধি অসাম্প্রদায়িক আদর্শের শাসন মানে, যখন তার মনোমুকুরে স্বদেশের মানচিত্র ফোটে, যখন তার ব্যক্তিস্বরূপ জাতিরূপের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে বদলে যায়।....সেই জন্যে রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে বাংলা ভাষা প্রাদেশিকতার গণ্ডী পেরিয়ে বিশ্ব-চেতনার বাহন হয়ে উঠেছে।' কিন্তু এমন একদিন এল যখন 'নূতন ভাষা নির্মাণের উন্মাদনা তাঁকে এমনই পেয়ে বসলো যে তিনি তাঁর স্বভাবদত্ত সংবেদনশীলতা তথা দৃক্শক্তির ব্যবহার প্রায় ভুলে গেলেন, তাঁর রচনারীতি প্রাক্তন সারল্য ঘুচিয়ে আত্মকৃত বক্রোক্তির স্মরণ নিলে এবং তিনি তার আদিম অভিজ্ঞতার পুঁজি ভাঙিয়ে, সেই সঙ্গে উপমা অলঙ্কারের খাদ মিশিয়ে, কার্পণ্য-সহকারে পরবর্তী লেখার কাজ চালাতে লাগলেন।' সুধীন্দ্রনাথের এই উক্তি যে কত সত্য তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যবয়সের রচনা। এবং সুধীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন যে আত্মসমাহিতি নিরন্তর সাধনার ফল এবং তা যতদিন রবীন্দ্রনাথের আয়ত্তে আসেনি ততদিন সমসাময়িকেরা তাঁর লেখাকে একধারে প্রগলভ ও দুর্বোধ্য বলে অভিহিত করেছেন এমন কি কখনো কখনো ধৈর্যও হারিয়েছেন। অন্যান্য মহাকবিদের মতো রবীন্দ্র-নাথও যেহেতু অভিব্যক্তির যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছেন অভিজ্ঞতাকে তাই তাঁর নাট্যরচনা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র। কারণ নাটকের পাত্রপাত্রীর সাথে একাত্ম-বোধই নাট্যকারের কর্তব্য কিন্তু....'কল্পনাগত অনুকম্পার প্রাচুর্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যেহেতু আধিভৌতিক অন্বয় ব্যতিরেকে অবিশ্বাসী, তাই তাঁর চরিত্রাবলী চমকপ্রদ বাক্‌চাতুর্যে আমাদের তাক লাগায় বটে, কিন্তু সংক্রামক আবেগের সমর্থন পেয়েও তারা শেষপর্যন্ত কলের পুতুলের মতো নিষ্ক্রিয় থেকে যায়।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্রমপরিণতি শেকস্‌পীয়রের সঙ্গে তুলনীয় বটে তবে তিনি ক্লাসিক পদ্ধতিতে নাট্যরচনায় আর হাত দিলেন না। ফলস্বরূপ সুধীন্দ্রনাথের মতে গোড়ায় গলদ' বা 'চিরকুমার সভা' ইত্যাদি প্রহসনে কুশীলবেরা গৌণ, নাট্যকারের শাণিত শ্লেষোক্তিই প্রধান। এমন কি 'রাজা', 'রক্তকরবী' কিংবা 'অচলায়তনে' রবীন্দ্রনাথ নীতিবাগিশ মাত্র যদিও ভাবসংবেগের প্রাবল্যে তথা অবৈকল্যে' এগুলো রবীন্দ্রসাহিত্যে অদ্বিতীয়। এবং তাঁর মতে রাবীন্দ্রিক নাট্যপ্রতিভার পরাকাষ্ঠা 'মুক্তধারা'তে।

'চিত্রাঙ্গদা' এতকাল দুর্নীতিযুক্ত বলে অভিহিত ছিল এবং মহাকবির সমসাময়িকের এ ব্যাপারে যে ঝড় তুলেছেন তাঁদের লক্ষ্য করে তিনি বলেন, 'তাঁদের নির্বুদ্ধি যুগধর্মের নির্বন্ধেও মার্জনীয় নয়। কারণ 'চিত্রাঙ্গদার' স্থানে স্থানে ইন্দ্রিয়াসক্তির গুণগান যতই উগ্র হোক না কেন, সম্পূর্ণ নাটিকাখানি অত্যন্ত নীতিপ্রধান।' এই প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ উল্লেখ করতে ছাড়েন নি যে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সাহিত্যে কুরুচি সম্পর্কে নানারকমের হঠোক্তি করেছিলেন।

বাংলা কবিতাকে ছন্দের অনিবার্য শৃঙ্খল থেকে মুক্তির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের দান কতটা তা নির্ণয় প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্য আরও যুক্তিধর্মী আরও নিরপেক্ষ। আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত ছন্দের মধু পান করে মানবসমাজ যখন মত্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে তখন জীবননিষ্ঠ কাব্যসৃষ্টির প্রয়োজনে গদ্য ও পদ্যের মাঝখানের বিপুল ব্যবধানকে দূর করার জন্য আধুনিক কবিরা সচেষ্ট। সুধীন্দ্রনাথ আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে সুনিয়ন্ত্রিত ধ্বনির সাহায্যে যে তন্ময়তার সৃষ্টি হয় তা স্বপ্নাবস্থার মত এবং শেক্সপীয়ারও নাকি ঐ ধ্বনিময়তার সাহায্যে পাঠকমনকে নিস্তেজ করে এক দুর্নিবার আদেশ দান করতেন, **absent thee form felicity awhile.** এই অবস্থারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা তিনি দেন এভাবে, 'এমন কি অধিকাংশ যাদুকর ভোজবাজী দেখায় এই উপায়ে ; এবং ব্যাস-বাল্মীকির বংশধরদের মতো ভানুমতির শিষ্যেরাও তাদের চিরাচরিত করকৌশলকে হয় সঙ্গীতের আচ্ছাদনে, নয় অনর্গল বক্তৃতার আড়ালে, এমনই বেমালুমভাবে লুকায় যে মোহমুগ্ধ দর্শক অগত্যা ভাবে সে অলৌকিক রহস্যের সম্মুখীন।' পদ্যে যখন ভোজবাজীর খেলা এবং গদ্য যখন কেবলমাত্র দৈনন্দিন জীবনের বাহক তখন জীবননিষ্ঠা কাব্য সৃষ্টি হবে কি প্রকারে? সুধীন্দ্রনাথ মুক্তচ্ছন্দে **(Free Verse)**র সংজ্ঞা নির্ধারণ করলেন নিম্নোক্ত পংক্তিগুলোতে :

"এবং গদ্য-পদ্যের স্বভাব যদি সত্যিই বিভিন্নধর্মী হয়, তবে বিশুদ্ধ গদ্যে অথবা বিশুদ্ধ পদ্যে উক্ত জীবননিষ্ঠ কাব্য কিছুতে গড়া যাবে না— তার জন্যে প্রয়োজন এমন এক বাহকের যার মধ্যে কোনও বাছ-বিচার নেই, যাতে খুশীমতো গদ্য থেকে পদ্যে এবং পদ্য থেকে গদ্যে যাতায়াতের পথ রয়েছে। কাব্যের এই ধাতুসঙ্করে নির্মিত আধারটির নামই মুক্তছন্দ— **free verse.**' এবং এ কারণেই মুক্তছন্দের কণ্ঠে 'সাধারণ মেয়ে'র সুস্থ, সবল

উক্তি যেমন অব্যাহত বেজে ওঠে, 'বিশ্বলোক'-এর মহানুভবতা তেমনই শোভন লাগে। তার প্রশস্ত পথে 'ছেলেটা'ও খেলে বেড়ায়, আবার 'শিশুতীর্থে-এর যাত্রীরা মিছিল করে এগিয়ে চলে।' বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান যে কত অসীম সে কথা আজ নিঃসংশয়ে সবাই মানে বটে কিন্তু ছন্দ যার হাতে পড়ে আজ এত সমৃদ্ধ তিনিই যে আবার পরবর্তীকালে ছন্দের গ্রন্থি-মোচনের জন্য বদ্ধপরিকর হবেন সেই কথাটা আজও আমরা ভাল বুঝি না। এবং যে প্রতিভা 'বলাকা' রচনার পর শুধুমাত্র ছন্দের পূর্বসংস্কার ঘোচাবার জন্য 'পলাতকা' লেখেন সে প্রতিভার মূল্য নিরূপণ কোনমতেই সহজ নয়। কিন্তু 'পলাতকা'কে অন্তর্মিলের মোহ রবীন্দ্রনাথের ঘুচল না তবে নিছক গদ্যে নিরেট পদ্য বচনার প্রয়াস তাঁর বেড়ে গেল এবং তার সার্থক প্রকাশ 'লিপিকা'র প্রথমাংশে এবং সুধীন্দ্রনাথের মতে 'পুনশ্চ' ও 'পরিশেষে' তাব চূড়ান্ত। তিনি বলেন, 'এই গ্রন্থ দুখানিতে রবীন্দ্রনাথ ভাষা, ধ্বনি ও প্রসঙ্গের দিক দিয়ে যেখানে পৌঁচেছেন, তার পরে এগোনো অসম্ভব।

সুধীন্দ্রনাথ জন্মগতভাবে অবিশ্বাসী—অবিশ্বাসী যেমন তিনি কবিতার ভবিষৎ উৎকর্ষ সম্পর্কে, তেমনি মানবপ্রগতিতে। রবীন্দ্রনাথের মূল্য নিরূপণে তিনি যে-দূবদর্শিতার, যে-অন্তবঙ্গতার যে তীক্ষ্ণতার পরিচয় দেন তা অসামান্য। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তারপরে আমরা আর কিছু করতে পারব না এই আত্মনিন্দা প্রায় অসহ্য। গদ্য-পদ্যের দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথ মিটিয়েছিলেন একথা শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার কবি কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'তপস্যা-কঠিন রবীন্দ্রনাথেব পক্ষে যেটা মোক্ষ, আমাদের ক্ষেত্রে তা হয়তো সর্ব-নাশেব সূত্রপাত' তখন তার তীব্র প্রতিবাদ না কবে পারি না। কারণ রবীন্দ্রনাথের তিরোভাবের পবেও বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি অব্যাহত এবং কাব্যের ক্ষেত্রে দিগ্‌ভ্রান্তি আজও ঘোচে নি বটে তবে অধ্যবসায়ী প্রতিভার পথানুসন্ধানও থামে নি।

সুধীন্দ্রনাথ ওয়ার্ডসওয়ার্থেব মতো গদ্য ও পদ্যের ভাষার সমীকরণে বিশ্বাসী ছিলেন না। কাবণ দৈনন্দিন যে ভাষা মানবসমাজ কর্তৃক ব্যবহৃত হয় তা পদ্যে স্থান পেতে পারে না। তিনি বলেন, 'এই প্রভেদ গদ্যের ও পদ্যের স্বভাবগত। গদ্যের অবলম্বন বিজ্ঞান, কাব্যের অন্বিষ্ট প্রজ্ঞান।

বাংলা পদ্যের মেরুদণ্ডহীন শৈথিল্যকে তিনি কোনদিন সুনজরে দেখেননি। মালার্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণের প্রধান কারণ মালার্মের 'সংহত স্বল্পভাষ ব্যঞ্জনাময় প্রকাশশৈলী।' প্রয়োজনবোধে তিনি অপ্রচলিত সংস্কৃত, গ্রামীণ অসাধু এবং বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেছেন আবার তাঁর হাতেই কোনও কোনও শব্দ নতুন করে অর্থান্বিত হয়েছে, অন্ত্যজ শব্দ চলিত বাংলায় সম্মানিত স্থান দখল করেছে। তাঁর গদ্যে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার অঢেল বলে তার উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু দুটি অসাধু গ্রামীণ ক্রিয়াপদকে তিনি যেভাবে ব্যবহার করেছেন তা লক্ষণীয়—ক্রিয়াপদ দুটি হ'ল 'মজানো' ও 'ভজানো'। জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীও অনেক সময় সাহিত্যিকের শব্দচয়নকে প্রভাবিত করে এবং সুধীন্দ্রনাথের বেলায় এই কথাটি খুবই সত্য। কারণ নেতিবাদী জীবনদর্শনের জন্য তাঁর শব্দভাণ্ডার বিষণ্ণ।

সুধীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গী প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য যেহেতু আজও শ্রদ্ধেয় তাই তাঁর উক্তিই স্মরণযোগ্য: সুধীন্দ্রনাথ **'thought out each sentence completely in English translating it, almost word for word, into a rich and fabulous Bengali'.** অন্যত্র তিনি বলেন, **'This prose, produced cerebrally, with almost a fastidiousness might effect, appear to be the work of highly gifted European who has taken the trouble of studying first Sanskrit and then Bengali, and the additional trouble of speaking out his mind of European and Bengali literaturcs in the comparatively insufficient language of the latter' (An Acre of Green Grass).** সুধীন্দ্রনাথের গদ্য সম্বন্ধে এই করুণ অভিজ্ঞতা বুদ্ধদেব বসুর একার নয় সকল বাঙালী পাঠকেরই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পাঠশেষে সুধীন্দ্রনাথ কাউকে অপুরস্কৃত রাখেন না, উপরন্তু তাঁর গাণিতিক ও সংহত গদ্য পাঠকের বিশৃঙ্খল চিন্তায় এবং অপটু পাঠাভ্যাসে এক অভূতপূর্ব সামঞ্জস্য আনয়ন করে।

উপসংহারে একটি কথা না বললে অকৃতজ্ঞতার দায়ে দায়ী হতে হয়। তা হ'ল এই যে, যে-কবি অনুভব করেছিলেন:

> মৃত্যু কেবল মৃত্যুই ধ্রুবসখা
> যাতনা শুধুই যাতনা সুচিরসাথী।

সেই নিঃসঙ্গ যাত্রীর যন্ত্রণাময় উপলব্ধি যতই নেতিবাদী কিংবা যতই বিষাক্ত হোক না কেন, তাঁর প্রতি আমাদের মমত্ববোধ ও সহানুভূতি আন্তরিক। 'বিরূপ বিশ্বে' তাঁর নিয়ত একাকীত্ববোধ অমানুষী নয় বরং অনুভব করি, আজ তিনি আমাদের মিলিত অগ্রগতির অন্যতম সঙ্গী।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

বাঙলা সমালোচনা প্রসঙ্গে

আমরা যে যুগের অধিবাসী হবার দুরদৃষ্ট লাভ করেছি, রুচির বিচারে সে যুগ আধুনিক বাঙলা দেশের সবচেয়ে দুশ্চরিত্র সন্তান। বাঙালী সংস্কৃতির এ এমন একটা যুগ যখন কাল অভাবিত দুর্ঘটনায় আত্মাহীন, শরীর ব্যভিচারী, বোধ অশিক্ষিত ও রুচি গর্হিত। গত একশ বছর সাহিত্যক্ষেত্রে নির্বাব অতিবর্ষণের পর অনিবার্য শীত নিষ্ফলা অধিকার নিয়েছে এক্ষেত্রের। এই যুগে মহাকবির বংশধরেরা মৌন, খ্যাতি ক্ষণ-জীবী, কবিকল্পনা উদ্ভাবনহীন এবং একটানা রোদ্দুরের দুঃশীল তাপে শতাব্দীব্যাপী প্রেরণা অবসিত। এযুগে গ্রন্থসংখ্যা বেড়েছে অবিশ্বাস্য হারে, পাঠকসংখ্যা আমাদের পূর্বসূরী অগ্রজদের দুশ্চরিত্র ঈর্ষার বিষয়। তবু শুকিয়ে গেছে সেই মজ্জা—সেই কান্তিমান আলো—যাকে আমরা নাম দিই স্বাস্থ্যবান প্রেরণা।

সবচেয়ে খেদের কথা, রুচি নেই এ যুগের। মানতেই হবে—নেই। নিজের প্রতি জন্মান্ধ বিশ্বাসে শতভিন্ন কোনো বক্তাক্ত নায়ক এযুগে আমরা দেখছি না। গাছের মত মহান ব্যক্তিত্ব নিয়ে কেউ দাঁড়াতে পারছে না। দাঁড়াতে পারছে না সেই রুচির উদ্ভাস; কিংবা সেই বিকীরক সার্বজনীন স্তম্ভ, যেখান থেকে বৈদগ্ধ্যের উন্নতমান প্রক্ষিপ্ত হতে পারে জানালায় জানালায়। সংশয় এবং নৈরাশ্য, নিঃস্বতা ও ক্ষয় অধিকার করে ফেলেছে আমাদের যুগের মহত্তম হৃদয়। স্বকীয় আত্মশক্তির অধর্ষ বিশ্বাসে কোন গভীর আরণ্যক লিখিত হচ্ছে না।

ফলে, মানতেই হবে, নিদারুণভাবে অভিভাবকহীন আমাদের এই সমকাল। জ্ঞানের ব্যভিচার, বুদ্ধির আলস্য, চিন্তার নিস্পৃহতা নিঃশেষ করেছে এই নিষ্ক্রিয় যুগের মেরুদণ্ড। মাংসকাম ও স্বর্ণলালসা শুদ্ধতম

চৈতন্যকেও শবের দুর্গন্ধ দিয়েছে। এবং সেই অমানুষিক ক্লেশ, সেই উদ্যম, স্পৃহা, উৎসর্গ, কোনো নিশ্চিত উদ্দেশ্যে নিরাপোষ আনুগত্য ও তিতিক্ষা—ভারতীয় পরিভাষার সেই 'সাধনা'—শুদ্ধতম চৈতন্য যার ফসল, অনুপ্রেরণা ও সৎ অন্বেষা যার ফলদ পোষ্টাই—'ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, ব্যবহৃত শরীর' এই যুগে—স্থূল, মুদ্রাসর্বস্ব, ব্যভিচারী। বৈশ্যের পণ্যের গর্হিত প্রেরণা সবচেয়ে অনুপ্রাণিত শিল্পীর তুলিকেও অধিকার করেছে।

অথচ এই ওষ্ঠহীন আলোহীনতাকে বাঙালী সংস্কৃতির চিরকালীন পরিচয় ভাবলে ভুল হবে। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন কাল দূরস্মৃতি নয় যখন শত-কর্তৃত্ব বিভক্ত বাঙলা সাহিত্য নৈরাজ্য ও অবাধ স্বৈরাচারের বর্বর ত্যাজ্যপুত্র হয়ে ওঠেনি। যখন কোনো গভীর কণ্ঠস্বরকে নিরর্থ করবার ধৃষ্ট ষড়যন্ত্রে এক হাজার একশ অর্ধশিক্ষিতের বিরতিহীন স্বর অকথ্য উল্লাসে সোচ্চার হত না। পক্ষান্তরে সর্বজনমান্য কোনো না কোনো ব্যক্তিত্ব সব সময়েই এই সাহিত্যের অলিখিত চালকের ভূমিকা নিয়েছে। সুশীল জ্ঞান এবং মেধাবী উপলব্ধি ফলবান মর্যাদা পেয়েছে। মোট কথা ধী কিংবা শালীন শিক্ষা ও সাবালক রসবোধ সাহিত্য আলোচনায় অত্যাবশ্যক সামগ্রী হিসেবে গণ্য হত।

ফলে সে যুগের সাহিত্য সমালোচনার একটা ন্যূনতম মান লক্ষ্য করা গেছে। ন্যূনতম মান—উক্তিটি করবার সময় সেকালের মহত্তর সমালোচনা কীর্তিগুলোকে আমি শুধু ধরছি না। সে যুগের সাধারণ অনেক লেখকের অসংখ্য অপরিগণিত রচনাও এর সাক্ষ্য হিসেবে কাজ করবে। সে-সব রচনাদৃষ্টে অন্তত এটুকু ধারণা জন্মাতে বাধ্য যে সাহিত্যের সমালোচনার জন্যে সেকালে একটা ন্যূনতম শিক্ষা এবং যোগ্যতাকে অপরিহার্য মনে করা হত (যা এখন হয় না)। সেটুকুর অনটন হলে সে যুগের কোনো সাহিত্যকারের হাত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হতে লজ্জিত হত। মোটকথা নিখাদ সাহিত্য প্রেরণা, সমালোচনার মহান-আদর্শ ও 'সংস্কৃত' রুচিবোধ এই যুগের গায়ে শ্রদ্ধাবান লেবেল ঝুলিয়েছিল। এবং বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচনাগুলো এই যুগেরই উৎপাদন।

তবু বাঙলা ভাষার সমালোচনা সাহিত্য এখন পর্যন্ত সদর্থে দরিদ্র। এর কারণ সম্ভবত এই যে বাঙলা ভাষার 'যথার্থ' সমালোচক প্রতিভারা কেউ প্রধানভাবে সমালোচক হতে চাননি। এঁদের প্রায় সকলেই স্বভাব-ক্ষমতায় 'সৃষ্টিশীল' প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলে তাঁদের লেখনীর সাগ্রহ

পক্ষপাত সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যকর্মে যতখানি কালির যোগান দিয়েছে সমালোচনার ব্যাপারে ততখানি দেয়নি। উপরন্তু তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের গঠন যুগের লেখক। তাঁদের স্বকালীয় বাঙলা সাহিত্যের দরিদ্র হাত ধনবান হবার দ্রুত প্রয়োজনে তাঁদের কাছে অজৈব সমালোচনার চাইতে সৃষ্টিধর্মী রচনার নিদ্রাহীন অবিরাম উৎপাদন প্রার্থনা করেছিল। এ কারণেই সে যুগের শ্রেষ্ঠ সমালোচক প্রতিভারা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ এই প্রত্যঙ্গটির স্বাস্থ্যচর্চায় অমনোযোগী এবং বহুলাংশে নির্বিকার। উপরন্তু বহুজনে তা নিরর্থক ভাবতেন।

বংকিমচন্দ্র—যাঁকে আমি বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক প্রতিভা ভেবে থাকি —তাঁর বিশালদেহী প্রতিভার সামান্য অংশ সমালোচনায় নিয়োগ করেছিলেন। অবশ্য এই অনীহা উপরোক্ত কারণে নয়। এর জন্যে দায়ী তাঁর স্বকালের বাঙলা সাহিত্যের অবিশ্বাস্য দারিদ্র্য। মনে রাখা দরকার যে এই সাহিত্যের প্রায় একটা অতীতবিহীন যুগে তিনি জন্মেছিলেন; যখন অতিজীবিত লেখক বা দীর্ঘায়ু গ্রন্থ এই সাহিত্যে সদর্থে অপ্রতুল। সমালোচনা করার মত যোগ্য গ্রন্থ বা যুগন্ধর লেখক এই সাহিত্যে তখনও দুর্লভ ছিল। মোটকথা তাঁর স্বকালীন বাঙলা সাহিত্য তাঁকে সমালোচনার ক্ষেত্র দেয়নি। তবু সাহিত্যালোচনার স্বল্পায়তন ভূখণ্ডে তিনি জবিপ প্রতিভার যে অজাতশত্রু নিদর্শনের স্থপতি, পরবর্তী একশ বছরের বাঙলা সাহিত্য তার সমকক্ষ কিছু আজ অবধি দিতে পারেনি। আমি এমন কথা বহুবার একাকী ভাবতে ভালবেসেছি যে বংকিমচন্দ্র যদি আজীবন সাধনার দুরূহ চর্যায় তাঁর গম্ভীর, লোমহর্ষক, অলৌকিক এবং প্রতিভাময় উপন্যাসগুলোর বিশাল ঘটনে বিস্ময়বহুল সৃষ্টি প্রতিভার ব্যবহার না করতেন, নিরুদ্যোগ উৎসাহে ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কিত মনীষাদীপ্ত রচনায় থাকতেন অনুদ্যোগী, কেবল ভূয়িষ্ট বোধ ও সন্তত সানুকম্পদৃষ্টিতে রেখে যেতেন সাহিত্য সম্বন্ধীয় তাঁর বোধিসত্ত্ব উক্তিসমূহ তবু মনীষাধর নিষ্ঠাগতদের মধ্যে বাঙলাদেশে তাঁর স্থান খুব ছোট হত না।

রবীন্দ্রনাথ যখন মধ্যবয়সে তখন বাঙলা সাহিত্যের নতুন শহর-প্রকল্প অনেকখানি গড়ে উঠেছে এবং কয়েকটা বিস্ময়কর অট্টালিকার নির্মাণকার্য সমাপ্ত। মোটকথা সাহিত্য সমালোচনার একটা যোগ্যক্ষেত্র তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, স্ব-স্বভাবে রবীন্দ্রনাথ সমালোচক ছিলেন না। তাঁর সমালোচনায় সাহিত্যের সর্বজ্ঞ দৃষ্টি নেই যে দৃষ্টি ব্যাপ্ত, গভীর,

সর্বদর্শী—যা ছিল বংকিমের (১)। তাঁর সমালোচনায় সম্রাটের উদারতা আছে; বহুদৃষ্টিসম্পন্ন বিচারকের প্রবুদ্ধ অনুধাবন নাই। (তিনি সাহিত্যের কোনো বিশেষ দিকের ওপর তীব্র, জোরালো ও ব্যক্তিগত আলো ফেলে সাহিত্যকে উপলব্ধি করতেন। এবং এইসব উপলব্ধিগুলোকে এমন প্রোজ্জ্বল, প্রতিভাময় কবিতার ভাষায় কথা বলাতে পারতেন যে সে উজ্জ্বলতার পাশে অনেক ঋদ্ধ উচ্চারণকেই নিষ্প্রভ মনে হতে বাধ্য।)

ঋদ্ধিমান সমালোচনায় তাঁর লোকোত্তর প্রতিভা যে সায় দেয়নি, তার কারণঃ সাহিত্যের সমস্ত বিষয়ে তাঁর অদ্ভুত, অস্বাভাবিক অযৌক্তিক শ্রদ্ধা। সাহিত্যের যে-কোন চেষ্টাকেই তিনি শ্রদ্ধেয় মনে করতেন; ফলে সমালোচনাকে তিনি ভাবতেন সশ্রদ্ধ প্রশংসা। 'সমালোচনা পূজা, সমালোচক পূজারী'—এই উদ্বেলিত অদ্ভুত মতের নিশ্ছিদ্র প্রতিভূ ছিলেন তিনি। এবং এমন অলীক ও শ্রদ্ধেয় ভাষায় তিনি তাঁর বিস্মিত পূজা সমাধা করতে পারতেন যে সেই লোকশ্রুত স্তবক্ষমতায়, (তাঁর জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে), ঢের নিরেট অসুরও দেবতা হয়ে উঠেছে। তাঁর সমালোচনায় অনেক সিদ্ধার্থ রচনার সংগে ঢের অপাঠ্য গ্রন্থেরও অনিন্দ্য বন্দনা খচিত হয়েছে অসংখ্য অত্যুজ্জ্বল শব্দে, ঢের সাধারণ লেখক তাঁর বিস্ময়কর বাক্যরাজির অবিস্মরণীয় প্রাসাদে অমর ঘর পেয়েছে। এই মনোরম শ্রদ্ধাচর্চা, তাঁর সমযুগের বহু দরিদ্র রচনাকে অসামান্য উচ্চতা দিলেও বাঙলা সাহিত্যে বিশ্বস্ত সমালোচনা দেয়নি। মোটকথা তিনি সাহিত্যের নিরাসক্ত সমালোচক হন নি; সম্ভবত হতে চান নি। বাঙলা সাহিত্যের ক্ষমাশীল প্রগাঢ় পিতা ও লালনকারী হিসেবে এই সাহিত্যের কোনো শিশু উদ্যমকে স্পষ্টোক্তির নির্বিবেক আঘাতে প্রহত করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। হয়ত এইজন্যেই সমালোচনার কঠিন দায়িত্ব থেকে আজীবন পালিয়ে বেড়িয়েছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনাসমষ্টির তুলনায় সমালোচনা বিভাগ যে সংখ্যাস্বল্পতায় অস্বাভাবিক দীন, ব্যাপারটি ভেবে দেখার মত।

সমালোচনার দণ্ডময় দায়িত্বকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হল বলে সমালোচনা সম্বন্ধে তিনি যে মতবাদ ব্যক্ত করলেন, তাও বহুলাংশে পলায়নবাদী।

১. না মানলে ভুল হবে যে বাঙলা সাহিত্যের প্রধান ক্ল্যাসিক্যাল লেখক মাইকেল নন, বংকিম। তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে সৎ মন্তব্যঃ তিনি সর্বজ্ঞ। এক একবার মনে হয়, জীবনের সব রহস্য, সব গভীরের শেষ দেখেছেন তিনি; সব সমস্যার সমাধান জানেন। বাঙালী লেখকদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে 'প্রৌঢ়'। তিনি সবচেয়ে ভারসাম্যময়। সবচেয়ে সর্বদর্শী, সর্বগামী ও স্মিত; প্রগাঢ়, সৌম্য, ব্যথিত ও রোদনময়।

'সাহিত্য সমালোচনা' সম্বন্ধে তাঁর মত হয়ে দাঁড়াল যে তা যদি সমালোচনা না-ও হয়, অন্তত সাহিত্য যেন হয়। কেননা সময়ের লোনা জল ঢুকে যদি আগামী যুগে ক্ষয়ে যায় তার অস্থি, তার সব অকাট্য যুক্তিগুলো যদি একে একে ঝরে যায় কালের হাওয়ায়, তবু বেঁচে থাকবে তার সৌন্দর্য, —সেই শিল্পের আলো—যে লাবণ্যময় শরীর সময়ের দাঁতের তীক্ষ্ণ উল্লাস অনায়াসে পার হয়ে বেঁচে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা এই রূপবাদী মতবাদের প্রোজ্জ্বল প্রতিনিধি। তাঁর সমালোচনা নান্দনিক বিচারে সর্বত্র অভ্রান্ত না হলেও দেবতাত্মা সাহিত্য। এবং এত আলোকোজ্জ্বল, এত অতুলনীয় ও রমণীয় এই সাহিত্যশরীর যে সেই অবিশ্বাস্য প্রসাদগুণের বিশ্বজিত আভায় সেগুলোর দুর্বলতা চোখে পড়ে না (কিংবা হয়ত সেই সুদর্শন সাহিত্যত্বকের বিখ্যাত আড়ালে তাঁর সমালোচক অক্ষমতা ঢাকা পড়েছে!) কিন্তু নিজের সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ অভ্রান্ত। যদিও এর আদ্যন্ত সততায় আমার সন্দেহ আছে, তবু এত সম্পূর্ণ, সজ্ঞান, সপ্রস্থ ও তলদেশময় এই আলোচনা, এত স্বয়ম্ভর ও প্রবুদ্ধ যে, মাঝে মাঝে ভুল করে ভাবতে ভাল লাগে যে তাঁর রচনা সম্বন্ধে শেষকথা তিনি বলেছেন। এবং কোনো বিশাল ঘটনে কাল-পরিবর্তন না ঘটলে ও আমাদের যুগায়ত অনড় ভাবনা-সমূহের আমূল বদল না হলে তাঁর নিজস্ব মতবাদের বাইরে গিয়ে তাঁর রচনার ওপর ভিন্নতর আলোকক্ষেপ দুরূহ। তাঁর মৃত্যুর পর শতাব্দীর এক-চতুর্থ পার হবার পরও যে তাঁর সম্বন্ধে কোনো মহাপ্রাণ কণ্ঠ নতুন উপলব্ধি ঘোষণা করল না, ব্যাপারটা তলিয়ে দেখার মত।

একজন যোগ্য সমালোচকের দরকারী শিক্ষা ও প্রবুদ্ধ প্রতিভায় অধিকার ছিল প্রমথ চৌধুরীর। তবু তাঁর সমালোচনা যে সংখ্যাস্বল্পতায় পাণ্ডুর, তার কারণ: সাহিত্য-ব্যাপারে প্রমথ চৌধুরী দায়িত্বশীল ছিলেন না। রবীন্দ্র-নাথের দ্বারা প্ররোচিত ও নিযুক্ত না হলে তাঁর বৈদ্যুতিক রচনাসমুদয় বাঙলা সাহিত্যের হাতে আসত কি না সন্দেহ। (স্মর্তব্য যে নোবেল-প্রাইজ উত্তর যুগের রবীন্দ্রনাথ অভিমান-ক্ষুব্ধ উদ্ধত ব্যবহারের জন্যে বাঙলাদেশের সাহিত্য সমাজে প্রায় একঘরে হন। ফলে অনেকটা তাঁর বিপুল প্রজননের একক বাহনের দরকারে সবুজপত্র প্রকাশের বিষয় চিন্তা করেন। এই দুরূহ সংকটে প্রমথ চৌধুরী নিযুক্ত হন 'উজ্জ্বল উদ্ধার' হিসেবে। প্রধানত এই সবুজ পত্রের দরকারেই প্রমথ চৌধুরীকে ব্যাপক

সাহিত্য চেষ্টার সংগে জড়াতে হয়)। জড়াতে হয়, তবু গভীর দায়িত্ব-শীলতা তাঁকে অধিকার করেনি। স্বেচ্ছায়, স্বভাব আগ্রহে বেছে নিলেন তিনি বাঙলা সাহিত্যের প্রজ্ঞাবান বিদূষকের পদ। মাঝে মাঝে প্রগাঢ় হয়ে ওঠার মহৎ সদিচ্ছা দেখালেও মূলত দায়িত্বহীন সাহিত্য খেলা নিয়ে নিমগ্ন রইলেন (২)। সাহিত্যে ভাঁড়ামি যতখানি দিলেন, ভার দিলেন না ততখানি। ফলে শেষ অবধি দুঃখ করে যেতে হল এই বলে যে বিদূষ-কের ঘাতক ছদ্মবেশ তাঁকে লোক ঠকানোর সংগে নিজেকেও ঠকিয়েছে; এবং তাঁর লোকশ্রুত হাস্যরসের সপ্রতিভ পাপ, বুদ্ধির অজান্তে তাঁর গুরু কথাকে লঘুর লেবেল দিয়েছে এবং অর্থহীন ভাড়ামিকে গম্ভীব কথা বলে বাজারে চালাচ্ছে।

সাহিত্যব্যাপারে প্রমথ চৌধুরী যে দায়িত্বময়তা অনুভব করেননি, তা করেছিলেন মোহিতলাল। সাহিত্যের জন্যে একটা বন্য, জান্তব, পেশী-বহুল প্রেম ছিল তাঁর। বাঙলা সাহিত্যকে তিনি ভালবাসতেন কোন সমৃদ্ধ গোত্রের আদিম জননীর মত; বলা যায়ঃ জন্তুর মত পশুর মত জন্মান্ধ এই আসক্তি, কামুকের মত, ধর্ষকের মত, উদগ্র, লোভী, ক্ষমাহীন, নিষ্কৃতিহীন ও বিভীষণ। সাহিত্যকে তিনি নিজের দেহের রক্তমাংস অস্থি-ধমনীর সংগে তুলনীয় ভাবতেন। এই জন্যে এই সাহিত্যদেহে কোনো আততায়ী অভিঘাত বা মৃদুতম পচন তাকে অস্বস্ত করত। সাহিত্যের কুশল চিন্তায় তাঁর সতর্ক, উদ্‌গ্রীব ও প্রহরী আগ্রহ ও এর স্বাস্থ্য-রক্ষায় তাঁর নিদ্রাহীন উৎকণ্ঠাই তাঁকে এই সাহিত্যের ভয়ংকর দেহরক্ষক করে তোলে—তিনি বাঙলা সাহিত্যের ক্ষমাহীন সমালোচক হয়ে দাঁড়ান। স্বাধিকার নিয়োগে তাঁর যে হাত মূর্খের ভিড় হটিয়ে বাঙলা সাহিত্যের মাথার উপর রাজছত্র তুলে ধরল সে হাত নির্ভীক, ঋজু, অনমনীয় ও পরাক্রান্ত; নিদ্রাহীন, বিশ্রামহীন, স্বাস্থ্যময়, সনাতন ও সোচ্চার।

বাঙলা সমালোচনার ক্ষেত্রে মোহিতলাল একারণে দীর্ঘদিন স্মরণীয় থাকবেন যে এদেশে তিনিই প্রথম সমালোচক যিনি সমালোচনাকে সাহিত্য সাধনার প্রধান অবলম্বন করেছিলেন। ভুললে অপরাধ অবশ্য যে রবি-

২. একথা যেন আমরা না ভুলি যে 'লেখা লেখা খেলা' কথাটি তাঁরই উদ্ভাবন। আজীবন শুধু খেলা—সমস্ত ব্যাপারে—শুধু খেলা করতেই তিনি ভালবাসতেন। তাঁর সাহিত্য এই বয়সহীন নাবালক খেলার শিকার হয়েছিল।

কবলিত অধুনা-মুখর বাঙলাদেশে মাইকেল এবং বংকিমের মত তৎকালে বিস্মৃতপ্রায় দুজন প্রগ্রাঢ়ের স্মরণীয় প্রত্যাবর্তন তাঁরই দান।

তবু তাঁর সমালোচনা বহুলাংশে বিফল। নিজের প্রতিভা ও সাহিত্য-বোধের ওপর একটা গরিলার মত বিশ্বাস ছিল তাঁর (সাহিত্যকেও তিনি একটা গরিলার মতই ভালবাসতেন)। তাঁর সারাজীবনের আলোচনাকে যে একচক্ষু ও উদ্ভটভাবে আসুরিক লাগে তার কারণ তাঁর ভেতরকার এই গরিলা। একটা পেশল জান্তব অসুরের মত তিনি চলতেন। স্বস্বভাবে তিনি ছিলেন দেহবাদী—শাক্ত ('দেহের দেহলী'র উপর মদনের দেউল রচনা করতে চাইতেন)। জীবনব্যাপী সাহিত্য আলোচনায় নিজকে তিনি প্রশ্ন বা আক্রমণ করেননি। নিজের বিশ্বাস ও সাহিত্য শিক্ষাকে খুঁটিয়ে দেখে, বিশ্লেষণ করে, রক্তাক্ত করে, নিজেকে নগ্ন ও বিবস্ত্র করে দেখা তাঁর জীবন-অভ্যাসের বাইরে ছিল। এ কারণেই, তাঁকে মনে হয় একজন মস্তকহীন হারকুলিস, যাঁর পেশীর বিশ্বজয়ী শক্তি প্রদর্শক আলো পায়নি। বাঙলা সাহিত্যের সমালোচনায় অভাবিত স্বাক্ষর রাখলেন তিনি, কিন্তু তবু হয়ে রইলেন সমালোচনা জগতের মূর্তিমান বিভীষিকা—'কালা-পাহাড়'; অনেকক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়, অবাঞ্ছিত ও বিরক্তিকর। তাঁর বলবান অতিবিশ্বাস তাঁকে ভারসাম্য থেকে বঞ্চিত করে।

সুধীন্দ্রনাথ গদ্যে রবীন্দ্রনাথের শব্দ ভাণ্ডারকে পুঁজি করলেও তাঁর গদ্যচরিত্র অরাবীন্দ্রিক। এর কারণ, মানস-গঠনে তিনি, রবীন্দ্রনাথ নন, বংকিমের সগোত্র। বংকিমের মত তিনিও ক্ল্যাসিকাল, প্রথাসম্মত, নিয়মা-নুবর্তী; বংকিমের মত গদ্যে যুক্তিনিষ্ঠার অবিচল সাধকত্ব করেছেন (৩)। তাঁর গদ্য বুদ্ধির জীবিত ইস্পাত ও এই গদ্য ঋজু, কঠিন ও সংহত। যুক্তির ছেনিতে পাথর কুঁদে বার-করা দেহ, বাহুল্যহীন, নিটোল, সমর্থ ও অস্থিময়। আজীবন তিনি মননের কংক্রিটকরা রাস্তায় হেঁটে গেছেন তাঁর গদ্যে,—শৈথিল্য, বিচ্যুতি ও পতনবিহীন।

যুক্তির এই ধাতব প্রাধান্যই রবীন্দ্রনাথের গদ্য থেকে তাঁর গদ্যকে আলাদা করেছে। শুধুমাত্র গদ্যে নয়, অন্যক্ষেত্রেও, এই মননমানতাই

---

৩. তবু তাঁর প্রবন্ধ অনবলীল; দুরূহ। দুরূহ, কঠিন ও পাণ্ডিত্যক্লিষ্ট। তাঁর প্রবন্ধ যে বংকিমের মত ঋদ্ধ নয়, তার কারণ তাঁর মধ্যে বংকিমের সর্বদেশময় জীবন-আস্বাদন নেই। বংকিমের মত তাঁর সমালোচনায় ভদ্রমহোদয় তত্ত্বগণ রসিকতার তুমুল সমাচারে গা ঢলাঢলি করে না।

তাঁর মহান প্রথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল। এই নিরাপোষ যুক্তিপ্রাধান্যই তাঁকে মহৎ ও দুর্বল রাবীন্দ্রিক সমালোচনা পদ্ধতি থেকে সরিয়ে এনে মননের নিরপেক্ষ ভূমির একক অধিকার দেয়। সুধীনদত্ত বাঙলা সমালোচনার ক্ষেত্রে লোকোত্তর অবদান খুব বেশী রেখে যাননি, তবু সাহিত্যের এই ধারায় দীর্ঘকাল স্মরণীয় থাকবেন এজন্যে যে এই ক্ষেত্রে আপোষহীন যুক্তিনিষ্ঠার ভিত্তিস্থাপন তাঁরই কীর্তি। তিনি সম্ভবত বাঙলা সাহিত্যের প্রথম সমালোচক যিনি সৎ অর্থে—'নিরাসক্ত'; 'বিজ্ঞানভিত্তিক'। সমালোচনায় অযথা উদ্বেলিত হননি তিনি কখনো। সাহিত্যশিক্ষার সংকীর্ণতা বা সাহিত্যবোধের ক্লীবতাব বাইরে বাস করেছেন তিনি। অর্থহীন স্তব ও অনুদার পক্ষপাত—কোনটাই তাঁর শাণিত মননকে অধিকার করতে পারেনি। মাঝে মাঝে 'নির্মোহের' প্রতি অতি মোহগ্রস্ততা তাঁর সাহিত্যবোধকে খণ্ডিত বৈকল্য দিলেও সুধীনদত্ত বাঙলা সাহিত্যেব অন্যতম সৎ সমালোচক।

বুদ্ধদেব বসু সাহিত্য প্রতিভা হিসেবে যতখানি, তাঁর চেয়ে বেশী তিনি সাহিত্যপ্রেমিক। তাঁর প্রেমে মোহিতলালের অধর্ষ পৌরুষ নেই; একটা স্পর্শকাতর যৌবনের সুকুমার সংবেদনশীলতা নিয়ে সাহিত্যকে তিনি ভালবাসেন।

তিনি বাঙলাদেশে আধুনিক সাহিত্যের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা। রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা 'কাব্য আন্দোলনের' প্রধান সংগঠক। সমকালীন সাহিত্য সম্বন্ধে ক্লান্তিহীনভাবে উৎসাহী, ক্লান্তিহীনভাবে বাঙময় ও ক্লান্তিহীনভাবে তৎপব। বাঙলা সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর নাম যে সব কারণে দীর্ঘায়ু হবে তার অন্তত একটি কারণ এই যে তিরিশের সাহিত্য আন্দোলনের (বিশেষত 'আধুনিক কবিতা' আন্দোলনের) প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি বহুলাংশে তাঁর জীবনব্যাপী সমালোচনার ক্লান্তিহীন, বিরতিহীন প্রায় একক চেষ্টার ফসল।

কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনায় সাহিত্যের নম্র, সুশীল ও সংবেদনময় অনুভূতি যে পরিমাণে আছে, ব্যাপ্ত, প্রশাখাময় ও তলদেশগামী অনুধাবন সে পরিমাণে নেই। বার বারই মনে হয়, সাহিত্যের স্বকময় উপরতলকে তিনি ভালো চেনেন। এবং হয়ত এজন্যই অপেক্ষাকৃত দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকেরা তাঁর রচনায় যতখানি পরিপূর্ণ, উজ্জ্বল, বিশদ ও মনোরম—প্রগাঢ়তর লেখকেরা ততখানি নয়। গভীর লেখকদের বেলায় তিনি

প্রায়শ অসমালোচকজনোচিত, পলায়নবাদী ; দায়িত্বশীল বিচারকে এড়িয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে তিনি বহিরঙ্গ প্রধান, বর্ণনামূলক, উদ্ধৃতিময়, উদ্বেলিত ও বাকবহুল।

পরিশিষ্ট

[এ রচনার স্বল্পায়তন বরাদ্দে, সংক্ষেপে, বাংলা সাহিত্যের প্রধান সমালোচকদের ঈষৎভাবে ছুঁয়ে একটা আলোচনা দাঁড় করাবার চেষ্টা আছে। আলোচনাটিকে আরও পরিসরময়, তথ্যবহুল ও সম্পূর্ণ করা যেতে পারতো। সংযোজিত হতে পারতো অনেক টীকা, উদ্ধৃতি ও উল্লেখ যাতে করে এই নিবন্ধের যুক্তিগুলোকে পাঠকের চোখে তুলে ধরা যায় নিকটতর যাথার্থ্যে। পরিসরাভাবে সে সব অনেক কিছুই স্থান দেওয়া গেলো না। এমনকি এই সাহিত্যের এমন অনেক সক্ষম সফল সমালোচক সম্বন্ধেও নীরব থাকতে হল, যাঁদের সমালোচনা এ যাবত বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঢের মহার্ঘ যৌতুক দিয়েছে—এবং এই সাহিত্যের সমালোচনার আলোচনায় যাঁদের নাম অনুল্লেখিত হলে অপরাধ। তবু একথা অল্পবিস্তর গ্রাহ্য যে, এই নিবন্ধে আলোচিত ব্যক্তিরাই বাঙলা সাহিত্যের প্রধান সমালোচক প্রতিভা, এবং এই সাহিত্যের সমালোচনা প্রাসাদের এঁরাই মূলস্তম্ভ। মূলস্তম্ভ, কিন্তু সংখ্যাদৈন্যে এঁরা দুঃখজনক। এত দুঃখজনক যে বাংলা সাহিত্যের কতিপয় উৎকর্ষময় শাখার পাশে সন্তত সৃষ্টির প্রাচুর্যের বিচারে সমালোচনাকে মর্যাদাবান উচ্চতায় নেওয়া দুরূহ হয়েছে। অথচ সাহিত্যের গত একশ বছরের অতিপ্রজ সৃজনশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে আরও প্রচুর সংখ্যক সিদ্ধার্থ সমালোচনা আমাদের হাতে আসবে, এমনটাই প্রার্থিত ছিল। আশা করা গিয়েছিল, ঢের নতুনতর লেখক সবলতর হাতে এই অসম্পূর্ণ শাখাটির নিত্যনূতন দিগন্ত উন্মোচনে যত্নবান হবেন, সংযোজিত হবে ভিন্নতর অভিজ্ঞতা, স্বাদ, দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুসৃত হবে নতুনতর পরীক্ষা ও প্রয়াস যার ফলে এই সাহিত্যকে শতদলে ছুঁয়ে বিক্ষত আক্রমণে কেটে কেটে যাচাই করে দেখা সম্ভব হয়। বলতেই হয় এই প্রত্যাশা বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছে।

এই নিবন্ধে বাঙলা সাহিত্যের প্রায় সবকয়জন সমালোচকের আলোচনা প্রসংগে আমি একটি দিকের প্রতি অংগুলিনির্দেশ করেছি : দেখাতে চেয়েছি তাঁদের প্রত্যেকের সমালোচনার অসংখ্য উজ্জ্বল দিক থাকা সত্ত্বেও, কোনো না কোনো ক্ষেত্রে এসে তাঁরা ব্যর্থ। এর কারণ, পূর্ণায়ত সমালোচক দৃষ্টির অভাব। উপন্যাস কি কবিতার মত, সমালোচনার ক্ষেত্রে, মহত্তম প্রতিভা আজ পর্যন্ত এ সাহিত্যে আসেনি। এটা বাঙলা সমালোচনার পক্ষে দুর্দৈব দুঃখের কথা। বংকিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—যাঁদের মধ্যে এই প্রতিভার উচ্চতম ব্যবহার লক্ষ্যযোগ্য হয়েছিল, তাঁদের সময়াভাব ও পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধাচার তাঁদেরকে সমালোচনের খণ্ডিত মূল্য দিয়েছে। এইজন্যেই বাংলা সাহিত্যের 'প্রধান ঔপন্যাসিক' কিংবা এই সাহিত্যের 'প্রধান কবি' বলতে যেমন আমরা চোখের সামনে একজন বা দু'জন যুগন্ধর ঔপন্যাসিক বা কবিকে দেখতে পাই, তেমনি 'প্রধান সমালোচক' শব্দটির সংগে সংগে কোনো একজন বা দুজন সর্ববাদিসম্মত প্রতিভা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান না। সমালোচনার ক্ষেত্রে

তাঁদেরকে, অপরাপর অনেক সমোচ্চারিত প্রতিভার কবল থেকে আমাদের খুঁজে বার করতে হয়—এবং এই কারণেই তাঁদের প্রতিভার অবধারিত শ্রেষ্ঠত্বে আমাদের সন্দেহ যায় না।

বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনার প্রভাব উত্তর-তিরিশের সমালোচনাকে উপকৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনায় এমন একটা লঘু ও আপাতশোভন দিক আছে যা সাহিত্যের উজ্জ্বল সাংবাদিকতার নামান্তর। আমাদের সমকালের ঢের সমালোচক প্রযত্ন যে মর্যাদাবান সার্থকতা পায়নি, তার কারণ, তাঁদের অনেকেই বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা পদ্ধতির এই প্রতারক দিকটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁদের অধিকাংশের প্রচেষ্টা সাহিত্যের অবাধ সাংবাদিকতা করেছে সমালোচনার মহৎ নামের প্রতারণায় এবং তথ্যকে নিজের অজান্তে সত্যের নামে বেনামী করেছে। গভীরতাহীন ও চোখ-ধাঁধানো চমকপ্রধান উক্তি করার প্রতি বুদ্ধদেবীয় লোভ যা সাহিত্যচেষ্টা হিসাবে অসাধু—তা আমাদের সমকালীন সমালোচনাকে প্রভাবিত করেছে। তিরিশোত্তর অধিকাংশ সমালোচনা যে দায়িত্বহীন মন্তব্যে দুঃশীল, তার মূলেও এই প্রবণতার দান আছে।

বুদ্ধদেব বসুর পর তরুণতর যাঁরা সমালোচনায় নেমেছেন, তাঁদের মধ্যে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যাঁর দিকে আঙুল নির্দেশ করে বলা যাবে, 'এই সেই প্রতিভা, যাঁর চেষ্টা, শ্রম ও সাফল্য বাঙলা সমালোচনায় যুগোত্তর কোনো ফসল দিতে যাচ্ছে'। সাহিত্যের জন্যে সেই ভালোবাসা, শ্রম ও দায়িত্ব নিয়ে কোনো সপ্রতিভ হাত এখন পর্যন্ত দেখা গেল না। গত দুই দশকে, ইতস্ততবিক্ষিপ্ত, যাঁরা সমালোচনায় হাত মকশ করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁদের খুব অল্পের চেষ্টার মধ্যেই সজ্ঞান দায়িত্বশীলতা সুলক্ষ্য হয়েছে। সমালোচনার এসব চেষ্টাগুলো প্রায়শ আকস্মিক, বিক্ষিপ্ত ও গভীর অর্থে উদ্দেশ্যহীন। আমাদের সময়কার অধিকাংশ সমালোচক প্রতিভা, এখনো, তিরিশের বহুল ব্যবহার-জীর্ণ সমালোচনা আদর্শের অক্ষম অনুকরণে অবসিত হচ্ছে। নিষ্ঠাবান সমালোচনার হাত, গত দুই দশকে, সাহিত্যের সপ্রেম কর্তব্যবোধের তাড়নায় উদ্যোগী আগ্রহ দেখিয়েছে খুব অল্পই।]

আসাদ চৌধুরী

সুকুমার রায়

'.....উন্মীলিত ইন্দ্রিয় ও মন দিয়ে শিশু যা কিছু আকাঙক্ষা করে থাকে, এবং যা কিছু তার বেড়ে ওঠার পক্ষে প্রয়োজন—তার বয়সোচিত পুলক পুষ্টি, সব যেন সাজিয়ে গুছিয়ে উপহার আনতো সন্দেশ, মাসে মাসে, সুদূর কলকাতার রহস্যময় সুকিয়া স্ট্রীট থেকে। মলাটে লাল কালিতে ছাপা থাকতো : প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, সম্পাদক : সুকুমার রায় বি. এস-সি। সহজ বুদ্ধিতে আমি বুঝে নিয়েছিলুম যে, এই দুজনের মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ এবং অধিকাংশ রচনা স্বাক্ষরহীন হওয়া সত্ত্বেও আমার অনুমান করতে দেরী হয়নি যে আশ্চর্য ছন্দমিলের কবিতাগুলোর লেখক যেমন পুত্র, তেমনি "পুরাতন লেখা" পর্যায়টিও স্বর্গত পিতার লেখনী থেকে বেরিয়েছিল।' (উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। বুদ্ধদেব বসু। সাহিত্য সংখ্যা, দেশ, বৈশাখ ১৩৭০)।

এবং

'এইসব অস্বাক্ষরিত গল্প কবিতা যে কার লেখা, সে বিষয়ে সন্দেশের তৎকালীন পাঠকরা ঠিক অবহিত না থাকলেও সারা বাংলায় তার প্রচার হতে বিলম্ব হল না—যখন হ-য-ব-র-ল আর আবোল তাবোল এই দুটি বই প্রকাশিত হল। শুধু তো বই দুটো নয়, প্রকাশিত হল প্রতিভা, অকাল-মৃত্যুর বেদনাজড়িত সেই বিস্ময় বাংলার চিত্তলোকে তরঙ্গ তুললো সেদিন। সোনার খাতায় নতুন একটি নাম উঠলো, নতুন একটি তারা ফুটলো আকাশে : সুকুমার রায়।' (বাংলা শিশু সাহিত্য : সাহিত্যচর্চা। বুদ্ধদেব বসু)।

বুদ্ধদেব বসুই বোধকরি সর্বপ্রথম সুকুমার রায়ের সামগ্রিক আলোচনায় ব্রতী হন। যদিচ তাঁর পটভূমি ছিল 'বাংলা শিশু সাহিত্য' তবু সেই

সীমিত গণ্ডীর মধ্যে একজন মিতভাষীর যতটুকু বলা প্রয়োজন, ততটুকু তিনি বলেছিলেন। আমরা, সুকুমার রায়ের একালের ভক্তকুল, তা 'আনন্দে' করেছি 'পান'।

লুই ক্যারল কি ডিফো যে পরিমাণে সমালোচকদের দ্বারা আলোচিত হয়েছেন, বাঙলা ভাষায় লেখার অপরাধে হ-য-ব-র-ল বা আবোল তাবোল-এর স্রষ্টা সুকুমার রায় বঙ্গভাষী সমালোচকদের দ্বারা প্রায় ঠিক সমপরিমাণেই অবহেলিত হয়েছেন; অর্থাৎ সাহিত্য সমালোচকগণ তাঁর আলোচনায় বোবার ভূমিকাই নিয়েছেন বরাবর। বাঙলা সাহিত্যের কোন ইতিহাস লেখকই তাঁর সৃষ্টির মান বা মূল্য নির্ণয়ে সচেষ্ট হননি। বরেণ্য সুকুমার সেন তাঁর অতি বৃহৎ 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের সুকুমার রায় সম্পর্কিত অনুচ্ছেদে কয়েকটি নির্ভুল সন তারিখের উল্লেখ করে এবং ততোধিক আন্তরিকতার সঙ্গে আবোল তাবোলকে **Nurseɪy Rhime** জাতীয় রচনা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং হ-য-ব-র-ল-কে **Alice in Wonderland**-এর অনুকরণে রচিত বলে ফতোয়া দিয়ে ঐতিহাসিকের ভূমিকা পালন করেছেন। সুকুমার রায়ের পুনর্বিচার ও নবমূল্যায়ণ শুধুমাত্র শিশু-সাহিত্যের মুখ রক্ষার খাতিরেই আবশ্যক নয়, তাঁর ভাষাতত্ত্বের ওপর গুরুগম্ভীর আলোচনা (যা শিশুদের পক্ষে নিঃসন্দেহে অস্বস্তিজনক) অবাঙালী পাঠকদের জন্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জনকের উপর লিখিত মূল্যবান প্রবন্ধটি এবং শিল্পকলা বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর জন্যও তাঁর সাহিত্যিক নবমূল্যায়ণ প্রয়োজন। বিষ্ণু দে সম্পাদিত 'একালের কবিতা' সংকলনে সুকুমার রায়কে দেখে অত্যন্ত আশান্বিত হয়েছি। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁকে যথার্থ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার প্রাথমিক দায়িত্ব অগ্রজ লেখকদেরই।

সুকুমার রায়ের মূল্যায়ণে একালের সমালোচকগণ সাধারণত যে সব অসুবিধায় পড়ে থাকেন, তার মধ্যে প্রধানটি হল: সমালোচকের পক্ষে তাঁর রচনাবলী সংগ্রহের দুষ্করতা। তাঁর পূর্ণ রচনা যথার্থ অর্থে দুষ্প্রাপ্য। কালানুক্রমে ও ধারাবাহিকভাবে সুকুমার রায়কে শুধুমাত্র তাঁরাই পড়ার সুযোগ পেয়েছেন, যাঁরা কলকাতার সেই রহস্যময় সুকিয়া স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত 'সন্দেশ'র নিয়মিত পাঠক ছিলেন (যাঁরা আজ আমার সাধ্যমত ঈর্ষার বিষয়।) অথচ কালানুক্রমিক রচনা না পড়লে লেখকের শিল্প-বোধের সম্যক পরিচয় থেকে যায় অসম্পূর্ণ এবং ঝাপসা, এবং কয়েকটি বাহ্যিক রীতির ওপর নির্ভর করেই সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে হয়।

এসব অসুবিধে গবেষণার দ্বারা এবং আত্মীয় বা পারিবারিক বন্ধু-বান্ধবের স্মৃতিচারণ জাতীয় রচনার দ্বারা দূরীভূত করা সম্ভব। বেশ কিছুদিন আগে সত্যজিৎ রায়ের একটি রচনা পড়েছিলাম উপেন্দ্র কিশোর সম্বন্ধে। রচনাটিকে আমার কাছে বেশ মূল্যবান মনে হয়েছিল। কিন্তু সস্তা সিনেমা পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় সেটিকে আজ আর কোন লাইব্রেরীতে পাওয়ার উপায় নেই। শুনেছি লীলা মজুমদারও নাকি উপেন্দ্রকিশোরের উপর লিখেছেন। সুকুমার রায়ের ওপর তাঁরা যদি লিখতেন তবে সুকুমার রায় সম্বন্ধেও অনেক তথ্য আজকে আমাদের হাতে থাকত। আমরা জানতে পারতাম 'ননসেংস ক্লাব'-এর মুখপত্র 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'-র কোন্ লেখা 'সন্দেশে'র কোন্ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল, সুকুমার রায়ের নিজস্ব গ্রন্থাগারে কার কার কেতাব ছিল, তাঁর প্রিয় লেখক-লেখিকা ছিলেন কারা, শৈশবে তিনি কাদের লেখা বেশী পড়তেন ইত্যাদি। (অবশ্য সুকুমার রায়ের শৈশব যে যুগে কেটেছিল সে যুগে বাঙলা শিশু সাহিত্যের দৈন্য ছিল অপরিসীম। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, পিতা উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীই বোধকরি তাঁর কালের শিশু সাহিত্যের আসর জাঁকিয়ে বসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশু সাহিত্যে হাত দেন জীবনের শেষ দিকে। অবনীন্দ্রনাথ অবশ্যি শিশু সাহিত্যের বিষয়ে ছিলেন তাঁর সমসাময়িক।) সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সন্দেশে' সুকুমার রায়ের পুরোনো লেখাগুলোর সংগে তাঁর আঁকা ছবিগুলো পর্যন্ত প্রকাশিত হচ্ছে (এখনও পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয় কি-না জানিনে)। এতেও আমরা সুকুমার রায়ের রচনার সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হচ্ছি।

'আবোল-তাবোল'-এর প্রচ্ছদচিত্র ছাড়াও ভিতরের ছবিগুলো, বিশেষ করে তাঁর প্রচলিত কাল্পনিক জীব-জন্তুর চিত্রগুলো আমাদের এখনো বিস্ময় উদ্রেক করে। প্রচলিত রীতি থেকে সুকুমার রায়ের আঁকা ছবিগুলো যে স্বতন্ত্র এটা যে-কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরই চোখে পড়ার কথা। জীব-জন্তুর জগতে তিনি বিচরণ করতেন (নীতিকথার ঈশপ স্মর্তব্য) ছড়ায়, শব্দে ও ছন্দের গাড়ীতে চড়ে। হাতে এঁকেও দেখিয়েছেন তিনি তাদেরকে। তার কুমড়ো পটাশ, রামগরুড় (এবং রামগরুড়ের ছানা), ট্যাশগরু, হাঁসজারু, বকচ্ছপ, হাতিমি, কিম্ভূত, হ্যাংলা, পান্তভূত ও তার ছানা, ভয়পেয়োনার জন্তু প্রভৃতি তাঁর কল্পনাশক্তি, মননশীলতা ও অপূর্ব শিল্পবোধেরই পরিচয় বহন করে। শিশু মনস্তত্ত্বে তাঁর অসীম অন্তর্দৃষ্টির কথাও আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিই।

নিসর্গের চিত্র তিনি যেখানে এঁকেছেন কথায় ও রঙ্গে, সেখানেও তাঁর স্বরচিত খেয়াল রসের পৃথিবীটা দেখা যায়, চেনা যায়, অনুভব করা যায় তাঁর কণ্ঠস্বরের মৌলিকতা। যেমন—রামগরুড়ের ছানা কবিতায় নিম্ন-লিখিত পংক্তিসমূহ—

'যায় না বনের কাছে কিম্বা গাছে গাছে
দখিন হাওয়ার সুড়সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে।
ঝোপের ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে
জোনাকি জ্বলে আলোর তালে
হাসির ঠারে ঠারে।....

এবং সন্নিবিষ্ট চিত্রে—বিরক্ত ও সন্দেহের দৃষ্টিতে রামগরুড়ের ছানার গুহায় অবস্থান, সামনের সাইনবোর্ডে বাঙলায় লেখা 'হাসি নিষেধ' গাছগুলোর হাসি হাসি মুখ এবং অস্পষ্ট মেঘগুলোর হাস্য পরিহাসময় সৌম্যকান্তি প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

আবোল-তাবোল-এর প্রচ্ছদটিও বিশেষত্বের দাবিদার। পাহাড়ের চূড়ায় একজন বৃদ্ধ আবৃত্তিরত (খুব সম্ভব কবিতা); বৃক্ষের শীর্ষে অপর বৃদ্ধ তামাক সেবনে ব্যস্ত, নড়বড়ে জোড়াতালি দেয়া মই দিয়ে আকাশের গায়ে 'আবোল তাবোল' লেখা চলছে, (অক্ষরগুলোর আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্যণীয়), নীল সোনালী আর ছাই রঙের আকাশ, একজন বড়শী দিয়ে ডিমে তা দেয়ারত পাখী ধরার জন্যে উদ্‌গ্রীব, ছাতা হাতে দৈত্যাকৃতি লোকের সঙ্গে দ্বন্দ্বরত এক বিরক্ত প্রৌঢ়, হাসি হাসি মুখ নিয়ে দৈত্যের দু হাতে পাথর আঁকড়ে থাকা পাহাড়ের আড়ালে ড্রাগনের মুখ, বর্শা হাতে পেশীবহুল বন্য শিকারী, লাল লম্বা টুপী মাথায় পরিতৃপ্ত, অনেকটা নির্বোধ জনৈক ব্যক্তি রঙচঙে জামা গায় দিয়ে কানে চোঙা লাগিয়ে ড্রাগন দর্শনে ভীত—হাতে চায়ের কাপ পড়ে যাওয়া অপর যুবকের আর্ত চিৎকার শুনছেন, যুবকের পরনে পাঞ্জাবী ও ফুলপ্যাণ্ট (হায়রে, এটা আবার তখনকার লেটেষ্ট ফ্যাশান) ও পায়ে নাগড়া। ছবির ডান কোণে লেখা **S. Roy,** মানে সুকুমার রায়। সত্যজিৎ রায়ের কয়েকটি ছবি বাদ দিলে প্রায় সব ক'টি ছবিই সুকুমারের আঁকা।—প্রবন্ধ লেখক এটা ধ্রুব জানেন হেন শিক্ষিত বাঙালী নেই যিনি আবোল তাবোল পড়েননি—তবুও প্রচ্ছদের খুঁটিনাটি লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে পুনরায় প্রচ্ছদের আজব চরিত্রটি মনে পড়িয়ে দেবার

চেষ্টা করা। ছবি, রঙ, জন্তু জানোয়ার, রাজারাণী, ভূত-প্রেত, খাদ্য, গল্প প্রভৃতি অবিশ্বাস্য অসম্ভবতাগুলো শিশুমনকে যতটা পরিতৃপ্তি দিতে পারে, তেমনটি অন্য কিছুতে পারে না। সুকুমার রায়ের ভাষা, শব্দ, ছন্দ, বিষয় নির্বাচন সর্বোপরি তাঁর প্রতিভাই তাঁকে শিশুমনের চাহিদার সৎ যোগান দিতে সহায়তা করেছে এবং বলাব ভঙ্গীর জন্যে, কলাকৌশলের জন্যে এখনো সমান আগ্রহে সুকুমার রায় আমি পড়ি যেমন পড়ি সাম্প্রতিক শামসুর রাহমান বা শহীদ কাদরীর কবিতা।

খ

একটা পরিবারের প্রায় সব লোকই শিশুসাহিত্য সেবায় প্রতিভা নিয়োগ করেছেন ও সাফল্যলাভ করেছেন এমন দৃষ্টান্ত স্বদেশে কি বিদেশে খুব বেশী নেই। বাঙলা শিশুসাহিত্যের ঐতিহ্য তাঁদের অবদানে সমৃদ্ধ। উপেন্দ্র পরিবারের পত্রিকা 'সন্দেশ' "বিশ্ব শিশুসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা।"

উপেন্দ্রকিশোরের পুত্র সুকুমার রায় শিশুসাহিত্যের চর্চাতে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর পুত্র সত্যজিৎ রায়ও শিশুসাহিত্যে দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর ছড়া পিতা সুকুমার রায়ের প্রভাব মুক্ততো বটেই এমনকি অন্নদাশঙ্কর রায় কি সাম্প্রতিক ছড়া লেখকদের চেয়েও তাঁর বলার ঢঙ্ আলাদা এবং ভিন্ন আবেদনের। বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম স্মরণীয় শিশুচরিত্র অপুর স্রষ্টা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পথের পাঁচালী, অপরাজিত উপন্যাসে বিম্বিত হয়েছে জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী' বাঙলার কিশোরী দুর্গা। জীবনলতায় কুসুমিত ও বিকশিত হয়েছে অপু। বাংলা সাহিত্যের সেই প্রিয় অপুকে যখন সিগনেটের শিশু সংস্করণ আম-আঁটির ভেঁপুতে রং-য়ের মাধ্যমে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব পড়ল জাঁদরেল প্রচ্ছদশিল্পী সত্যজিৎ রায়ের ওপর তখন কি পারিবারিক প্রেরণা ও ঐতিহ্যের দ্বারা সত্যজিৎ রায় আন্দোলিত হয়েছিলেন? জানিনে। কিন্তু 'সচিত্র সংস্করণের' ছবির সেলুলয়েডের বুকে অমর হবার যে বেদনা জেগেছিল সেদিন, তার সার্থক রূপায়ণ বিশ্ব বিমুগ্ধ বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছে। বাঙলার অপু সেলুলয়েডের অপু হয়ে সত্যজিৎ-এর মাধ্যমে বিশ্বজিৎ হয়েছে।

পিতা সুকুমার রায় ছিলেন ফটোগ্রাফির ছাত্র (বর্ণমালা তত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ: ফটোগ্রাফি, ভারতীয় চিত্রশিল্পী প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য) পিতামহ ছিলেন ছাপাখানার মালিক, সাহিত্য ও সঙ্গীত বিশারদ। পরিবারে

কুলদারঞ্জন ছিলেন সেকালের বিখ্যাত শিল্পী। এর ওপর সত্যজিৎ রায় নিজে শান্তি নিকেতনের কলাবিভাগের ছাত্র। আজ তিনি মানবমনের তরঙ্গাদি প্রকাশের সর্বশেষ ও আধুনিকতম মাধ্যম চলচ্চিত্রের একজন মহৎশিল্পী হিসেবে স্বীকৃত। চলচ্চিত্রের শাস্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞানে তাঁর পাণ্ডিত্য ও সৃজনশীলতা বিশ্বস্বীকৃতি পেয়েছে। একই সঙ্গে তিনি আলোকচিত্র-শিল্পী, সঙ্গীত-পরিচালক, কাহিনীকার, চিত্র-নাট্যকার, শিল্পনির্দেশক ও পরিচালক। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় সন্দেশের পুনঃপ্রকাশের জন্য আমাদের মত অভাজনেরও শ্রদ্ধার পাত্র। এ সবের পশ্চাতে পারিবারিক ঐতিহ্যের অবদান কম নয়। "সুবিনয় রায়, কুলদারঞ্জন রায়, সুখলতা রায় (রাও), লীলা রায় (মজুমদার), পুণ্যলতা চক্রবর্তী, দেবব্রত রায় চৌধুরী প্রমুখ মিলিয়া যেন একটি নক্ষত্রমণ্ডলী রচনা করিয়াছিলেন।" (বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রম-বিকাশ / আশা দেবী) বাংলা শিশুসাহিত্যের আলোচনায় উপরোক্ত নাম কটি অপরিহার্য। একটি পরিবারে সকলেই শিশুসাহিত্য সেবায় ও পুষ্টি সাধনে বিস্ময়করভাবে সক্রিয় ছিলেন। রায় পরিবারের সাহিত্য সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল সুকুমার রায়।

কোলকাতার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ব্রাহ্ম রায় চৌধুরী পরিবারে সুকুমার রায় জন্মগ্রহণ করেন ১২৯৪ সনে (১৮৮৭ খৃঃ)। প্রতিভাবান ও মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত হৈ চৈ প্রিয় এই ব্রাহ্ম যুবকটি পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রে সম্মানের সঙ্গে বি. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পর বৃত্তি নিয়ে বিলেতে যান ১৯১৯ সালে। সেখানে ম্যাঞ্চেষ্টার স্কুল অব টেকনলজীতে দু বছর ফটোগ্রাফী আর ব্লক তৈরীর কাজ শেখেন। সুকুমার রায়ের প্রত্যাবর্তনের পর পরই পিতা উপেন্দ্রকিশোর 'সন্দেশ' প্রকাশ করেন ১৯২০ সালে। ১৩২৮ সালে উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হয়। এরপর ১৩২৮—১৩৩৩ পর্যন্ত সুকুমার রায় যোগ্যতার সঙ্গে 'সন্দেশ' সম্পাদনা করেন। উপেন্দ্রকিশোর প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাটি ছিল সেকালে গ্রাফিক আর্ট শেখার একমাত্র 'স্কুল'। কুলদারঞ্জন ও সুকুমার রায় আবার চিত্তহর ছবিও আঁকতেন সন্দেশে। সুতরাং শিল্পগুণে অচিরেই বাঙলাদেশের শিশুদের মন জয় করে ফেললো 'সন্দেশ'। 'সন্দেশ' সুকুমার রায়ের সমগ্র শিশুসাহিত্য সাধনাকে ধারণ করে আছে।

সমগ্র সুকুমার রচনাবলী যিনি সম্পাদনা করবেন এবং এই মহৎ কর্মের জন্যে যিনি বাঙলা সাহিত্যের অনুরাগীদের কাছে ও বাঙলাভাষী অনাগত

শিশুদের কাছে যে পরিমাণে কৃতজ্ঞতার ন্যায্য দাবিদার হবেন তাকে এই 'সন্দেশ' পত্রিকার পুরোনো বাণ্ডিলগুলোর মধ্যেই শ্রম ব্যয় করতে হবে। সুকুমার রায় রচনাবলী উপেন্দ্রকিশোর রচনাবলী কবে প্রকাশিত হবে? বাঙলা সাহিত্যের এই বিশাল মহৎ কর্মটি কার দ্বারা সম্পাদিত হবে?

উঁচুদরের কুঁড়ে হওয়া সত্ত্বেও পত্রিকার প্রয়োজনে তাঁকে প্রতিমাসেই ছড়া গল্প নাটক লিখতে হ'ত। এই সব রচনা পরে 'আবোল তাবোল', 'পাগলাদাশু', 'খাই খাই', 'বহুরূপী' প্রভৃতি পুস্তকে সংকলিত হয়েছে। 'হ-য-ব-র-ল' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'সন্দেশ' পত্রিকায় (সুকুমার রায়/অনিল সেনগুপ্ত—বসুধারা, পঞ্চম বর্ষ, বৈশাখ ১৩৬৮)। 'বাঙলা দেশ হাসতে ভুলে গেছে, বাঙালী হাসতে জানেনা', কিন্তু যে বাঙালী হাসির গান, হাসির ছড়া হাসির নাটক লিখেছেন (অধিকাংশের রচনাকাল ১৯১৩—১৯২৩, পাঠককে কাল সম্পর্কে সচেতন করে দেবার কারণ বড়দের সাহিত্যে তখন পর্যন্ত গ্রাম্যতা, স্থূলতার ছড়াছড়ি, শিশুসাহিত্য হয় ভাঁড়ামি নয় রবীন্দ্রনাথ কথিত পিঠুলি গোলা সাহিত্য (১) এবং সাথে সাথে বাঙলা সাহিত্যে 'তিরিশের যুগ' আসন্ন), লিখে অল্প বয়সের ছেলেদেরও সম্মান রেখেছেন, বাঙালীর হাসিকে গোপালভাঁড় ও কবিঅলাদের গ্রাম্যতা, স্থূলতা, বাড়াবাড়ি, অশিক্ষা সর্বোপরি কুরুচির উৎপাত থেকে রক্ষা করেছেন, তাঁর যোগ্য সম্মান বঙ্গবাসী আজো দেয়নি। জ্ঞানবিজ্ঞানের সদর দরোজা বিশ্ববিদ্যালয়ও এ বিষয়ে নিশ্চুপ। হয়তো এ দোষের নয়, অকৃতজ্ঞতাইতো আমাদের, বাঙালীর একমাত্র ভূষণ।

তিনি ১৯০৫।৬ এর দিকে পারিবারিক ননসেন্স ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। ক্লাবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর হাসির গান গীত হত, অবাক জলপানের মত নাটক অভিনীত হ'ত। এই ক্লাবের মুখপত্রটি ছিল হাতে লেখা, নামটি উপযোগী: "সাড়ে বত্রিশ ভাজা"। সন্দেশের 'উত্তমর্ণ পূর্বসূরী'।

১ অল্প বয়সের ছেলেদেরও সম্মান রাখার দরকার আছে, একথা শিশু সাহিত্য লেখকরা প্রায় ভোলেন। সাহিত্য রচনায় গুণী লেখনীর সতর্কতা যদি না থাকে, যদি সে রচনা বিনালজ্জায় অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠে, তবে সেটা অস্বাস্থ্যকর হবেই; বিশেষত ছেলেদের পাকযন্ত্রের পক্ষে। দুধের বদলে পিঠুলি গোলা যদি ব্যবসার খাতিরে চালাতেই হবে সে ফাঁকি বরঞ্চ চালানো যেতে পারে বয়স্কদের পাত্রে, তাতে তাদের রুচির পরীক্ষা হবে, কিন্তু ছেলেদের ভাগ্যে নৈব নৈব চ।

—ভূমিকা, রাজর্ষি: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মণ্ডা ক্লাবের সঙ্গে খাদ্যদ্রব্যের যোগাযোগ নেই, ওটা Monday Club-এরই ব্যঙ্গরূপ। ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। নামকরণেই বোঝা যায় এর আদর্শ-উদ্দেশ্য। সোমবার জাঁকিয়ে বসত আসর—এখানে সুকুমার রায়ের কৌতুকপ্রিয়তার বহু নথিপত্র মিলেছে। বীরবলী ঢঙের—মুদ্রাদোষ সমেত, অনুকরণে রচিত ক্যাবলের পত্রটি এখানেই পঠিত হয়েছিল। পরে প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়ে বর্তমানে বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ পুস্তকে সংকলিত হয়েছে। সুকুমার রায়ের এই ব্যঙ্গ রচনাটির লক্ষ্য বিশেষ ব্যক্তি, যদিও প্যারডি তবু জ্বালা কম। অন্যান্য রচনায় ব্যঙ্গ থাকলেও লক্ষ্য কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়।

সুকুমার রায় ননসেন্স ক্লাব বা মণ্ডা ক্লাবেই যেতেন না, ভারতীয় আসরেরও তিনি নিয়মিত আড্ডাবাজ। আড্ডাগুলো জমতো। কৌতুকপ্রিয় মজলিশী মানুষ না থাকলে আড্ডা নিষ্প্রাণ; আর সুকুমার রায় অন্যান্য গুণাবলীর সঙ্গে আড্ডা জমানোর কৌশলটি আয়ত্ত করেছিলেন।

প্রতিভার অকালমৃত্যুর তালিকায় আমাদের সুকুমার রায় নিজের নামটি যোগ করেছেন। মাত্র দু'বছর কালাজ্বরে ভুগে ছত্রিশ বছরের শিশুটির মৃত্যু হয় ১৯২৩ সালে।

গ

সুকুমার রায় বি. এস-সি. সম্পাদিত সন্দেশের একটি সংখ্যাও প্রবন্ধ লেখক এখনও পড়ার সুযোগ পাননি। আবোল তাবোল, হ-য-ব-র-ল, খাই খাই ও অবাকজলপান নাটক এবং বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ ছাড়া কোন রচনা পড়ার সুযোগও তার হয়নি। সুতরাং এই আলোচনায় সুকুমার রায়ের প্রতি 'অন্ধভক্তি প্রদর্শন' ছাড়া দ্বিতীয় কোন লক্ষ্য প্রবন্ধ লেখকের নেই। পিঠুলি গোলা এবং ব্যবসায়ের খাতিরে হলেও হাতের কাছে যে শিশুসাহিত্য তিনি পান অসীম উৎসাহে তা পাঠ করেন। সুকুমার রায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনই এই স্বগতোক্তির কারণ। পাঠককে সুকুমার রায়ের মূল্য সম্পর্কে কিছু জানানো উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য একটু আক্ষেপবাণী শোনানো। এ যাবত শিশুসাহিত্যের যে ইতিহাস ও সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোতে সুকুমার রায়ের দীন অবস্থান আমাদের পীড়া উৎপাদন করে। সুকুমার রায়ের অপরাধ কি এই যে তিনি বাঙলাদেশে জন্মেছিলেন? অভিশপ্ত বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছিলেন?

আধুনিক কবিতায় কলাকৌশলের দিক থেকে সম্প্রতি যে অসম্ভব, উদ্ভট, আজগুবি, অবিশ্বাস্য (নিন্দার্থে কোন ক্রমেই প্রযুক্ত হতে পারে না) উপমা,

রূপক, চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয় সেগুলোর প্রতি একটু মনোযোগ আকর্ষণ করি। এ সমস্ত কলাকৌশল রচনাকে (ছড়াকেতো বটেই) 'ক্ষিপ্র ও তীক্ষ্ণ করে তোলে, পাঠককে বিস্ময় ও চমক দান করে, পাঠকের মনোযোগ দাবি করে এবং শিল্পীর আবেদন পাঠকের মর্মমূলে সহজেই পৌঁছিয়ে দেয়। সাম্প্রতিক ভালো কবিদের (মহৎ কবি একজনও নেই) রচনায় এমন পঙ্ক্তি দুর্লভ নয়, যার কোন অর্থগৌরব নেই অথচ যা উজ্জ্বলতা ও মনোরম উপস্থাপনের জন্য, বারবার আবৃত্তি দাবি করে। এদিক দিয়েও সুকুমার পূর্বসূরীর কৃতিত্বের দাবিদার হতে পারেন। যে কারণে আজ জগদীশ গুপ্ত-র নবমূল্যায়ণ আবশ্যক, উনিশ শতকের মনীষীদের কার্যাবলীর পূর্ণবিচার-বিবেচনা অপরিহার্য একই কারণে সুকুমার রায়ের পুনর্বিচার ও নব-মূল্যায়ণ আবশ্যক। যদিচ 'বাংলা শিশুসাহিত্য' প্রবন্ধটি অপরিহার্য তথাচ বুদ্ধদেব বসুর ঐ প্রবন্ধটিই যথেষ্ট নয়, আরো চাই ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনা। বুদ্ধদেব বসু, অপর এক প্রবন্ধে, 'বাংলা ছন্দ'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে সুকুমার রায় ব্যবহৃত ছন্দোবিশ্লেষণ করেছেন—এই বিশ্লেষণও ব্যাপক ও বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। সাম্প্রতিক কালের আধুনিক কবিতায় ছন্দ আবার ফিরে এসেছে অনিবার্য কারণেই—ছন্দোবৈচিত্র্যের জন্যেই সুকুমার রায় সম্পর্কে আমাদের ছন্দোবৈজ্ঞানিকদের, ধ্বনিতাত্ত্বিকদের এবং কবিবৃন্দের নতুন করে মনোযোগী হবার প্রয়োজন এসে গেছে। অন্তত একঘেয়ে অক্ষরবৃত্তের গতানুগতিকতা থেকে নিষ্কৃতি ও মুক্তি পাওয়ার জন্যেই এই কর্মটি করা প্রয়োজন।

সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল-এর অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি—

প্যাঁচা কয় প্যাঁচানী
    খাসা তোর চ্যাচানি
শুনে শুনে আনমন
    নাচে মোর প্রাণমন!
মচা গলা চাঁচা সুর
    আহ্লাদে ভরপুর।
গলা-চেরা ধমকে
    গাছপালা চমকে,

সুরে সুরে কত প্যাঁচ
গিটকিরি ক্যাঁচ ক্যাঁচ।
যত ভয় যত দুখ
দূর দূর ধুক ধুক,
তোর গানে পেঁচিরে
সব ভুলে গেছিরে;
চাঁদ মুখে মিঠে গান
শুনে পরে দু নয়ান।

আরেকটি আজগুবী ব্যাপার লক্ষ্য করুন,—

হাঁড়ি দিয়ে দড়ি মুখো কে যেন কে বৃদ্ধ
রোদে বসে চেটে খায় ভিজে কাঠ সিদ্ধ।

অন্যত্র

কোন কুটো খেতে ভাল কোন্‌টা বা মন্দ
কোন কোন ফাটলের কি রকম গন্ধ
কোন কাঠ পোষ মানে কোন কাঠ শান্ত
কোন কাঠ টিমটিমে কোনটা বা জ্যান্ত।
কোন কাঠে জ্ঞান নাই, মিথ্যা কি সত্য
আমি জানি কোন কাঠে কেন থাকে গর্ত।

সুকুমার রায়ের পূর্বে এই জানাটা এমন করে আর কেউ জানাতে পারেননি। না ছড়ায়, না বড়দের কবিতায়।

আজগুবি নয় আজগুবি নয় সত্যিকারের কথা
ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা।
মৌয়াগাছের মিষ্টি ছায়া ব্লটিং দিয়ে শুষে
ধুয়ে মুছে সাবধানেতে রাখছি ঘরে গুষে!
পাক্কা নতুন টাটকা ওষুধ এক্কেবারে দিশি—
দান করেছি সস্তা বড়, চোদ্দ আনা শিশি।

চোদ্দ আনা শিশির ভিতরে এক্কেবারে দিশি যে দ্রব্যাদি ভরা আছে তার প্রতি লোভ অনেক কবির থাকতে পারে, কেননা 'কবির কবি' সুকুমার রায় মিষ্টি ছায়া ধুয়ে মুছে সাবধানে রেখেছেন।

(যদি) কুমড়ো পটাশ ডাকে—
সবাই যেন শামলা এঁটে গামলা চড়ে থাকে,

ছেচকি শাকের খণ্ড বেটে মাথায় মলম মাখে
শক্ত ইটের তপ্ত ঝামা ঘষতে থাকে নাকে—

উপদেশটাতে যে **fantasy** এবং **absurdity** রয়েছে বাঙলা সাহিত্যে তা সত্যিই বিরল।

শুনেছ কি বলে গেল সতীনাথ বন্দ্যো?
আকাশের গায়ে নাকি টকটক গন্ধ?
টকটক থাকে নাকো হ'লে পরে বৃষ্টি
তখন দেখেছি চেটে একেবারে মিষ্টি।

শিশুরা একঝাঁক প্রশ্ন করে এবং তা এমন সব প্রশ্ন, যার উত্তর শ্রোতার কাছেও দাবি করে না, শ্রোতাও উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করে না, প্রশ্নকর্তারা নিজেরাই গড়গড় করে বলে আর হেসে কুটিকুটি হয়—পর পর দুটো প্রশ্নবোধক চিহ্নের প্রয়োগে প্রশ্নকর্তার ব্যগ্রতা যেমন প্রমাণিত হয় তেমনি বৃষ্টির পরের মহৎ কর্মটি ছোটদের মনঃপূত না হওয়ার কোন কারণই থাকে না। 'চাটা' ক্রিয়াপদের এমন প্রয়োগ আর কখনো দেখিনি।

বুঝিয়ে বলার বক্তা যা বোঝাতে চান—

অর্থাৎ কিনা এই মনে কর রোদ পড়েছে ঘাসেতে
এই মনে কর চাঁদের আলো পড়লো তারি পাশেতে—

এই মনে করার প্রবল ক্ষমতা যে কবিরই আছে তা আমার বুঝিয়ে বলার দরকার নেই।

রামগরুড়ের ছানা আর বাবুরাম সাপুড়ের কাণ্ডকারখানা এদেশের ছেলেরা জানে। এই দুটো কবিতাই পাঠ্য পুস্তকে প্রবীণেরা কৃপা করে রেখেছেন। সম্ভবত সনৎ সিংহ (স্মৃতি থেকেই লিখছি, গ্রামোফোন রেকর্ডটি আমাদের এখানে নেই) সলিল চৌধুরীর সুরে বাবুরাম সাপুড়ের গানটি গেয়েছেন। গানটি যতটা ভালো লাগে তার চে' অনেক বেশী ভালো লাগে কবিতাটি পড়তে—আবৃত্তি করতে। সুকুমার রায় 'রামগরুড়ের ছানা'তে যথার্থ বড় কবির নিদর্শন রেখে গেছেন। বাঙলার শ্যামল প্রকৃতি হাজার বছরের হাজার হাজার কবির কাছে কত বিচিত্ররূপেই না দেখা দিয়েছে আর পাঠকবৃন্দের চিত্তে হাজার হাজার ভাবের বন্যা এনে দিয়েছে। গতানুগতিক প্রচলিত রেওয়াজকে ভেঙে নতুন চেতনা বড় কবিরাই দিতে পারেন:

যায় না বনের কাছে কিম্বা গাছে গাছে
দখিন হাওয়ার সুড়সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে।
ঝোপের ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে
জোনাক জ্বলে আলোর তালে
হাসির ঠারে ঠারে।

রামগরুড়ের ছানাদের কাছে নিসর্গ যেভাবে নিজেকে মেলে ধরেছে হুলোর কাছে ঠিক সেরকমটি নয়।

পূবদিকে মাঝরাতে ছোপ দিয়ে রাঙা
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা।
চট করে মনে পড়ে মটকার কাছে
মাল পোয়া আধখানা কাল থেকে আছে।
দুড় দুড় ছুটে যাই দূর থেকে দেখি
প্রাণপণে ঠোঁটি চাখে কান কাটা নেকী
গাল ফোলা মুখ তার মাল পোয়া ঠাসা
ধুক করে নিভে গেল বুক ভরা আশা।

ছন্দ, শব্দ ও কল্পনার দীপ্তির এরকম মিলন শুধু ছড়ার নয় কবিতায়ও দুর্লভ।

ট্যাঁশ গরু গরু নয় আসলেতে পাখি সে—

(যেন, কে বাজী ধরেছে ট্যাঁশ গরু, গরুই নয় এবং) ট্যাশগরুর অস্তিত্ব সপ্রমাণের জন্যে যখন সুকুমার রায় বলেন

যার খুশি দেখে এস হারুদের আফিসে
রুচি নাই আমিষেতে রুচি নাই পায়সে
সাবানের স্যুপ আর মোম বাতী খায় সে।

তখন অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বৃদ্ধের মুখেও হাসি ফোটে বোধকরি নতুন জন্তু সম্বন্ধে 'প্রত্যক্ষ জ্ঞান' লাভ করে।

আবোল তাবোলের সর্বশেষ রচনাটি তুলে দিচ্ছি—

মেঘমুলুকে ঝাপসা রাতে
রামধনুকের আব ছায়াতে
তালবেতালে খেয়াল সুরে
তান ধরেছি কাষ্ঠ পুরে।

আজকে দাদা যাবার আগে
বলব যা মোর চিত্তে লাগে
নাইবা তাহার অর্থ হোক
নাইবা বুঝুক বেবাক লোক
আপনাকে আজ আপন হাতে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে।

গোঁফচুরি, সৎপাত্র (আহারে গঙ্গারাম), ঠিকানা, শব্দকল্পদ্রুম, আহ্লাদী, হুলোর গান অর্থাৎ আবোল তাবোল-এর ৩৮টি কবিতা থেকে নানা কারণে উদ্ধৃতি দেবার প্রবল প্রলোভন দমন করেও বলব বাঙলাভাষী বাঙালীর শিশুর মায়ের আঁচলের মত নিরাপদ, আরামপ্রদ, ক্লেশহর চিত্তহর আবোল তাবোল সম্পর্কে কোন বিশেষণই বাড়াবাড়ি নয়।

হ-য-ব-র-ল, পূর্বেই বলেছি, ধারাবাহিকভাবে সন্দেশে প্রকাশিত হ'ত। গ্রাহকগ্রাহিকাগণ কী উৎকণ্ঠায়, প্রবল ব্যগ্রতায় পদাবলী প্রতীক্ষায় দীর্ঘ একটি মাস কাটাতো তা কল্পনা করে নিতে অসুবিধে হয় না। শিশুর মনোরাজ্যে যতগুলো পৃথিবী আছে সুকুমার রায় তার সবখানেই আলো ফেলেছেন। অথচ জটিলতার অথবা পাণ্ডিত্যের দুরূহ দুর্বোধ্যতার ঠাঁই নেই সে আলোয়, সে আলোক এতো বেশী উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত যে সেই গ্রাহকের মত তার পিতাও তার হারিয়ে যাওয়া শৈশবকে প্রত্যক্ষ খুঁজে নিতে পারতেন। মার্ক টোয়েন, ড্যানিয়েল ডিফো, লুই ক্যারল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মত ক্ষমতাবান শিল্পীরাই পারেন এই আলোর খেলা দেখাতে। বাঙলা সাহিত্যে ক্ল্যাসিক হয়ে রইল হ-য-ব-র-ল। হ-য-ব-র-ল-তে সবই সম্ভব। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

'ছিল রুমাল হয়ে গেল বিড়াল'

তাই তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম, 'ও হ্যাঁ! হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি'।

বেড়ালটা খুশী হয়ে বলল, "হ্যা এতো বোঝাই যাচ্ছে—চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্যশ রুমালের মা—হল চশমা। কেমন হল তো?"

....সেখানে গরম সকালে উপদেশ হল 'গরম লাগেতো তিব্বতে গেলেই পার।' পথটাও বিচিত্র কলকেতা, ডায়মণ্ডহারবার, রাণাঘাট, তিব্বত, ব্যাস। সিধে রাস্তা, সওয়া ঘণ্টার পথ, গেলেই হল।

...........সাত দুগুণে কত হয়?

...কই জবাব দিচ্ছ না যে, সাত দুগুণে কত হয়?

আমি বল্লাম সাত দুগুণে চোদ্দ।

কাকটি অমনি দুলে দুলে মাথা নেড়ে বলল, হয়নি হয়নি ফেল।

আমার ভয়ানক রাগ হল। বললাম, নিশ্চয় হয়েছে।

সাতেক্কে সাত, সাত দুগুণে চোদ্দ, তিন সাতে একুশ।

কাকটা কিছু জবাব দিল না, খালি পেনসিল মুখে দিয়ে খানিকক্ষণ কি ভাবল। তারপর বসল, সাত দুগুণে চোদ্দর নামে চার, হাতে রইল পেন্সিল।

এমন সময় হঠাৎ গাছের একটা ফোকর থেকে কি যেন একটা সুরুৎ করে পিছলিয়ে মাটিতে নামল। চেয়ে দেখি দেড় হাত লম্বা এক বুড়ো, তার পা পর্যন্ত সবুজ রঙের দাড়ি, হাতে একটা হুঁকো তাতে কলকে টলকে কিছু নেই, আর মাথা ভরা টাক। টাকের উপর খড়ি দিয়ে কে যেন কি সব লিখেছে।

বুড়ো এসেই খুব ব্যস্ত হয়ে হুঁকোতে দু-এক টান দিয়েই জিগগেশ করল, কই হিশেবটা হল।

কাক খানিক এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, এই হল বলে।

বুড়ো বলল কি আশ্চর্য। উনিশ দিন পার হয়ে গেল, এখনো হিসেবটা হয়ে উঠল না?

কাক দুচার মিনিট খুব গম্ভীর হয়ে পেনসিল চুষল, তারপর জিগগেশ করল, কতদিন বললে।

বুড়ো বলল, উনিশ।

কাক অমনি গলা উঁচিয়ে হেঁকে বলল লাগ্ লাগ্ লাগ্ কুড়ি, বুড়ো বলল 'একুশ'। কাক বলল 'বাইশ'। বুড়ো বলল 'তেইশ'। কাক বলল 'সাড়ে তেইশ।' ঠিক যেন নিলেম ডাকছে।

বুড়োর বলা একটা আস্ত গল্পই পেশ করি:

তারপর এদিকে বড় মন্ত্রীতো রাজকন্যার গুলিসুতো খেয়ে ফেলেছে। কেউ কিচ্ছু জানে না। উদিকে রাক্ষসটা করেছে কি, ঘুমুতে ঘুমুতে হাঁউ মাঁউ কাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ, বলে হুড়মুড় করে খাট থেকে পড়ে গিয়েছে। অমনি ঢাকঢোল সানাই কাঁশি লোক লস্কর সেপাই পল্টন হৈ হৈ রৈ রৈ মার মার কাট কাট—এর মধ্যে হঠাৎ রাজা বলে উঠলেন পক্ষীরাজ যদি হবে তাহলে ন্যাজ নেই কেন? শুনে পাত্র মিত্র ডাক্তার মোক্তার আক্কেল

মক্কেল সবাই বললে, ভালো কথা। ন্যাজ কি হল? কেউ তার জবাব দিতে পারে না, সব সুড় সুড় করে পালাতে লাগল।

উক্ত পুস্তকের শ্রী ব্যাকরণ শিং বি,এ, খাদ্য বিশারদ কিম্বা হিজি বিজ বিজ (যার বাবার নামও হিজি বিজ বিজ) কিম্বা নেড়া মাথা বেহায়া যে গান গাইতে পার বললেই গায় না বললেও গায়, এদের ভোলার উপায় নেই। একটা গানের নমুনা :

'লাল গানে নীল সুর হাসি হাসি গন্ধ।' শেষাংশে আছে

'অলিগলি চলি রাম, ফুট পাথে ধুমধাম, কালি দিয়ে চুনকাম, সেগানটা সে আবার গায় না, তদুপরি 'নরম সুরের' যে গানের কথা 'নইনি-তালেব নরম আলু' সে গান গাইতে সে অক্ষম, তার ভাষায় "আজকাল সেটা গাই, সেটা হচ্ছে শিখি পাখার গান। এই বলে সে গান ধরল—

মিশি মাখা শিখি পাখা আকাশের কানে কানে
শিশি বোতল ছিপি ঢাকা সুর সরু গানে গানে
আলাভোলা বাঁকা আলো আধো আধো কত দূরে
সরু মোটা সাদা কালো ছল ছল ছায়াসুরে....

কিম্বা শজারুর সেই বিখ্যাত দলিল,
নিঝুম নিশুত রাতে
একা শুয়ে তেতালাতে
খালি খালি খিদে পায় কেন রে?" আর উদ্ধৃতি দেয়া যাবে না।

বর্ণমালাতত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ পুস্তকে তার ইংরেজী বাঙলা প্রবন্ধ, কবিতা ও একটি অসমাপ্ত কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

বর্ণমালাতত্ত্ব অসম্পূর্ণ কবিতা। তার শব্দপ্রয়োগ প্রমাণ করে তিনি ছিলেন ভাষাবিজ্ঞানী। স্বরবর্ণ শেষ করে ব্যঞ্জনবর্ণের চ বর্গ পর্যন্ত তিনি শেষ করেছিলেন। অসমাপ্ত রচনা অর্থাৎ অসম্পূর্ণ এবং (বোধকরি) প্রসাধনহীন তবু একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

কেন ইতিউতি উতলা আকুতি উসখুস উঁকি ঝুঁকি
উড়ে উচাটন, উড়ুউড়ু মন উদাসে উর্দ্ধমুখী
আইল আকাশে কোঋলা বাতাস, কেবলি আওয়াজ ফাঁকা....

সমালোচনা কবিতার একটি অংশ হচ্ছে

আচ্যি মশায়। হাড়িড মোদের নয়কো এমন শক্ত
এসব কাব্য হয় না যেন, মাথায় ওঠে রক্ত।

এমন রাবিশ গজায় কেন, মজায় কেন দেশটায়?
সস্তা হাটে নামটি কিনে পস্তাতে হয় শেষটায়।

'সম্পাদকের দশা' কবিতা আঠারো মাত্রায় রচিত পয়ার। পুথির ঢঙ্গে সাধু ভাষায় 'সম্পাদক গোবেচারা'কে নিয়ে লিখেছেন। তার দশা দেখে দশজনের সম্পাদক হবার লোভ থাকবে না।

ভাষার অত্যাচার প্রবন্ধটি পণ্ডিতজনের জন্যে রচিত—ভাষাতত্ত্বে তার পাণ্ডিত্য বহন করে প্রবন্ধটি। কিন্তু রস বর্জিত নয়। "....এই প্রবন্ধটিকে আরো বিস্তৃত করিয়া ফেনাইতে গেলে তাহা ও (ভাষার) অত্যাচার বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

ক্যাবলের পত্র-টি গোপন পত্র নয, অসংকোচে পড়ুন,
শ্রীমান বাঞ্ছারাম উন্নতিশীলেষু,—

তুমি যে আমার কোন চিঠি পাওনি তার একটা কারণ এই যে আমি তোমার চিঠি লিখিনি। কারণ ছাড়া যখন কার্য হয় না, তখন চিঠি না লেখবারও অবিশ্যি একটা কারণ থাকা উচিত। তবে কিনা, চিঠি না লেখাটাকে কার্য বলে ধরা যায় কি না, সেটা একটু ভাবা দরকার।.... ক্রিয়া এবং অস্তিত্ব এ দুটোর মধ্যে তফাৎটা কেবল কৃ-ধাতু আর অস ধাতুর তফাৎ, আর ব্যাকরণ মতে সব ধাতুই ক্রিয়া বাচক। 'আমি আছি' এই তত্ত্বটিকে ফুটিয়ে বলার নাম কার্য আর প্রাণের স্বাভাবিক ধর্মই এই যে সে আপনাকে প্রকাশ করে. অর্থাৎ ফুটিয়ে বলে। জলকে ফোটাতে হলে তাকে আগুনে চড়িয়ে গরম করতে হয় কিন্তু তাই বলে ফুলকে ফোটাবার পক্ষে ও উপায়টি খুব প্রশাস্ত না-ও হতে পারে। জীবনটাকে কাজের মধ্যে নিয়ে যাঁরা চব্বিশ ঘণ্টা টানাটানি করেন, তাঁরা এই সহজ কথাটি বোঝেন না যে, ওতে করে জীবনটা ফুটে বেরোয় না কেবল প্রাণটাই ছুটে বেরোয়।

....'পল্লী সাহিত্য' বলে একটি কথা আমি অনেক দিন ধরে শুনে আসছি কিন্তু ও বস্তুটা যে কি তা আমার জানা নেই, অর্থাৎ কাল পর্যন্ত জানা ছিল না। সেইজন্য কাশীরাম পণ্ডিতের পল্লী সাহিত্য প্রবন্ধটি আমি আগ্রহ করে অর্থাৎ নিজের পয়সা খরচ করে কিনে এনেছিলুম। কিন্তু প্রবন্ধটি পাঠ করে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, ওতে করে আসল যে কথাটি বলা হচ্ছে, সেটা ওর মধ্যে কোথাও বলা হয়নি।

....যাহোক প্রবন্ধের একটা গুণ আছে, সেটা আমি অস্বীকার করিনে, সেটা এই যে, সাহিত্য বলতে পণ্ডিতমশায় কি বোঝান সেটা না বুঝলে, তিনি কি না বোঝেন সেটা ওতে খুব স্পষ্ট করেই বোঝা যায়।

আমার কোন কোন সমালোচক বলেন যে, আমার ভাষাটা খুব প্রাঞ্জল নয়। তার অর্থ বোধ হয় এই যে, আমার লেখা পড়লে তাঁদের প্রাণটা জ্বলে কিন্তু জল হয় না।

বীরবলের গদ্যের সঙ্গে যার পরিচয় আছে তিনি অবশ্যই স্বীকার করবেন গ্যারোডী হিসেবে কতখানি নিখুঁত এই লেখাটি।

চিরন্তন প্রশ্ন, দৈবেন দেয়ম শিল্পে অত্যুক্তি, ফটোগ্রাফী, ভারতীয় চিত্রশিল্প, **the spirit of Rabindranath Tagore, the Burden of the Eammon modern** প্রভৃতি প্রবন্ধে তাত্ত্বিক ও শিল্পী সুকুমার রায় বিম্বিত। সুকুমার রায় এই প্রবন্ধগুলোতে ভালোবাসা নয়—শ্রদ্ধা দাবি করেন, আশাকরি সমালোচনা সাহিত্যে, তাঁর নামটি এর পরে অবশ্যই যুক্ত হবে। শৈশব থেকে তাঁকে যে ভাবে দেখে এসেছি প্রবন্ধগুলো তাব বিপরীত দিকে দাঁড়ায় বলে আমাকেও থামতে হল।

'সুকুমার রায়ের প্রত্যেক গল্পেই উপদেশ আছে, কিন্তু সেটা বাইরে থেকে নিক্ষিপ্ত নয়, ভিতর থেকেই প্রকাশ-পাওয়া, যে উপদেশ সেই জাতের যা বালকেরা নিজেরাই মাঝে মাঝে কৃতজ্ঞচিত্তে নিয়ে থাকে জীবন থেকে। এইজন্যই তাদের উপভোগ কখনো ব্যাহত হয় না; তাদের বয়সোচিত নানা রকম ছল চাতুরতা বোকামী এবং দুষ্টুমির শেষে জব্দ হওয়ার দৃশ্যটিতে নিজেরাই তারা প্রাণখুলে হাসে, ঐ জব্দ হওয়ার—যদিও তারাই এক একজন এক-এক গল্পের নায়ক—সম্পূর্ণ সমর্থন করে তারা; সেটুকু না থাকলেই ভালো লাগতো না, সত্যি বলতে। এতে প্রমাণ হয়, বয়স্ক লেখকের সঙ্গে তাঁর ছোট ছোট পাঠকদের একাত্মবোধ কত নিবিড়।

[বাংলা শিশুসাহিত্য : বু . ব]

বুদ্ধদেব বসু এডওঅর্ড লিয়র ও লুই ক্যারল-এব সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন

"উপরোক্ত দুই ইংরেজ লেখকের কাছে, বলাবাহুল্য, সুকুমার রায়ের ঋণ অনেক, সেই ঋণ সার্থক হয়েছিলো এই জন্যে যে এঁদের সঙ্গে তাঁর নানা রকম মিল ছিলো। মিল ছিলো গুণের দিক থেকে, প্রাণের দিক থেকেও। ক্যারলের মতো, তিনিও ছিলেন একাধারে শিল্পী ও বিজ্ঞানী; লিয়রের মতো, একাধারে চিত্রী ও লেখক; ক্যারলের মতোই শব্দতত্ত্ব সন্ধানী

ছিলেন, আর উভয়ের মতোই জন্মেছিলেন লজিকনিষ্ঠ মনের সঙ্গে খামখেয়ালি মেজাজ নিয়ে। এ দুয়ের মিল ঘটলে তবেই সত্যকার খেয়াল-খাতা লেখা যায়, নয়তো, ও-বস্তু আক্ষরিক অর্থেই 'ননসেন্স' হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে সুকুমার রায়কে তাঁর উত্তমর্ণদের সমকক্ষ বললে ভুল হবে—কেননা তাঁর ব্যঙ্গের দিকেও ঝোঁক ছিলো।

....কিন্তু এই ইংরেজ যুগলের তুলনায় একটি বিষয়ে তিনি মহত্তর; সেটি তাঁর কবিত্বগুণ।

'আবোল তাবোল' আমার প্রথম থেকেই মনে হয়েছে, বাংলা ভাষার রীতিমত একটি কাব্যগ্রন্থ, যাতে হাসির ছুতো ক'রে ছাট ও কৌতুকের সাহায্যে ভুলিয়ে এসে শিশুদের এবং বয়স্কদেরও কয়েক ফোঁটা বিশুদ্ধ কাব্যরস অন্তঃস্থ করে দেয়া হ'লো।'' [বাংলা শিশুসাহিত্য]

নিছক পদ্য রচনার কারিগরিতে ছন্দ-মিলের অপ্রতিহত পরিচালনায় সুকুমার রায়ের দক্ষতা এমন অসামান্য যে শুধু তারি জন্য তাঁকে কবি বলে স্বীকার করার বাধা হয় না। বাংলাদেশ এখানে স্মরণ করা ভালো, একই কারণে কাঠর সম্মান দিয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে; সত্যেন্দ্রনাথও পদ্যকার, পদ্য ছাড়া বেশি কিছু লেখেননি, কিন্তু সেই পদ্যই ওস্তাদের মতো আর প্রচুর পরিমাণে লিখেছেন বলে কবিসভায় তাঁকে শেষ পর্যন্ত অমান্য করা যায় না। উপরন্তু সত্যেন্দ্রনাথেব তুলনায় সুকুমাব রায় অনেক বেশী পরিণত মনের মানুষ, তার কলাকৌশলও অনেক বেশী সাবালক; তাই তাঁর পদ্য ছোটদের জন্য লেখা হলেও বয়স্কদের ভোগ্যবস্তু হযেছে আর সত্যেন্দ্রনাথেব লক্ষ্য যদিও বয়স্ক পাঠক, কার্যত তাঁর অধিকাংশ কবিতাই কিশোর পাঠ্য। গত দুই দশকে বাংলা কাব্য যতটা বদলে গেছে, তাতে আজকেব দিনের তরুণ কবির পক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ আর অপরিহার্য নেই, কিন্তু লেখা শেখার যে-কোনো স্কুলে আবোল তাবোল এখনো আবশ্যিক। বুদ্ধদেব বসুর উপরোক্ত মন্তব্যে প্রতিবাদ করবেন কে? [বাংলা সাহিত্য : বু: ব]

''হ-য-ব-র-ল উদ্দেশ্যমূলক রচনা নয়। এর উদ্দেশ্য নিটোল আজগুবি রস। কিন্তু ব্যঙ্গ যেখানে এসে পড়েছে সেখানেও সুকুমার রায়ের তীক্ষ্ণ মননশীলতা, অপূর্ব কারুকার্যের সাহায্যে ব্যঙ্গকে রূপান্তরিত করেছেন বিশুদ্ধ কৌতুকে। লুই ক্যারলের রচনাতেও এই কর্মটি আছে। কিন্তু উদ্দেশ্যের দিক থেকে দুই স্রষ্টা পৃথক। তাই সুকুমার রায় যে অনেক ক্ষেত্রে ক্যারলের চেয়েও উঁচুদরের সৃষ্টিকে সম্ভব করেছেন রাজশেখর

বাবুর এই মন্তব্যটি মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই। একথা হয়তো ঠিক যে, সুকুমার রায়ের ননসেন্স রসের প্রেরণা লুইক্যারল, কিন্তু ভাবশিষ্য মৌলিকতার গুণে গুরুকে অতিক্রম করেছেন। (সুকুমার রায়: অনিল সেনগুপ্ত) মন্তব্যটির গুরুত্ব প্রবন্ধকার বিশ্বাস করেন, স্বীকার করেন এবং এ কারণেই প্রচারে উৎসাহী।

আবদুল মান্নান সৈয়দ

শব্দের পাপ ও অন্যান্য অনুষঙ্গ

১

কবিতা বিষয়ক প্রচ্ছন্ন কি প্রকাশ্য যে-কোনো প্রস্তাব কিংবা দূরবাণী বস্তুত নমনীয় ও ক্ষণভঙ্গুর : ছক-কাটা অন্তর্গত টেবিল সামান্য হেরফেরে উল্টে প'ড়ে অত্যুৎসাহীর চোখেমুখে সাহিত্যস্বাধীন কালি ঢেলে দিতে পারে। তত্রাচ, ঐ ঘনঘোর প্রস্তাব কিংবা দূরবাণীর সার্থকতা এইখানে যে, তার একটিমাত্র লাইনও সাহিত্যব্যবসায়ীর বিপন্ন বিস্ময়ে কোনো-একদিন জ্বেলে দিতে পারে নির্মল আগুন, কিংবা কিছুক্ষণিক পথ্য জোগাতে পারে ন্যূনপক্ষে। আর, এমনও বলা চলে না যে দূরবাণীর সমস্তই ব্যর্থতার হাঁ-করা ক্ষুধার আহার্য হবে; তা যেতে পারে একমাত্র ভবিষ্যৎজীবীর বাক্যে; এবং সাহিত্যের নেপথ্যে স্থায়িত্বের পাথের লুকোনো থাকে। কিংবা প্রস্তাবও সর্বাঙ্গীণ ব্যর্থতা বরণ করতে পারে না—যেমন তার সর্বাঙ্গীণ সাফল্যও অসম্ভব—কেননা সমসময়েই সম্মতির পটেই তা রচিত হয়; —এবং সর্বাঙ্গীণ সাফল্যও অসম্ভব এইজন্যে যে, সাহিত্য ভবিষ্যৎবক্তার কি প্রস্তাবকের কোনো পরোয়া করে না, তার নিজের মধ্যেই ঘনিয়ে আছে ঘোর অগ্রসরণের কড়াক্রান্তি ও বেগ। সাহিত্য স্বাধীন, অর্থাৎ শুধু নিজের অধীন, সর্বাংশে কোনো প্রস্তাব কিংবা দূরবাণীর ছাঁচে গ'ড়ে ওঠা তার পক্ষে মৃত্যুর শামিল, সম্ভাব্যতার পরপারে ও চিন্তার অতীত—আর যদি-বা সম্ভব হয় বুঝবো তার মধ্যে প্রাণের অভাব আছে, কেননা যান্ত্রিকতা সচল বটে কিন্তু প্রাণবান নয়, এবং প্রতিভা-যে কোনোদিন কোনো নিয়ম মানে না, এটাই তার প্রধানতম নিয়ম। আসলে অব্যবসায়ীদের অধিকার কেবলমাত্র চক্রবর্তী, রক্তহীন, কাব্যহীন অনুবর্তনে: ভীষণ সুসমাচার চিরকাল প্রেরিত একজন-দুজনের কাছে পৌঁছোয়: অথবা যাঁরা অনির্বচনীয় খাটুনিতে উপার্জন করেন তার দাম পূর্বাহ্ণেই তাঁদের নিকট অধিবাস করে।

২

কখনো ভাবি, আত্মতাড়িত কবিতা এখন পরোক্ষে। স্বপ্ন, নির্মাণ ও পরিকল্পনার মধ্যে হেঁকে যায় বিচ্ছেদ, বিকর্ষণ ও দ্বিধাপন্নতা, অকূল, চতুর, কুহকী ও নম্য মনোবিন্যাসের মর্মে প্রবেশের দৃঢ় চেষ্টার লাঙল অনায়াসে শস্যের বিপক্ষে থাকে: কম্পমান অগ্রসরমান কবিতার রাজ্যে সম্ভাবনার সমস্ত ছোটো-বড়ো আসন এখন বিজিত ও অধিকৃত: নিসর্গ ও মানব—কবিতার এই দুই পরিচিত পুরোনো মূর্তি আমরা কিনে নিয়েছি ইতিহাসচৈতন্যের সমগ্র দাম ক'ষে। অর্থাৎ, শিক্ষা ও জিজ্ঞাসা, জ্ঞানের তৃষ্ণা ও গেলাশ, সব আমাদের পরিচিত; চক্ষুকোণে নতুন কোনো সত্য—এমনকি পিঁচুটির মতো সত্য ফোটে না; অনাক্রমণীয় দেশবিদেশ নেই। তাহ'লে কবিতা কী করে? পুণ্যবিদ্ধ ও শান্তিলোভী সমগ্র প্রকাশ্য ও অন্তর্গত ইতিহাসভূমি স্পষ্ট না-হোক, অন্তত পঠিত, কবিতা এখন কোন পথে ছোটে? নম্যতমা কবিতা পুরোনো 'ভাবে'ই যাতায়াত করবে, কাছের পুরোনো নয় দূরের পুরোনোর নতুন নিমন্ত্রণে ও আক্রমণে ফ'লে উঠবে, না কি টেকনিকের আপাতরমণে মীমাংসা নেবে খুঁজে? আর, সবচেয়ে বড়ো কথা: বৈদেহী কবিতা, যার জন্মউৎস স্বভাবের গভীরতল, সে কি চতুর, কুশলী ও বদমাশ মানুষের মতো কোন-কোন সাম্রাজ্য জয় হয়েছে, জেনে নিয়ে নামবে তরুণ আক্রমে? কবিতা যদি স্বভাবের নিসর্গের গভীর গভীরতর শততল থেকে উৎসারিত হয়, তাহ'লে ঐ পূর্বাপরময় 'জ্ঞান' কোন কাজে লাগে?—আধুনিক জাগ্রত কবির সম্মুখে এইসব প্রাথমিক বিপদআপদ নখদন্তে উদ্যত।

নতুন ও বলীয়ান একটি উত্তর আমাদের অগত্যাপরবশ তৈরি ক'রে নিতে হবে সময়ের মানদণ্ডে। কবির নিকট উজ্জ্বল পক্ষের অধিবাস আজ গেছে ফুরিয়ে, কবিমাত্রই মূলত স্বভাবকবি হ'লেও বিশুদ্ধ স্বভাব-সেবা-ব্রতের দিন ইতিমধ্যেই বিগত: নিরস্ত এখন কবি হ'তে হয় অনন্য, নিরুপায়, কৃত্রিম উপায়ে। স্বেচ্ছান্ধ অস্পষ্টতা থেকে একটি সত্য আমাদের ছেঁকে নিতে হবে তৃতীয় রাস্তার মতো: কবিবংশে চক্রবর্তী, নিরঞ্জন, অমিয় অভ্যাসের চাপে একালে 'জ্ঞান' হয়েছে 'অনুভূতি', যেমন আমরা সাবালক হ'লে আমাদের অনেক সূক্ষ্ম অনুভূতি লুপ্তিবরণ করে, আবার স্বভাব অনেক নতুন তারও চড়িয়ে দ্যায়, তেম্নি ইদানীন্তন কবিতার 'অনুভূতি' আমাদের বাধা বা শায় দেয়ার অপেক্ষা না-রেখেই ধর্মপথ ছেড়ে গেছে, 'জ্ঞানে'র বলে তার অনেক নব-নব দৃষ্টির শ্রুতির স্বাদের উন্মীলন

উজ্জীবন উদ্ভাবন ঘ'টে গেছে। যদি আমরা অনুভূতির রাজ্যবিস্তার ক'রে দিতে চাই, তাহ'লে আজ জ্ঞানেরই অবলম্বন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই সত্যটির প্রতি আমরা এতকাল ইচ্ছে ক'রে চোখ বুজে আছি; কেন?—না, একটা পুরোনোর 'মায়া' জড়িয়ে আছে তার শরীরে, যে-'মায়া'কে আমাদের এই মুহূর্তে কুসংস্কার ব'লে মনে করতে হবে, জ্ঞানকে অনুভূতিরই অংশী ও সঙ্গী ক'রে নিতে হবে, এবং অন্যান্য রূপবান কুসংস্কারের মতোই এর উচ্ছেদ আশুকর্তব্য। কবিতায় জ্ঞানের এই নিষ্কুণ্ঠ স্বীকৃতি রেখে ব্যাপ্ত চাষ চালিয়ে যেতে হবে;—অবশ্য, কবিতা—যেহেতু পণ্ডিত বা দিক্-নির্দেশক কাউকে পরোয়া করে না—এই পথে গেছে কিছুদূর আনমনে। —আমার তো মনে হয়, এই পথে বেঁকে চ'লে গেছে বাংলা কবিতার আসন্ন ভবিষ্যৎ।

৩

ছিলো একটি সময়, যখন কবিতার মধ্যেই লুকিয়ে থাকতো আধুনিক সাহিত্যের প্রকরণসকল: কবিতা তখন এরকম নিরঞ্জন ও শুচিবাগীশ, রাজর্ষি ও পিচ্ছিল, দেহহীন ও স্বপ্নমনস্ক হ'য়ে ওঠেনি; এক অবিরাম মল্লযুদ্ধের, টান-করা অধিজ্যতার, শব্দের ও স্বপ্নের প্রসবিত অমোঘ ফল ছিলো না; প্রস্তুচৈতন্যের অতল ও পরিবর্তমান বিছানা থেকে শায়িত স্থায়ী-অস্থায়ী মাড়িহীন ঠোঁটহীন গল্প উদ্ধার করবার চেষ্টায় ভাবনা, বেদনা ও লেখনীর যাতায়াত তখন ছিলো অকল্পনীয়: আধুনিক সাহিত্যের নব্য প্রকরণসকলের অনেক গুরু দায়িত্ব ও সূক্ষ্ম তৃষ্ণা মেটানোর চেষ্টায় কবিতা তখন নিযুক্ত ছিলো, ফলে কবিতার পক্ষে দুষ্পাচ্য শতবিচিত্র প্রসঙ্গ নিমন্ত্রণ ক'রে এনে কবিতারই সর্বনাশ ডেকে আনা হ'তো। কবিতার এই তারা-নেই বাতাস-নেই মহাসমুদ্র থেকে আস্তে-আস্তে জাগ্রত হ'লো ডাঙার কঠিন মুণ্ডু—গদ্যকথা—অচিরেই সে বিস্তার ক'রে দিলে তার বিরাট অধিকার, যেমন ছিলো আমাদের কথোপকথনের অনন্য মাধ্যম তেমনি পায়ের তলার শক্ত প্রধান নির্ভর হয়ে দাঁড়ালো। তত্রাচ তার শরীরে কি মনে কোথাও কবিতা র'য়ে গেলো স্মৃতির মতো কেঁদেকেটে, কবিতা তার দাবি ছাড়লে না, দেখিয়ে দিলে তাকে ছাড়া 'মহৎ সাহিত্য'—গদ্যের এই বিশ্বজিৎ দিনেও—একেবারেই অচল। দেখলাম: কবিতার সংক্রাম ছাড়া, পরাক্রান্ত সংক্রাম ছাড়া কোনো সাহিত্যই না পারে দেশ ডিঙিয়ে যেতে না পারে কাল উৎরে যেতে; দেখলাম: কোনো জ্ঞানর্ষি কবিতাহীন সাহিত্যের মর্মে প্রবেশের চেষ্টাই করেন না, অর্থাৎ, শাদা ভাষায়, 'কবিতাহীন সাহিত্য' কথাটি সোনার পিত্তলমূর্তি মাত্র; দেখলাম: আদি পাপের আল্পনার মতো সাহিত্যের

শরীরে কি আত্মায় কবিতা ছায়ার মতো, গানের অতলের মতো, গানের অন্যায়ের মতো জড়িত মিশ্রিত। গদ্যের শতবিচিত্র উপকারিতা ও অবশ্যম্ভাবিতা কণ্ঠস্থ আছে আমাদের; কিন্তু খাঁটি গদ্যে, অর্থাৎ কাঠগদ্যে, যার ব্যবহারের মাধ্যমে দিনগত পাপক্ষয় চলে, সত্যিকার আক্রমসম্মত মানদণ্ডময় পূর্বাপরময় সাহিত্যযাত্রা বস্তুত দুঃসম্ভব। আরো: নব্য সাহিত্যের একটি সামান্য লক্ষণ এই যে, গল্প-উপন্যাস-নাটক প্রবন্ধাদি প্রকরণসকলে কবিতার মনোজ, অশোক ও নীলরক্তবান কণ্ঠস্বর শতমুখ শিকড়ের মতো না-ঢুকিয়ে কোনো লেখকের আর নিস্তার নেই। কেননা, লেখকের রচনার পশ্চাতে যে-মন কাজ করে আসলে সে—যে যাই বলুক—অমরতালোভী, এবং অন্তর্গত কবিতাবিন্যাস তার ঘোরানো কুশল সিঁড়ি। নিতান্ত খেলাচ্ছলে রচিত ছোট্টো একটি কবিতার কাগজের নৌকো তাই কোনো-কোনো সময়ে অবহেলাভরে মহাসমুদ্র পারাপার করতে-করতে সোনার তরী হ'য়ে যায়। কবিতার সর্বগ্রাস আসন্ন হ'য়ে উঠেছে একালে: কবিতা, আদি-নাগের মতো, গল্প-উপন্যাস-নাটক প্রবন্ধ জড়িয়ে, এইসকল ঠাণ্ডা ম্লান প্রকরণের শরীরে ও আত্মায় ভীষণরকমে প্রবিষ্ট হ'য়ে তাদের গড্ডলনির্ভর, জ্বলজ্বলে ও অতিব্যবহৃত শিরোনামাই ঘুচিয়ে ফেলতে চাচ্ছে। লুকোনো দুঃখের হায় কবিতা, আনন্দউদ্দীপিতা কবিতা শহরের ছলাকলাময়ী সম্ভ্রান্তির ভ্রান্তিময় বেশ্যাসম: রক্তচালিত হ'য়ে, আত্মতাড়িত হ'য়ে অনেকেই তার কাছে যাতায়াত করে: ছিপছিপে তরুণ 'ছোটোগল্প' এবং শতবিচিত্র অভিজ্ঞতায় সম্পন্ন বিশালভারি ও বয়েসী পুরুষ 'উপন্যাস', স্মার্ট ও বাচাল 'নাটক' এবং গম্ভীর ও শুচিবাগীশ 'প্রবন্ধ'—কবিতা সকলের প্রতি বড্ডো বেশি খরচ ক'রেও ফুরোয় না কখনো, আমুণ্ডুপদনখ মেয়েমানুষ হ'য়েও ফেরায় না কাউকে।

এমনকি গদ্যলেখকেরাও-যে কবিতার দ্বারা স্পৃষ্ট আধুনিক কাল তার সাক্ষ্য। এটা গদ্যরচনার পক্ষে সুখের কথা, কেননা কবিতা তাকে সপ্রাণ ক'রে তোলে। কিন্তু তাই ব'লে কোনো গদ্যরচনাকে কবিতা ক'রে তোলার চেষ্টাও অপচেষ্টা ব'লেই মনে করি: কেননা, গদ্য তার সমস্ত কলাকৌশল নিয়েও শেষ পর্যন্ত গদ্য এবং কবিতা তার সমস্ত কলা-কৌশল নিয়েও শেষ পর্যন্ত কবিতা; যে-কোনো গদ্যরচনায় (কবিতার কথা পরে বলছি) বক্তব্যটিকে আমরা প্রধান ব'লে মনে করি: প্রবন্ধে চাই যুক্তিময় স্পর্শসহ পরম্পর বক্তব্য, কথাসাহিত্যে চাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনোন্য-

শ্লিষ্ট কাহিনী—'তথাকথিত বাস্তব' না-হ'লে ক্ষতি নেই কোনো। গদ্য ও কবিতা—এই দুজনকে মেলাবার চেষ্টা আধুনিক সাহিত্যে বারবার দেখা গেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এদের চরিত্র-যে আলাদা এবং এরা-যে দুই আলাদা 'ভাবে'র বাহন এ-বিষয়ে সচেষ্ট লেখকেরা নীলিমাক্রান্তির আগেই তা বুঝেছেন।

প্রসঙ্গত, গদ্যের ধবনে সজ্জিত একরকম কবিতা আছে, তার আলোচনা করা যেতে পারে; সাধারণ, এমনকি কবিত্বময় গদ্যের থেকে, তার প্রভেদ দৃষ্টি ও শ্রুতির অধিকারী কবিতাব অভিজ্ঞ পাঠক অনায়াসে ধরতে পারেন। কোনো গদ্যরচনার উপব 'কবিতা' এই ছাপ মেরে দিলেই তা কবিতা হ'বে যায়না; যে-কোনো কবিতা লিখতে হ'লে—এমনকি গদ্যাকারে সজ্জিত কবিতাও—আগে হ'তে হবে ছন্দ, মিল, ধ্বনি, প্রতিষঙ্গ ও অভিঘাতের কুশল জাদুকর, কবির গুণগুলি যে-কোনা অবস্থায়ই আয় ক'রে না-নিলে কাজ চলে না; তা না হ'লে ছন্দমিলধারী অধিকাংশ রচনাই যেমন 'পদ্য' বা অকবিতায় অধঃপতিত হয়, তেমনি গদ্যাকারে রচিত কবিতাকাঙক্ষী রচনাও পর্যবসিত হয় নিছক গদ্যে—কিংবা তাও নয়, গদ্যেরও তো একটি চরিত্রপ্রকৃতি আছে, শক্ত মেরুদাঁড়ার অভাবে নির্বোধ পরম্পারহীন শব্দের সংকলন হয় শুধু। কাজেই গদ্য ও পদ্যের মধ্যে কোনো-এক জায়গায়-যে অহংকৃত দেয়াল তোলা আছে যার জন্যেই তাদের ভিন্ন নামকরণের দরকার হয়েছিলো—একথা আমরা না-মেনে পার পাবো না;—এবং এতক্ষণ ধ'রে আমি যা বলেছি তাতে একথা অস্পষ্ট নয় যে এই বিরোধ আকৃতিগত নয়, প্রকৃতিগত। 'গদ্য-পদ্যের মধ্যে কোনো প্রকৃতিগত বিরোধ আজ অবধি আমি ধরতে পারিনি'—সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এই উক্তি, কোনো-এক দিক থেকে সত্য হ'লেও এই কোণ থেকে তাই নিরর্থক ঠ্যাকে।

৪

'জীবন'কে যারা শতভলে আচ্ছাভাবে স্পর্শ ক'রে থাকে, তারাই ভালো কবিতা লিখবে এরকম কোনো আইন চলবে না (কবিতা বিষয়ে কোন আইনই-বা সর্বাঙ্গে সম্ভব: দেশপ্রেম বা সমাজসংস্কার, রাষ্ট্রনীতি বা ধর্মপ্রচার এসবে কিছু যায় আসে না, কবিতা কবিতা), আইন চলবে না তার অন্তিম শাশ্বত কারণ: স্বপ্ন সত্যি বা বাস্তব সত্যি কিংবা স্বপ্নই বাস্তব বা বাস্তবই স্বপ্ন—কে দেবতা নির্ধারণ করবে? শুধু কেউ-কেউ ক্ষণপ্রাণ

বস্তুর মলিন ছদ্মবেশ আর ভঙ্গুর স্বপ্নের রঙিন মুখোশ টান মেরে খুলে ফেলতে চায়,—হয়তো তাদের মধ্যেই তিমিরবিদারী রহস্যময়ী কবিদৃষ্টি আছেন লুকিয়ে। এসব বিষয়ে স্পষ্ট কোনো লোকপ্রত্যক্ষ উপসংহার টানা চলে না : একথা সকলেই জানেন, তবু এখানেই স্মরণ করিয়ে দেয়া ভালো : নীলিমাকে হাতের মুঠোয় কেউ পেড়ে আনতে পারে না, কাব্য মীমাংসা আসলে একটি অসম্ভব দরোজা, যার চাবি কোন সরোবরে বা কৌটোয় লুক্কায়িত তা কেউ জানে না, অবশ্য ভিতরে প্রবেশের তৃতীয় একটি রাস্তা আছে : তা কেবল রসিয়ে-ওঠা পাঠকের জানা, কিংবা অন্য-একজন কবির—যার বলে তিনি ঠিক আশরীর কবিতা সীমাসন্ধি-সুদ্ধু অনুধাবন করতে না-পারলেও এক-মুহূর্তে বুঝে উঠতে পারেন : কোনটা কবিতা আর কোনটা অকবিতা। আধুনিক অনেক কবিই পরস্পরের রচনাও যথার্থ উপলব্ধি করতে পারেন না, কিন্তু সেটা মোটেই দোষের নয়, সেটাই অনিবার্য : রচনা 'বুঝে' উঠতে না-পারলেও তিনি ঠিক ধরতে পারেন কোন কবিতায় ভরা আছে অকায় আশবাব, আর ঐখানেও তাঁর শক্তির পরিমাপ হয় : তথাকথিত সমালোচকের চেয়ে কবির যে-কোনো সমালোচনা—তা হ'তে পারে মৌখিক, কথাচ্ছলে অলসভাবে হঠাৎ-রচিত বা গ্রন্থলব্ধ বিদ্যার বাইরে—কবির সমালোচনা অনেক উপরে উঠে যায়, কিংবা, বলা চলে, শতচূর্ণ বস্তুর বৈদেহী অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দপদপে হৃৎপিণ্ড ছোঁয় হিরেব ছুরির মতো, অর্ধছাগ সমস্যাগুলিকে এমুড়ো-ওমুড়ো কাটে।

কবিতার দুর্বোধ্যতার সুযোগ নিচ্ছে একালের অকবিরা, কাজেই আজ 'সততা' কবির গুণের অবশ্যঅংশ হ'য়ে উঠেছে। এই সততা বলতে কী বোঝায় তার বিশদ ব্যাখ্যা দিই। শিল্পীর সততা কিন্তু সাধারণের আদর্শিক ও অতিকৃত সততা থেকে ভিন্ন (একেবারে নীলিমা-পাতালের ক্রোশ-ক্রোশ ব্যবধান হয়তো নয়, কেননা আমি মনে করি : যথার্থ কবিকে কোনো-না-কোনো দিক থেকে সান্তর 'আদর্শবাদী' হ'তেই হবে ;—এই 'আদর্শ' মানে লক্ষ্যের মহত্ত্ব ও উচ্চতা নয়, লক্ষ্যের একলব্য : পুনর্নির্মাণের পুনর্গ্রহণের নবতর, এমনকি উল্টো কিন্তু ফের ভাস্বর উদ্ধত 'একলব্য') একজন শিল্পী বদমাশ-লোক হ'তে পারে, হ'তে পারে সংকীর্ণমনা (হয়তো সংকীর্ণ-মনা হওয়াই সংগীতকারেব পক্ষে জরুরি ; আমার পূর্বোক্তি একথার বৈপরীত্য সাধছে না : 'আদর্শবাদী' মাত্রেই শেষ পর্যন্ত সংকীর্ণমনা), একজন শিল্পী

ব্যক্তিজীবনে পরিপক্ব ফাঁকিবাজ হ'তেও পারেন;—কিন্তু তিনি হবেন অতিসচেতন, আসলে অতি-সচেতনাই কবির সততা: নিজে কী করছেন ও তার প্রতিক্রিয়া কী সে-সম্বন্ধে নিজস্ব অগুপ্ত আয়না থাকবে তার, নিজের সৃষ্টির প্রতি অক্ষরে-অক্ষরে সৎ থাকবেন তিনি, অবচৈতন্যের সততাও এর অন্তর্ভূত,–আর এই কাজে একজন চেতনশিল্পী মোটেই বিঘ্নের সম্মুখীন হন না, কারণ লেখায় ফাঁকি দিয়েছেন কিনা সেটা কবির কাছেই প্রথম ধরা পড়ে।

স্বকীয় সৃষ্টির প্রতি আক্ষরিক 'সৎ' থাকতে হবে ব'লে যে রচনামাত্রই ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের ফাটলে 'অকৃত্রিম' হবে এবং পথপার্শ্বের খানা-ডোবায় পা পড়লেই অপ্সরী তার নীবীবন্ধ খশিয়ে আদ্যন্ত তলিয়ে যাবে, আমি এমন প্রচলননির্ভর কুসংস্কারাচ্ছন্ন আত্মজালিয়াতিময় কথা বলতে চাই না। আসলে শিল্প তো জন্মপত্রেই কৃত্রিম, আদ্যন্ত কৃত্রিম, ফোলানো-ফাঁপানোর অতিকৃত অথচ নির্বিকার পরাকাষ্ঠা; ছোটো শিল্পীর কৃত্রিমতা ধরা প'ড়ে যায় সামান্যচেতন পাঠকের হাতে; বড়ো শিল্পীর লক্ষণই হ'লো, তিনি, অন্তত কখনো-কখনো, অকৃত্রিমতার অভিনয় করতে পারেন, এবং সে-অলজ্জ অভিনয়ে এমন পারদর্শিতার সহিত উৎরে যান যে আমরা চাতুরী ও কুশলতা টের পাই না;—তাতে অবশ্য ক্ষতি নেই মাধুরী বাঁকা ফুটো-করা খেজুর গাছের দেহ থেকে চৈতন্যের সারারাত ধ'রে শৈশবের ভুলে-যাওয়া আধো-আলো-জ্বলা কলস ভরায় ঝ'রে-পড়া লুকোনো আর্দ্রতম আশরফির ভারে-ভারে। বড়ো শিল্পী হচ্ছে বড়ো ফাঁকিবাজ।

তত্রাচ, আমি এমন কথা মানি না: জীবনে যারা 'পাপী', কবিতায়—যদি কবিতা লেখে—তাদের সম্ভাবনা বেশি; আমি বুঝি না শিল্পের উপদ্রব উপভোগ কোন সময়ে হবে তাদের। কবি যদি পাপকর্ম করতে চান তাহ'লে শব্দের সঙ্গেই করা ভালো: এ-বিষয়ে যিনি যতো আত্মতাড়িত ও অবাস্তবপীড়িত, ততো বড়ো। এলোমেলো আক্রমণ নয়, বীথি-করা মৌল আক্রমণ, আবেগের ভার ঝরিয়ে মৌল উচ্চারণ, অন্তর্বিপ্লবের অর্ধচেতন বিশ্লেষণ, উন্মোচন, নিষ্কাশন। শব্দের পাপের সঙ্গে মেলাতে হয় কম্পমান অগ্রসরমান ভাবনা-বেদনা; কেননা কেবল শব্দবিন্যাস অকবিতা, বিষয়ের উৎসঙ্গে অনিবার্য শব্দস্থাপনই অনিবার্য কবিতার জন্ম দিয়ে যায়, তা না হ'লে শূন্য ও ভঙ্গুর পদ্য সৃষ্টি হয় মাত্র।

কবি সহবাসনিষিদ্ধ শব্দের সঙ্গমে পুরোহিত। কবিতার সবচেয়ে বড়ো উপকরণ: শব্দ; কবিতার প্রত্যেকটি বিশিষ্ট স্থানের জন্য ত্রিলোকে

যথাযথ একএকটি—একটিমাত্র—শব্দ আছে ; কবি ঐ শব্দটি মগজ থেকে মুঠোয় নির্বাচন করেন স্বর্গ থেকে ; ঐ একটিমাত্র শব্দের পরিবর্তন, রূপান্তর বা অনুবাদ হয় না। অভিধানে একই শব্দের অনেক প্রতিশব্দ পাওয়া যায় ; গদ্যে হয়তো একটির বদলে অন্য যে-কোনো একটি শব্দ বসিয়ে দিলে কাজ চ'লে যায়, সেখানে পাঠকের 'লক্ষ্য' থাকে 'অর্থে'র দিকে, 'অর্থ' মনের মধ্যে প্রতিভাত হ'লেই পাঠক এগিয়ে যায়। পক্ষান্তরে, ভালো কবিতায় একেকটি নির্দিষ্ট স্থানের একেকটি নির্দিষ্ট শব্দ থাকে, ভালো কবি অবচৈতন্যের নৌকোয় চ'ড়ে ঐ শব্দটি ব'য়ে আনেন, কিন্তু অপরের পক্ষে তা সম্ভাব্যের পরপারে। কোনো একটি-শব্দের সকল প্রতিশব্দ ও তাদের বিভিন্ন বিচিত্র ব্যবহারও কণ্ঠস্থ থাকতে পারে বিদ্বান ব্যক্তির, কিন্তু কোন-বিশেষ স্থানে কোন বিশেষ শব্দটি যোজনা করতে হবে, এবং তাহ'লে—তাহ'লেই কবিতার অভিজ্ঞ পাঠক তীরবিদ্ধ হবে একথা তার জানার কথা নয় ; কেননা চৈতন্য দিয়ে তিনি যা খুঁজছেন, ইন্দ্রিয়-পারের বোধ দিয়ে কবি তা পেড়ে আনেন, তারও কারণ এই যে কবিতায় শিক্ষা, বিজ্ঞান বা দর্শন কোনোদিন প্রত্যক্ষ মর্মবাণীতে কাজ করে না। প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে না, কিন্তু কবিতার আড়ালে শিক্ষা, বিজ্ঞান বা দর্শন শিরার মতো অনুলাপে লুকিয়ে থাকে, টান ক'রে রাখে, থাকে ইশারার কলকব্জার মতো অশরীরীভাবে। অবচৈতন্যের নৌকোয় চ'ড়ে কোনো-একটি নির্দিষ্ট শব্দ, কোনো-একটি 'প্রেরিত' শব্দ আনতে হয়তো শিক্ষা, বিজ্ঞান বা দর্শন বড়োজোর দাঁড়ের মতো কি পালের মতো কাজ করে, কিন্তু অবচেতন ঐ মাতাল নৌকোর লুকোনো অর্ধপাগল কিন্তু আশ্চর্য কর্মপটু অধ্যক্ষ।

যে-কোনো শব্দই ডেকে আনতে পারেন কবি, কিন্তু এই আহ্বান হবে ঘোষকের মতো কি কর্মীর মতো নয়, হবে কবির মতো, এ-বিষয়ে একমাত্র নির্দেশ দিতে পারেন কবিচৈতন্য, আর-কেউ নয়। গদ্যের কথা এই মুহূর্তে অপ্রাসঙ্গিক, তবে কবিতায় কোনো শব্দই পুরোনো বা অব্যবহার্য হ'য়ে যায় না, যাকে আমরা 'পুরোনো' বা 'অব্যবহার্য' শব্দ বলি তা-ও সময় ও ক্ষেত্র-বিশেষে কাজে লাগে। সেজন্যে যাঁরা মনে করেন চলতি কথা ও বুলিই সাহিত্যের—আধুনিক সাহিত্যের অপরিহার্য ও বিশ্বম্ভর বাহন, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। উদাহরণত, কথায় আমরা 'গাছ' শব্দ ছাড়া অন্যকোনো প্রতিশব্দ ব্যবহারই করি না ; কিন্তু কবিতায় তার যে-কোনো

প্রতিশব্দ—অবশ্য সময় ও ক্ষেত্র-বিশেষে—ব্যবহার করা চলবে না, একথা তো বলতে পারি না। তিরিশচেতন কবিরা অনেক শব্দ দরোজা থেকে ঘাড়ে ধ'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, কখনো জোর ক'রে ফিরিয়ে, তন্মুহূর্তে দরকার ছিলো তার,—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর সমকালীন সমতল পার্থক্য-রহিত কবিপ্রবাহের কবল থেকে আবহমান বাংলা কবিতাকে বাঁধ বেঁধে বাঁচাবার জন্য তার তৎকালীন গদ্‌গদ্‌ সহযোগ ও দৌত্য ছিলো অবশ্য-স্বীকার্য। বর্তমান মুহূর্তের কবিরা ঐসব তাড়িয়ে-দেয়া ভাগিয়ে-দেয়া করুণ-রঙিন শব্দাবলিকে ফের ডেকে এনে ভোজে বসাতে পারেন। বস্তুত শব্দবিদায়ের কাজে তিরিশচেতন কবিদেরও পূর্ণ সার্থকতা ফলেনি, আর ফলেনি ব'লেই তাদের খাঁটিত্ব স্বয়ংপ্রকাশ, কেননা ঘোষিত কানুনের সঙ্গে কোনো শিল্পীই খাপে-খোপে মিলে যেতে পারেন না মাস্তুল ঘুচিয়ে।

শব্দের পাপ বাঙালি কবিতার এই সময়ের পক্ষে সবচেয়ে জরুরি ব'লে মনে হয়। তবে, একথা ভুলে যাওয়া অপরাধ যে, যে-কোনো সময়ে একজন কবিকে প্রথমে 'কবি' হ'তে হবে,—এবং এটাই প্রথম ও শেষ কথা। কবি —একমাত্র কবির জন্যই মধ্যপন্থা নেই, যেতে হবে সকলের মধ্যে পথ ক'রে; একমাত্র কবিই চান সর্বাংশে ভালো হ'তে কি সর্বাংশে মন্দ হ'তে; যে একই সঙ্গে নিজেকে ঈশ্বরের উপর ঈশ্বর ও কুক্কুরের অধিক কুক্কুর ব'লে অনুভব না-করবে, তার পক্ষে কবিতা রচনার বৃথা চেষ্টায় সময় হত্যা করবার কোনো দরকার নেই। স্পন্দমান অতিওয়ারিশ শিশ্নের হরষে ও তুঙ্গ বিলোড়নে যিনি বারেবারে মুগ্ধ হননি, তাঁর পক্ষে এই শনির সময়ে কবিতা-রচনা অসাধ্য ব'লে মনে করি। বিদ্যালয়ে **'sensual' ও sensuous'** এই দুই শব্দের ভিন্নার্থ বালকেরা প্রাণপণে কণ্ঠস্থ করে; কিন্তু কবিতাসৃষ্টির গভীরতলে এরা একই স্বপ্নখানির পদদ্বয়, একই জন্মউৎস এদের, অন্তত কোনো-কোনো কবির রচনায় এরা একই পরিপূর্ণিমায় লয় পায়, ফ'লে ওঠে সকল বিদ্রূপ-ভরা ব্যবধান নুইয়ে ও উড়িয়ে পাতার ফাঁকে-ফাঁকে নীলারুণ, স্ফুট, পরিপক্ব ফল। চিৎপুরে লাল-নীল-সবুজ তমসা ও আভা, পরিবর্তমান কম্পমান অগ্রসরমান, কখনো খুদ্ধির তলে, কভু বুদ্ধির বিজয়ে, হৃদয়ের টেলিফোনে কি বালুচরে, অলিভ বৃক্ষের শিরে রাঙা পাখি আর নাগলতা, তীব্র নিরর্থক বাতাস, উল্লাস, গ্লানির লাল গর্ত, পূর্বাপরময় বাঁকা নামহীন, যুক্তিহীন, বসনভূষণহীন মহাসাগর, চিৎপুরের অলিগলি।

কেউ-কেউ গোপন স্মরণ থেকে কিছুতেই নিস্তার পায় না—স্বপ্নে না, তন্দ্রায় না, জাগরণে না ; টাকার, খ্যাতির, জ্ঞানের, নেশার, মেয়েমানুষের, ঘৃণার, ভালোবাসার,—কারো পিছনে ছুটেও সেই নিরন্তর, ভীষণ, পবিত্র, সুন্দর, নিষ্ঠুর, গোপন স্মরণ থেকে কিছুতেই নিজেকে বাঁচাতে পারে না—কবি হওয়ার সম্ভাবনা তাদের মধ্যেই বেশি ; কবি—একাধারে জন্মান্ধ ও শতচক্ষু, চূর্ণ-চূর্ণ টেনশনের জন্মদাতা ও সন্তান, কশাইয়ের দোকানের বাঁকা চোখা শিকে-ঝোলানো মাংসপিণ্ড ও মারাত্মক ছুরি, একদেশদর্শী ও সর্বদৃষ্টিময়, মমতায় মাতা ও নিষ্ঠুরতায় জল্লাদ, বিদ্যুৎবিদ্ধ কিশোরের মজ্জায় ও পরিপক্ব বৃদ্ধের বিমর্ষ গাম্ভীর্যে ভরা—একই সঙ্গে হাজাররকম বৈপরীত্যের ধারক। জনতার প্রতি কবি পবিত্র ঘৃণায় তীক্ষ্ণ আবার মনে-মনে তিনিই জনতার প্রতি সবচেয়ে করুণাময় : 'আমি তোমাদের ঈশ্বরের মতো ভালোবাসি বটে, কিন্তু আমার ধারে কাছে এসো না হে, তোমাদের সঙ্গ সহ্য করবার ক্ষমতা আমাকে বিশ্বনাথ দ্যাননি। ওগো সমীচীন মানব, দূরে-দূরে থাকো যদি আমার সর্বচরাচরগ্রাসী ভালোবাসাসংকাশ হারাতে না-চাও।'

৫

কবি, সকলের মতোই, সময়শাসিত। এক, দেড় কি বড়োজোর দু দশকে কবিতার প্রাক্তন ভাষা ছিন্ন হ'য়ে কিংবা ঈষৎ বদলে নতুন আকার ধারণ করে, নতুন কান্তি ও স্থাপনা ; বিশেষ কোনো সময়পুরুষের অন্তর্গত ছোটো বড়ো সকল কবির ভাষাব্যবহারে একটি লক্ষণীয় সাদৃশ্য বিরাজ করে। বড়ো কবি ঐ ভাষারীতির ভিতরে স্বকীয় ভাষাচারিত্র ঢুকিয়ে ভাবনা, বেদনা ও লেখনীর আশ্চর্য সন্নিপাত ঘটান, সংযুক্ত ঐতিহ্যের সুবিধায় ; আবার তার মধ্যেই প্রাক্তন ও সাধারণ্যের অভিধান ছুঁড়ে ফেলে স্বরচিত ও অদ্যতন অভিধান কুড়িয়ে নেন : অভিধান—নিজস্ব শব্দ, ছন্দ, ধ্বনি, জ্ঞান, অনুভব, প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, ইত্যাদির সম্পূর্ণ নির্মাণে প্রত্যেকটি কবি একেকটি স্বতন্ত্র নিজস্ব অভিধানের রচয়িতা ; সেজন্যই একই শব্দ দুজন কবির করতলে ভিন্ন অর্থের জন্ম দ্যায়, এমনকি সমারূঢ় পণ্ডিতের একই ছন্দ দুজন কবির হাতে বিভিন্ন ছন্দের আকারে নেয়, এবং সেখানেও কবিত্বের একটি নির্বচন অলক্ষ্য পরিমাপ দাঁড় করানো। এই শেষোক্তির উদাহরণ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বলাকা"র ছন্দ ও জীবনানন্দ দাশের অধিকাংশ কবিতার ছন্দ ছান্দসিকের মানদণ্ডে এক, অথচ গভীরতর কবিতা-সমালোচকের চোখে নীলিমা থেকে পাতাল পর্যন্ত ব্যবধান জেগে আছে। গদ্যে

শব্দার্থ পরিবর্তনভীরু; একই অভিধানের নিচে চিরন্তনের ফসল মুড়িয়ে চলে; তারও অবশ্য কোনো-কোনো শব্দ ছিটকে পড়ে বিস্মরণে, ভঙ্গি যায় পাল্টে, যাকে বলা হয় 'গদ্যরীতি' তার মুখচ্ছবি বদলে যায়। পক্ষান্তরে, কবিতায় এই পরিবর্তন অতিদ্রুত, বিকাশ নিপট অন্তঃশীল, রীতি একেবারে অনন্য। সাহিত্য, শিল্পের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে পেছিয়ে আছে, এই মর্মান্তিক সত্যের বিরুদ্ধে একা কবিতা ঘাড় তুলে দাঁড়াতে পারে: কেননা, কবিতার সূত্রপাত যেমন সাহিত্যের জন্মমুহূর্তেই, তেমনি তার গন্তব্যও কায়মনোবাক্যের বাইরে, বয়সে সে যেমন সকলের চেয়ে বড়ো, তেমনি তারুণ্যেও সে সাহিত্যের বহুভিন্ন প্রকরণের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর, বলীয়ান ও নমনীয়।

আবেগের চাপে অধিকাংশ বাংলা কবি এখনো ভাসমান—অপোচ্ছ্বাসে, শব্দস্রাবে। সাহিত্যব্যাপারে আবেগের দাম আমিও মানি; কিন্তু, অন্তত একফোঁটা বস্তু না-থাকলে কোনো রচনা যে মোটেই টেকে না, মূলধন সুদ্ধু অকাব্য উবে যায়—তার অসংকুচিত প্রমাণ মাসিকপত্রের ম্যুজিয়মে রাখা। এমনকি জানোয়ারবাক্যেও বস্তুসত্য সংবদ্ধ, একথাটি অধিকাংশ কবি ভুলে যান ব'লে ছোট্টো একফোঁটা বক্তব্যও থাকে না, এবং বক্তব্যহীন কবিতা—সাম্প্রতিক অতিবাক্যশীল গল্পউপন্যাসও বটে—হিরের রজতপিণ্ড মাত্র। আঁধারপ্রধান দূরগামী গন্তব্যে এই প্রথম শর্তটি যেন আমরা না-ভুলি: আবেগ দামি জিনিশ, কেননা তার আভ্যন্তর বিশাল চাপে তার নির্দিষ্ট অথচ নিরুদ্দেশ যাত্রা, কিন্তু অপোচ্ছ্বাস একমাত্র কর্দমে গেড়ে যায় স্পষ্ট কোনো বক্তব্যের অভাবে অনাথ।—অবশ্য যে-কোনো রচনা প্রকাশের নিকষেই বিচার্য: যেমন ধনী-বক্তব্য প্রকাশের অবমাননায় ধুলোয় লুণ্ঠিত হয়, তেমনি সামান্য হ'য়ে ওঠে গরীয়ান তার যথাযথ বৈভবে ব্যবহারে। এখন, প্রাক্তন প্রকাশভঙ্গি, তার প্রতি শ্রদ্ধাবান হ'য়েও, পরিবর্তনের মুখাপেক্ষী ব'লে অনুভব করি; কারণ, ব্যবহৃত হ'তে-হ'তে তার প্রাচীন মলিন আয়ত প্রবাহ নব্য মৌলিকতার জন্ম দিতে পারে না। বিশেষত, প্রতি যুগে বলবার কথা মানস-সরোবরে এমন-কিছু নতুন জমে না, পুরোনো সর্বপরিচিত খবর নিয়েই নব্য সাহিত্যের তুমুল বাণিজ্য জ'মে ওঠে, প্রকাশভঙ্গির নবত্বেই তার মৌলিকতা রাষ্ট্র হয়। প্রায় একই বলবার কথাকে ঘিরে-ঘিরে চিরসময়ের ছোটোবড়ো শিল্পীসকলের আপনাপন আক্রম।—বাংলা

কবিতার এখন একটি মোড় ঘোরবার সুসময় উপস্থিত; এবং তা কোন অব্যক্ত পথে তা একমাত্র প্রেরিত কবিই জানেন, কিংবা তাঁরও অজ্ঞাত,—আমরা শুধু বাইরে থেকে দু-একটি সম্ভাবনা উচচারণ করতে পারি মাত্র।

এখানে আমার একটি নিজস্ব ধারণার কথা বলি: আমার মনে হয়, প্রায় প্রত্যেকটি কবি পূর্ণতায় যতোদিনে পেঁৗছোন ততোদিনে তার মধ্যে তাঁর সাহিত্যের প্রায় আবহমান কবিতার ইতিহাস রচিত হ'য়ে যায়, অর্থাৎ কবির বৃদ্ধির ইতিহাস ঐ সাহিত্যের কবিতার কোনো-এক সময়াংশ থেকে বর্তমান পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয়বাহী সূচিপত্র। অবশ্য, এই সংক্ষিপ্তি দ্রুত অতিক্রম ক'রে যখন নবতর নক্‌শা সৃষ্টি করতে পারেন কবি বিদ্যুৎক্ষমতায়, তখনই তাঁর সার্থকতার সূচনা; এবং পদ্য-লেখক বা অকবিরা উপর্যুক্ত ইতিহাসের কোনো-একটি অংশে স্ফুরিত হ'য়েই ফুরিয়ে যান। তা না হ'লে, একথা কিছুতেই বলা চলে না যে, কবি ব'লে একজনের অনুভব-শক্তি অপরের চেয়ে বেশি; অকবি, ছোটো কবি বা বড়ো কবি: অনুভূতি সকলেরই একরকম হ'তে পারে, এমনকি অকবি বা কোনো-একজন সাধারণ মানুষের বেশি হ'তেও পারে, কিন্তু তা দিয়ে কবিত্ব রটে না—তাহ'লে 'নীরব কবির' অস্তিত্ব এতদিনে সম্ভব হ'তো—কবিতা বলতে যেহেতু একটি শরীরী ব্যাপার বোঝায়, অতএব, অনুভূতি বা তার রূপায়ণই কবিতা, এবং ঐ কাজে যিনি যতো কুশলী ও গভীর, 'কবি' হওয়ার সম্ভাবনা তাঁরই বেশি। কবিতা ব্যাপারটি-যে শুধুমাত্র বায়বীয় অনুভব নয়, শুধুমাত্র ঈশ্বরদত্ত সম্পদ নয়, উপরের উক্তির প্রমাণেই তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত। অনুভূতি-বিন্যাস হয়তো প্রকৃতির প্রভাবিত; কিন্তু কবিতা লিখতে হ'লে শুধু অনুভূতি কোনো কাজে আসে না, মননচর্চা ভিন্ন গত্যন্তর নেই, অন্তত মননের ধ্রুপদ খেয়ালই অনুভূতির মুক্তিদ্বার। অতঃপর এরকম সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হ'য়ে ওঠে: প্রাক্তনীরা যাই বলুন-না কেন: কবিতা চিরকালই মননভূমির শস্য, বুদ্ধির সন্তান।

৬

আমি মনে করি 'কবিতার অনুবাদ' কথাটি সোনার পিত্তলমূর্তি মাত্র। সাহিত্যে অনুবাদ ব্যাপারটি উচ্ছেদ করা আমার মনঃপূত, একথা আমি বলতে চাচ্ছি না; কেননা অনুবাদের অনেকরকম উপকারিতা আছে: বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়সাধন ও কোনো বিশেষ লেখকের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করা, ইত্যাদি, তার অন্যতম; গল্প-নাটক-উপন্যাসাদি—

যাকে 'কথাসাহিত্য' নামে অভিহিত করা হয়—তার অনুবাদ সম্বন্ধে আমার কোনো আপত্তি নেই, কেননা সেখানে 'কাহিনী', চরিত্র, ঘটনা, এমনকি মনস্তত্ত্ব, এবং এইসবের সারাৎসার কোনো-একটি কথাই জরুরি;—আর, এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় বক্তব্যের যাতায়াত ও সঞ্চার অনায়াস, এবং কোনো গদ্যরচনায় কাহিনী, চরিত্র, ঘটনা মনস্তত্ত্ব বা যুক্তিপরম্পরাময় বক্তব্যের পশ্চাদ্ধাবনেই আমাদের মন অন্ধের মতো উজ্জ্বলভাবে নিযুক্ত থাকে। পক্ষান্তরে, কবিতায় বক্তব্যটিকেই প্রধান ও একমাত্র ব'লে মানতে আমি অক্ষম। শব্দ, উপমা, চিত্রকল্প, ছন্দ, ধ্বনি, ভাব ও কল্পনার সহযোগে যে-অর্কেষ্ট্রার মুগ্ধ জন্ম, তার অনুবাদ বা রূপান্তর অসম্ভব: হয়তো শব্দ (এবং তার শরীরজড়িত প্রধান দুই জাদুকর: রূপ ও ধ্বনি) বাদে অন্য উপচয়গুলির অনুবাদ সম্ভব; কিন্তু শব্দই তো কবির স্বর্গবিজয়ের অস্ত্র, 'আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ', এবং শব্দের রূপ, ধ্বনি ও অনুষঙ্গসহ মূল রচনা ছাড়া অন্য ভাষায় অনুবাদ সম্ভাব্যতার সন্ধিসীমার ওপারে;—এমনকি একই ভাষার কবিতায় একটি শব্দের বদলে অন্য একটি একই অর্থবোধক শব্দ-যে বসানো যায় না এটাই প্রমাণ করে যে, কবিতার অনুবাদ প্রচেষ্টাটি কী পরিমাণে হঠকাবিতা। একটি কবিতা পৃথিবীতে এক ভাষায় একবার মাত্র লিখিত হ'তে পারে।

তাহ'লেও এই গ্রহের অনেক কবিই মৌল রচনা ছেড়ে কখনো-কখনো অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁদের মধ্যে শক্তিমান অনেক কবিও আছেন। এসকল অনুবাদ অনেক সময়ই বন্ধ্যা সময়ের ফসল, খেলাচ্ছলে রচিত, শৌখিনভাবে, তাতে শারদ-অভ্যাস বজায় থাকে এবং কখনো-কখনো হারানো-ছড়ানো প্রেরণা হঠাৎ বিশ্বস্তর জাগরণে বেলা অতিক্রম করে, ফের তীব্র দীপ্র ভেলা ভেসে যায়। (কবি বাদে অন্যান্য যাঁরা কবিতার অনুবাদ করেন, তাঁদের সম্বন্ধে কোনো কথা বলাই বাহুল্য: দীর্ঘ-দিনের অভ্যাসে যার শব্দ ও ছন্দের উপর অধিকার জন্মায়নি, স্বকীয় কবিতায় যিনি বারবার সঁপে দেননি নিজেকে তাঁর পক্ষে অসম্ভব অপরের কবিতার অনুসরণ: জীবন ও শিল্প-দৃষ্টিতে এক কবির সঙ্গে অন্য-এক কবির যতো পার্থক্যই থাকুক যে-কোনো দুই কবিচৈতন্যের জন্মউৎস একই সমতলে—দুঃখের সুখে বা সুখের দুঃখে।—আরো: আমি এমন কথা বলছি না যে-কোনো কবিতায় এককণা বক্তব্য—যা জীবনদৃষ্টিরই প্রসাদ—থাকবে না; আসলে তা তো হ'তেই পারে না: যে-কোনো বক্তব্যরহিত রচনা ভঙ্গুর

ও শূন্যময়, এবং আজকালকার অধিকাংশ কবিতাই লুটিয়ে পড়ছে বক্তব্যের কঠিন মেরুদাঁড়ার অভাবে: বরফ-আগুনের অন্তর্সংঘাত নেই, ক্ষুরধার চিন্তাপ্রণালী নেই, অনুভূত চান্দ্রবিলাস নেই, অর্থাৎ এককথায়, হায় বক্তব্যও নেই। তত্রাচ, সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণ ও বিভাগগুলিতে বক্তব্যই যেমন প্রধান রাজপথ, কবিতায় কখনো তেমন নয়; আমার মনে হয়, কবিতায় অনুভূতিই মুখ্য মূলধন এবং সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণসকলে অভিজ্ঞতাই প্রোজ্জ্বল রাজধানী।) অনুবাদকাব্যে তখনই সোনার ফসল ফলে, যখন কবি আক্ষরিক রূপান্তরের প্রয়াসে পণ্ডশ্রম করেন না, যখন কোনো কবিকে শিকড়ের মতো অবলম্বন ক'রে বেজে ওঠে তার স্বকীয় ভাবনানদী, অর্থাৎ একজনকে ভ্রাতৃসম দাঁড় করিয়ে কবি তাঁর কাজ ক'রে যান, 'তাঁর কাজ', অর্থাৎ তাঁর মৌলিকতা। অবশ্যই পণ্ডিত বা সমালোচকের সন্তুষ্টি এরকম অনুবাদে মেটে না; কেননা আসলে এটি অনুবাদই নয়, এটিও বস্তুত মৌলিক কবিতা—মৌলিক ও নিজস্ব—অন্য-একজন কবির সঙ্গে প্রত্যক্ষ মিলনেই তার জন্ম। এজন্যই এরকম শোষিত দ্রাক্ষার কালো সোনায় নিজস্ব ভাবনা-বেদনার বিচ্ছুরণ অবশ্যম্ভাবী, তা না হ'লে তা কবিতা নামেরই অযোগ্য হ'য়ে যায়। সুতরাং অনুবাদ-কবিতা সম্ভব নয়। এবং এই হিশেবে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ-কাব্যের 'প্রতিধ্বনি' শিরোনামা প্রচুর অর্থবহ: এবং 'অনুবাদ'-নাম উচ্ছেদ ক'রে তার বদলে 'প্রতিধ্বনি'-কথাটি ব্যবহার করলে অনেকাংশে সত্যরক্ষা করা হয়,—কারণ প্রতিধ্বনি ঠিক একতাল ধ্বনির অনুকরণ নয়, এমনকি তার 'অর্থ' কখনো বিরোধীও হ'য়ে ওঠে, হ'য়ে ওঠে অনুভাবনার অনুকূল,—যেমন অনুবাদ-কবিতায় হ'তে পারে। দেখা যাচ্ছে, আমি যে-ধরনের কবিতার অনুবাদ সমর্থন করি, আসলে তা 'অনুবাদ'ই নয়। ফলত, অনুবাদ-কবিতার সার্থকতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ বদ্ধমূল।

৭

কবিতা-বিষয়ে অনেক দিনের বিচ্ছিন্ন ভাবনা-বেদনা গেঁথে যাই, সুতোটি লুকোনো আছে কি নেই ভালো পাঠকের দায়িত্বমধুর কাজ সেটা। এসব বিষয়ে স্পষ্ট ও শেষ-কথা বলা অনাবশ্যক; সাহিত্যে এরকম কেউ বলবে না বড়ো-বড়ো সিতাংশু আলোয় ও নীলাঞ্জন আন্দোলনে ছোট্টো ক্ষীণ চূড়োয় যখন থরথর কাঁপছে আসন্ন কবি; বরং অফুরান গোধূলিভাষ্যে ভরা থাক। আদর্শ কেউ নেই, শুধু একটি স্মারক ইশারা সজীব, চঞ্চল ও

অস্থির হ'য়ে ছিন্ন দেবদূতের ভাবনায় শস্যশূন্য অবেদ্য সংগীতের মতো চ'লে যেতে পারে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। যেমন শব্দের কেমিষ্ট্রির ভিতর বিশ শতকের পক্ষে বড়ো বেশিরকম কবি ডিলান টমাস পুরে দিতেন কবিতার জল, পাখি, পাহাড়, যৌনতার সারাংশ ও আমাদের কাঁপা বাঁকা 'নপুংসক স্বপ্নগুলি'। ভ্রূ-গাঁথা বিচারক যাই বলুন: কবির কাছে কবিতা একাধারে মাতা, কন্যা, পত্নী ও রক্ষিতা: কবি রোজ এদের সঙ্গে আড় হ'য়ে, চিৎ হ'য়ে, কাৎ হ'য়ে, কখনো বিরুদ্ধে এক বিছানায় শুয়ে থাকেন। তখন সম্ভ্রান্তির ভ্রান্তিময় সামাজিক বিচাররশ্মি এড়িয়ে চ'লে যায় কবির অন্তর্ময় তৃতীয় চক্ষু; সময়শাসিত কবি যতিচিহ্নরহিত আনন্ত্যে উড়াল দিয়ে চ'লে যান এক মুহূর্তের শীর্ষে-শীর্ষে: সব উন্নতি, আকাঙ্ক্ষা, নেশা, দিনানু-দিনের দারুণ-তুচ্ছ নিষ্ঠুর-কাঙাল যুদ্ধ, এইখানে এসে ঝ'রে যায়, ম'রে যায়; তখন তাঁর চাউনি চারিয়ে যায় জীবনের সকল গভীরে, সম্ভাব্যে ও আয়তনে, বাঁধা পড়ে স্বরচিত অভিজ্ঞ নিজস্ব চুক্তিতে, গেঞ্জিহীন, লুঙ্গিহীন, সায়াহীন, ব্রাশিয়ারহীন পরিকল্পনার ভিতরে চলে যায়।।

মোহাম্মদ রফিক

কফিনে শাদা গোলাপ

Not by weeping will raise the dead to life
Sons of Gods immortal
wither into darkness.
—*EURIPIDIS*

রাইনার মারিয়া রিলকে—সমস্ত নামটার ধ্বনি যেন সঙ্গীতের আপেক্ষিক অস্তিত্ব। পর্বতশিখরের ম্লান চিন্ময়তায় অথবা ঢেউ-এর শীর্ষদেশের নীরবতায় এই একটি নাম সঙ্গীতের গভীর সুপ্তি বিলিয়ে যায়। এই অবচেতনার ক্রমবিকাশের পরিণতি আপেলের পরিপক্কতায়। অর্ফিয়ুসের বাঁশীর সুরে যে কুমারী ঘুমের তন্ময়তায় আমাদের কানে স্থান পেতে নিয়েছে রিলকে ঐ কুমারীর আশ্চর্য হৃদয়। চেতনায় যার সুপ্তির, অবচেতনার গভীর উন্মেষ।

'নিঃসঙ্গতার শান্তাক্লস' রিলকে। নিঃসঙ্গতার অন্তরে জন্ম ও ক্রমপরিণতি। রিলকে, নিঃসঙ্গতাই যাঁর সঙ্গ, নিজের অস্তিত্বে অস্তিত্বে সৃষ্টি করেছিলেন নির্জনতার দর্শনঃ তাঁর জীবনের ও কাব্যের। কঠিনতম নির্জনতার প্রতীক মুজতের গৃহে জন্ম নিলো তাঁর দুটো সৃষ্টিঃ অনবদ্য, অপূর্ব। অমরতার পটভূমি। সমস্ত জীবন তিনি নিঃসঙ্গ, শৈশবে যৌবনে 'পুতুলের' মত তাঁর চেতনার বিকাশ। প্রেমের দীপ্তিতে তিনি বিশ্বাসী, কিন্তু ভালোবাসতে পারলেন না কাউকে। ভালোবাসতে পারেননি দেশ, প্রিয়া, আন্তরিক সব অস্তিত্বকে। রিলকে নিঃসঙ্গতার কবি, তবু তাঁব আবেদন শুধু সাম্প্রতিক নিঃসঙ্গ চেতনায় নয় বরং সে চিরন্তন বাতাসের স্বর হয়ে আমাদের জীবনের কলকণ্ঠকে উদ্দীপ্ত কোরে দিয়ে যায়।

তিনি কবি, কেবল কবি। মহাপুরুষ নন, ঋষি নন, শুধু কবি। সমস্ত জীবন তাঁর শুধু কবি হবার, আত্মস্থ হবার সাধনা। নিজেকে আবি-

ষ্কারের ধূসর ঐকান্তিক প্রয়াস। পর্বতের উঁচু চূড়োয় দুটো বিষাদময় চোখ মেলে দাঁড়িয়ে বিরাট শূন্যতাকে চেয়েছেন নিজের সজীবতা দিতে। এত ধূসর আগ্নেয়তা তাঁকে ঘিরেছিল, যাকে অতিক্রম কোরতে পারে কেবল কবিরা; সমালোচকেরা নয়। বারবার তাঁকে ভুল বুঝলেন সমালোচকবর্গ; সেই অনন্তের গূঢ়তায় তাঁরা কোনদিন পৌঁছতে পারলেন না।

এই নিঃসঙ্গতাকে রিলকে নিজেই ব্যাখ্যা কোরে গেছেন। সমস্ত জীবন মাকে পারলেন না ভালোবাসতে। মা'র অভাব দূর কোরতে বারবার দ্বারস্থ হয়েছেন বিভিন্ন মহিলার; নিজের অস্থিরতার পরিবর্তে তাদের কাছ থেকে উপহার পেয়েছেন আরো অস্থিরতা। বৃদ্ধি পেয়েছে মূঢ় মূক বেদনা। রূপলাভ কোরছে সব কবিতা, যারা শিশিরের ফোটার মত নিটোল, সম্পূর্ণ। ক্রাইস্টের অস্তিত্ব অনুভূত হয়েছে চেতনায়। মাতৃক্রোড়, অনাবিল আনন্দের শৈশব, অকৃত্রিম প্রেম, ঘরের অস্তিত্বের আর্তি বারবার তাঁর ম্লান নিঃশ্বাসকে ভরে তুলেছে। শুধু মূর্খ আবেগ, মৃত্যুর পদধ্বনিতে অস্থির জীবনের চেয়ে জন্তুর নিরানিষ অস্তিত্ব তাই মাঝে মাঝে তাঁর অন্বিষ্ট। সেখানে তাঁর হৃদয়:

And somewhere lions still roam, all unaware,
In being magnificient, of any weakness !

তারপর সূক্ষ্মতম বিকাশ নিঃসঙ্গতার বৃদ্ধিকে আন্তরিক কোরে তুলেছে। বারবার আঘাত কোরেছে মৃত্যু, বেদনা, শোক আর দুঃখ। প্যারী, স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, বন্ধুদের মৃত্যু, জীবন থেকে তাকে নিয়ে গেছে নির্জনতায়, নিজের আত্মায়।

রিলকের জন্ম প্রাগে। লিখলেন জার্মান ভাষায়, আর প্রেরণা পেলেন নন্দনতত্ত্বের আশ্রয়ে। সমস্ত জীবন আদর্শ থেকে আদর্শে, ঘর থেকে ঘরে, কেবলই প্রদক্ষিণ করলেন নিষ্ফল অন্তরঙ্গতার সন্ধানে। এ যেন এক গতিময় নদী, যার দুদিকে বালুর আদিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর আর যার বুকের ওপর সর্বক্ষণ নির্বাত প্রভঞ্জনের উপস্থিতি। গৃহবিচ্ছিন্ন কবি তাঁর চেতনায় পৃথিবীর আশ্রয় খুঁজে পেলেন বিশ্বজনীনতায়, সমগ্র ইউরোপের পটভূমিতে। এবং এই জন্যেই তাঁর মধ্যে এবং তাঁর মধ্যেই সম্ভব হয়েছিল, জার্মান প্রতীকী কবিতার পরিণতি প্রাপ্তি।

জীবন থেকে তিনি আশ্রয় চেয়েছেন নিজের আত্মায়, আর এরই ফলে চরম পরিণতি হয়েছে নন্দনতত্ত্বের বেদীতে। তাঁর সমগ্র বাঁচা ছিল শিল্পের

জন্যে। সমস্ত সত্তাকে গড়ে তুলেছিলেন কবিতার উপযোগী কোরে, নিজের অস্তিত্বে তিনি ঈশ্বর, পলে পলে যার উত্তরণ। মালার্মের সাধনাও ম্লান তাঁর বৈদিক নিষ্ঠার কাছে। বছরের পর বছর কাটিয়েছেন বিষণ্ণ নিঃসঙ্গতায়, ঋষি পুরুষের গভীর উপলব্ধিতে, যদি অমরতা স্পষ্ট হয়, এই আশায়,—প্রায়ই যার পরিণতি হয়েছে অধিকতর নির্জন বিমর্ষতায়। তাঁর সমস্ত সত্তায় শিল্পের সঙ্গে জীবনের ক্ষুধার যুদ্ধ। জীবনের ক্ষুধা থেকে শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন নীরব সমুদ্রের ধৈর্য বলে। জীবন ও শিল্পের এই দ্বন্দ্বোত্তরণের আশায় মরিয়া হয়ে তিনি আশ্রয় প্রত্যাশী মৃত আত্মাতে আত্মাতে।

The dead are occupied,
But help me, as you may without destruction,
As the most distant sometimes helps : in me.

নন্দনতত্ত্ব থেকে শেষ জীবনে আশ্রয় খুঁজেছেন বিশেষ মিষ্টিক চেতনায়, যেখানে নিজকে প্রকাশের চূড়ান্ত প্রয়াস। রদাঁ হলেন প্রথম উত্তরণের পথ প্রদর্শক, আর দ্বিতীয় উত্তরণে পল ভালেরি। তাঁর বিস্তৃত সিম্ফনীর মতো কাব্যজীবনে অনেক প্রভাবের ঐশ্বর্যময় সমাবেশ। প্রতিটি ঘটনা উপলব্ধির মধ্যে তিনি সাধ কামনা কোরেছিলেন। ঐ সব ঘটনাকে আপন অস্তিত্বে লীন কোরে নিয়ে কাব্যের দরোজায় পৌছে দেওয়া ঈপ্সিত ছিল তাঁর। রাশিয়া, সেজান, রঁদা, জ্যাকোবসন, মেটারলিঙ্ক : —সব বিচিত্র বিভিন্ন কত রকম প্রভাব। এদের মধ্যে রাশিয়া আর রঁদা তাঁকে কবি কোরে তুললো, শিক্ষা দিল আত্মস্থ হবার, আর ক্লান্তিকে জয় কোরবার মহামন্ত্র। এঁরা জুগিয়েছে শৈশবের উদ্বেল স্রোত আত্মস্থ কোরবার প্রেরণা ও শক্তি।

'Russia, the land where the people are lonely, each with a word in himself. .people full of existence, uncertainty and hope : growing once. And overall an infixed, eternally changing growing God.'

রেনেসাঁ থেকে কবি পেলেন সৌন্দর্য উপলব্ধির শিক্ষা আর আত্মসচেতন হবার শক্তি। আর রাশিয়া ভ্রমণে তিনি দীক্ষা পেলেন মানুষের গভীর আঁধার চেতনার রূপপরিগ্রহ কোরবার অনুভব। পরবর্তী কালে রদাঁর ভেতরে খুঁজে পেলেন নিজের প্রতিরূপ। রদাঁকে ঘিরে ছিল এক বিশাল শূন্যগর্ভ অস্তিত্ব, সেই নিখিল মৌন নাস্তির ভেতর রূপ পেয়েছে তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। রদাঁর স্পর্শেই তিনি বোলতে পারলেন :

'Know, then art is this : the means whereby the lonely, the solitary, fullfill themselves. What Nepolean was outwardly is what every artist inwardly..know, then that the artist creates for himself, for himself alone.'

মাইকেল এঞ্জেলোর মানসিকতার উত্তরসূরী হয়েও রিলকে হলেন কবি। একজন কবি, যিনি মনে প্রাণে ছিলেন খাঁটি ভাস্কর।

> **That is my strife :**
> **to longing dedicate**
> **to roam through all the days.**
> **Then strong and broad,**
> **to reach deep into life**
> **with a thousand branching roots—**
> **through sorrow,**
> **ripening far out of life**
> **far out of time.**

রিলকের সৃষ্টিশীল জীবন বলা যায় একটা কারখানা। নিরন্তর নতুন সৃষ্টির আবির্ভাব; নব নব চেতনার বিকাশ ও তিরোধান, এ এক প্রদর্শনী কক্ষ, যার সব দ্বার উন্মুক্ত। তাঁর চেতনা ও আত্মঅভিজ্ঞান প্রসারিত হয়েছে ধীরে ধীরে, তাই ফারের অস্তিত্বে সমাহিত হয়েছে কাব্যকলা। অনেকটা দৈহিক নিয়মের ক্রমপরিণতির মত, ভ্রূণ থেকে অস্তিত্বে বছরেব পর বছর উত্তরণ, যা অনুভব করা যায় পরিণতির পর। তবে শৈশবে আধো আধো বুলির ভেতর সুপ্ত ছিল ভবিষ্যতের সুপরিণত ফলের আভাস।

জার্মান সাহিত্যের দরিদ্রতম ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী রিলকে। প্রথম যুগের কাব্যাদর্শে, জার্মান ক্ষয়িষ্ণু রোমান্টিকতার প্রেমাশ্রয়ী হয়েও তাঁর কাব্য আবেগ ও মাধুর্য-স্নিগ্ধ। নির্বাপিত ইচ্ছার আবেগ, অপরিণত প্রস্তুতির বিড়ম্বনা, সুন্দরী মেয়ের বা রাশিয়ান পাদরীর ঐশ্বরিক অনুভব তাঁর কবিতাকে দীপ্ত করেছে। সেকালের মানসিকতায় তিনি বুদ্ধির দাসত্ব করেন নি। জার্মান আত্মার হৃদয়ের অনুভব তাঁর অনুগামী সারাক্ষণ।

> **'Life is not for understanding**
> **then will it be just like a feast ?'**

এই হলো তরুণ রিলকের বিবস্ত্র আকুতি। তবে নিছক যৌবনের নিরুদ্দিষ্ট আবেগে কবিতা হিসাবে তাঁর রচনা প্রথম পর্বে উৎরিয়ে উঠতে পারে

নি। হুগো, ফন, হোফমানস্তালের ঠিক একই বয়সের কাব্য ভঙ্গুর ক্ষয়িষ্ণু চেতনার প্রতীক হিসাবে উৎকৃষ্টতর। রিলকের এই যুগের লেখা জীবন থেকে দূরতম উজ্জ্বলতার প্রতীক, উপলব্ধির সততার অভাব লক্ষণীয়।

'Book of ours' বেরোবার পর কবি বুঝলেন ফুরিয়ে গেছেন তিনি, উত্তরণের আশা কোরলেন নতুন কাব্যাদর্শ অনুসরণে। সূচিত হলো নতুন যুগের উন্মেষ। এই স্তরে পেঁৗছে তিনি বুঝতে পারলেন যে রোমান্তিকদের চর্বিত চর্বণই সার হবে যদি তিনি আরও লিখতে যান ব্যক্তিগত নৈরাশ্য বা আনন্দ বেদনাকে ঘিরে। প্রতিবাদ কোরে উঠলো সচেতন কবিমানস আর ঠিক এই সময় রদাঁর সঙ্গে শুরু হলো বন্ধুত্ব, প্যারীর সঙ্গে হৃদ্যতা। সার্থক রদাঁর স্থষ্টির মধ্যে ঘুরে ঘুরে বুঝতে পারলেন কবিতাকে হতে হবে স্বয়ম্ভূ, স্বীয় আত্মায় সমাহিত। এর পর থেকে সেই দৈনিক নিয়মের মত স্বাভাবিকভাবে আর ধীরে ধীরে তাঁব কবিতা চিত্রধর্মী ও স্বমহিমায় আত্মস্থ হবার ক্রমপরিণতি পায়। উৎকৃষ্ট কাব্য অসম্ভব, তিনি বুঝলেন, উক্তির সঙ্গে উপলব্ধির সততা প্রতিষ্ঠিত না হলে। তাই তাঁর নব কাব্যাদর্শ হলো তাঁর এই উক্তিব ভেতর পরিস্ফুটিত: 'Verses are not, as people imagine, simply feelings..their experiences.'

ক্রমেই এগিয়ে এলেন নন্দনতত্ত্বের আশ্রয়ে। ধৈর্য সহকারে বসে থাকা অভিজ্ঞতাকে নিজের চেতনায আত্মস্থ করে, সেই চূড়ান্ত মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করা যখোন চুঁয়ে পড়বে সমস্ত নির্যাস—একজন নিষ্ঠাবান নন্দনতাত্ত্বিকের ঐকান্তিকতায়। তাঁর সাধনা কেবল অভিজ্ঞতা ও চেতনার নিছক বর্ণনায় কবিতা নির্ণয় নয়, নিজের আত্মায় তাদের সমাহিত রূপকে প্রতিষ্ঠা করায়। কবিতাগুলো যেন হয়ে ওঠে রদাঁব সারি সারি স্থষ্টির দল। অভিজ্ঞতার আত্মিক একঝাঁক পরিণতি যাব পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে একটি আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব।

পার্নেশিয়ান কাব্যাদর্শে তাঁর কণ্ঠস্বরকে মাঝে মাঝে অনুভব করলেও তার সঙ্গে রিলকের অসামঞ্জস্যও অনেক। পার্নেশিয়ান কবিবর্গ এমন কাব্য স্থষ্টির প্রয়াস পান যেখানে কবির ব্যক্তিত্ব একদম অনুপস্থিত, যার আবেদন শুধুমাত্র এক অন্তর্দৃষ্টিতে; আর কবিতা কিছুতেই হবে না মন্তব্যে বা বক্তব্যে মাখামাখি। রিলকে ব্যক্তিমানসিকতা স্বীকার কোরেও নিছক ব্যক্তির উর্ধ্বে কিছুটা অনির্বাণ দীপ্তির বিকাশ। প্রকৃতপক্ষে রিলকের অন্বিষ্ট ছিল মালার্মের কাব্যাদর্শের সঙ্গে রোমান্তিকতার মিলন ঘটানো।

ব্যক্তি ও আবেগাশ্রয়ী কাব্যবিশ্বাসের সঙ্গে নৈর্ব্যক্তিক স্বয়ম্ভূ কাব্যাদর্শের বিবাহ। রোমান্তিকদের উগ্র ব্যক্তিচেতনা নিঃসন্দেহে কবিতার জন্যে মারাত্মক; তবে পার্নেশিয়ান কাব্যবিশ্বাসের মূলেও কিছুটা শূন্যগর্ভ ফাঁপা চেতনা ছিল। রিলকে নিজের অভিজ্ঞতায় আবেগের গূঢ়তা ও চিত্রকলার সৌন্দর্য গভীরভাবে উপলব্ধি কোরেছিলেন—তাই এ দুটো চেতনার দুটো কাব্যবিশ্বাসের বিবাহ সাধনেও আশ্চর্যভাবে উৎরে গেলেন; সহায়ক ছিল অনুভূতির প্রাবল্য ও চরম নিঃসঙ্গতা। এক একটি অনুভব তাঁর চেতনাকে ঘিরে রেখেছে বছরের পর বছর। অনুভূতি কেবল অনুভূতি, যাদেরকে চেতনায় সংক্রমণের প্রবল বাসনায় প্যারীর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছেন, মিউ-জিঅ্যামে, আর্টের ঐকান্তিকতায় প্রকৃতির আশ্রয়ে। বছরের পর বছর কি কঠিন নির্জনতায় কাটালেন সমস্ত আত্মাকে সমাহিত কোরবার উদ্দেশ্যে; —কী অসীম নিষ্ঠা, কী ধৈর্য!—সন্ন্যাসীর হৃদয়ে নীরব গভীর সত্যের প্রার্থনা!

রিলকে নন্দনতত্ত্বের আশ্রয়ে বেড়ে ওঠা সন্তান যার একমাত্র চিন্তা শিল্পের অনির্বাণ দীপ্তি লাভ। তাঁকে ঘিরেছিল ঋষির ঐশ্বরিক চেতনা, আত্মিক ঐকান্তিকতা, জ্ঞানের সৌষ্ঠব। কবিতাকে অবলম্বন কোরে কবিতা রচনা দুরুহতম কাজ; চিত্রকলাকে অবলম্বন কোরে কবিতা লেখার প্রয়াসও অমনি দুরূহ। আর রিলকে এই কাজেই সফলতা লাভ কোরলেন, এমন প্রবলভাবে, গভীরভাবে যা কোনো যুগে কোনো কবির পক্ষে সম্ভব ছিল না। অন্য স্রষ্টাকে আশ্রয় কোরে নিজও জন্ম দিলেন অনির্বাণ ঔজ্জ্বল্য।

নিউ পোয়েমস-এর অনেকগুলো কবিতা চিত্রকলাকে আশ্রয় কোরে বর্ধিত। শিল্পকে রিলকে প্রথমে দেখেছেন একজন নিষ্ঠাবান নন্দনতাত্ত্বিকের দৃষ্টি দিয়ে, তারপর ধীরে ধীরে উপলব্ধির সাহায্য নিয়ে স্বীয় মানসিকতায় আবিষ্কার কোরেছেন সেই চেতনাকে যা শিল্প বস্তুটির আত্মা। রিলকের ব্যক্তিচেতনা এই কবিতাগুলোকে মাহাত্ম্য দিয়েছে যদিও তারা নিজেদের আত্মায় সমাহিত। রিলকের অনুভূতি চোখের রেটিনার তীক্ষ্ণতার চেয়েও অনেক গভীর। অনেক দৃশ্য তাঁর অনুভূতির গভীরে করুণতম অস্তিত্বের প্রতীক। খাঁচাবদ্ধ চিতার নিঃসঙ্গ একক পৌরুষ অথবা নিঃশেষিত সুন্দরীর চেতনায় তিনি উপলব্ধি কোরেছেন বিশ্বময় করুণ কুয়াশা। টমাস হার্ডির সঙ্গে তাঁর চেতনা অন্তরঙ্গ এখানেই। অন্ধ পাখি, মৃত ব্যক্তি এদের আকীর্ণ অনুভবে তিনি একই ধরনের আবেগকে স্পর্শ করেন যদিও একজন দার্শনিক হার্ডির

কাব্য উচ্চকণ্ঠ হয়ে আছে হিংসা ও অরাজকতার বিরুদ্ধে, পৃথিবীর প্রতি উম্মায়। কোনো দার্শনিক অনুভব রিলকের ভেতরে নেই। কেবল অনুভূতি, অনুভবের প্রকাশই তাঁর উৎকৃষ্ট কবিতা।

এমন সময় আসে যখোন সূক্ষ্মতম চেতনা আর কোনো অনুভূতির আবেদনে জেগে ওঠে না, তেমনি নিঃসাড় হয়ে এলো রিলকের চেতনা, ফুরিয়ে গেল উপলব্ধির তাণ্ডব। 'Spain was the last impression. Hitherto my life had been beaten out from within so strongly and constantly that it could be impressed no more.'

অবশেষে সমুদ্রের কান্নায় খুঁজে পেলেন নতুন আদর্শ। আর এই অপেক্ষার পরিণতি: 'ডুইনো এলেজি'। তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত চিন্তার অনুভূতির প্রতিফলিত রূপ এই কাব্য, এবং তাঁর জীবন সাধনার শীর্ষ বিন্দু। দীর্ঘ বারো বছরের বিষাদ ক্লান্তি আর পরিশ্রমের ফসল এই গাথাগুচ্ছ। যার ভেতরে নিবিড় হয়ে উঠেছে তাঁর সমগ্র আত্মা। ঝড়ের উৎস সমুদ্রের দিকে ধ্যানের চৈতন্যে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে হয়েছিল একটি বৈদেহী স্বর যেনো মন্ত্রের মত বলে গেল,

Who, if I cried, would hear me among the angelic order ?

First Elegy

সমস্ত কাব্যটি তাঁর ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ঐশ্বরিক চেতনার মতো অনুপ্রাণিত অনুভবের আত্মবিকাশে। প্রথমবারের মতো রিলকের মনে হলো কাব্যটি তাঁর নিজস্ব নয়, অন্য কারো—অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি দূরত্বান—হয়তো বা এক মিষ্টিক চেতনায় আচ্ছন্ন। 'All in a few days, there was a nameless storm, a hurricane in the mind (like that time in Duino) everything in the way of fibre and web in me split—eating not to be thought of, God knows who fed me.' মায়ের মতো বন্ধু প্রিন্সেস ট্যাক্সিসের ডুইনো রিলকের অনেক করুণ আর মধুরতম মুহূর্ত দিয়ে স্পন্দিত। অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের বাতাসে বিষাদের সঙ্গীত, নিঃসঙ্গ প্রসপেরোর অস্তিত্ব। প্রথম গাঁথা শেষ করবার বারো বছর পর অন্য গাঁথাগুলো আত্মপ্রকাশ করলো মুজতের নির্জনতম গৃহে। এখানে আমরা আনন্দিত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে আর একটি প্রথম অনুভবের গভীর ফসল ফলে ডুইনোর কাছেই, দান্তের 'ভিটা ন্যুভা'। এলিজিগুলোর মূল উপজীব্য কি?—সমালোচকদের সম্পূর্ণ বিপরীত মতামতগুলো এ সম্পর্কে একটা ধোঁয়াটে বিশ্বাস সৃষ্টির

কারণ হলেও নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে এই কবিতাগুলো সচেতন প্রধানত দুটো উপলব্ধিতে; রিলকের ব্যক্তিগত জীবনে কবি হবার বাসনায় প্রবল গভীর সাধনা ও পৃথিবীর মানুষের অস্তিত্ব, যার জন্মলাভ কবির ব্যক্তিগত জীবন দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে। ব্যক্তিগত পত্রাবলীতে কবি এই কবিতাগুলো নিয়ে বার বার আলোচনা করেছেন; ভয় ছিল ভবিষ্যতে তাঁকে নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে। সেখানে এমন অনেক স্থান আছে যা একান্তভাবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও চেতনাকে নির্ভর করেছে। রিলকের অনুভবে গভীরভাবে স্পন্দিত শান্তা মারিয়া, ফরমোজা, চার্চে উৎকীর্ণ শিলালিপি, গ্যাসপারে স্তাম্পার করুণ প্রেমকাহিনী প্রভৃতির ব্যাখ্যা কেবল তাঁর কাছেই স্পষ্ট যিনি কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।

এই কাব্যে তিনি এমন প্রশ্ন তুলেছেন যা তাঁকে পীড়িত করেছে সমগ্র জীবন ধরে। প্রেম, মৃত্যু, বিষাদ, আস্থাহীন চেতনার আর্তি—এসব জিজ্ঞাসার বৈদগ্ধ্যে পীড়িত হয়ে সমস্ত জীবন কাটালেন নির্জনতার দর্শনে, তাই জীবনের সমাপ্তিতে মিলিয়ে যেতে পারলেন সপ্তর্ষির অন্তরঙ্গতায়। এ এমন এক আর্তি যার শেষে তারাদের আশ্বাস। শিশুর অসহায়তা, জন্তুর আশ্রয়, পুতুলের সারি, মৃত আত্মা--প্রতীকগুলো বারবার দেখা যাচ্ছে অথচ পীড়াদায়ক ক্লান্তিজনক একঘেয়ে নয়। কবির সমস্ত চেতনাই 'ডুইনো।' তার জীবনে নতুন দিগন্তপটের মহোৎসব, দুঃখ বিষাদ আর ইমপোটেণ্ট পরিশ্রমের মাস্তুল। কফিনের সঙ্গীত। প্রায় একই সঙ্গে রচিত 'সনেটস টু অরফিয়ুস', একই চেতনার ক্রমবিকাশের আর একটি অধ্যায়। এলেজিতে যা অনুক্ত ছিল 'সনেটস টু অরফিয়ুস'-এ তা বলা হল। 'The Elegies and the Sonnets constantly support each other and I count it an infinite grace that I was able to feel both sails with sound breath; the small rust coloured-sail of the Sonnets and the huge white canvas of the Elegies.'

রিলকের সনেটগুলো অসীমের সঙ্গীত। এলেজিতে ধ্যান কোরেছেন বিষাদ দুঃখ ও মৃত্যুকে, আর সনেটগুচ্ছে আনন্দকে; সনেটগুচ্ছ সঙ্গীতের সঙ্গীত; সঙ্গীতের আত্মার সঙ্গীত যার উৎস জীবন ও মৃত্যুর বিস্তীর্ণে।

'এলেজীস' ও 'সনেটস টু অরফিয়ুস'-এর পর রিলকে স্তিমিত। লিখেছেন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। কিন্তু নবতর বিকাশ কিংবা উচ্চতর উচ্চারণ ছাড়াই। সৃষ্টির উদ্ভাস নেই; পুরানো বিষয়ের অঙ্গে নবতর শিল্প, বাক্য শুধু।

But another obscure Adam sleeping
dreams neutre seedless stone moon far away
where the child of life will be kindling.

Adam : F. G. Lorka

রিলকে প্রতীকী কবি। দুর্বোধ্যতা প্রতীকী কবিদের সৌষ্ঠব। প্রতীক বোঝার জন্যে নয়, অনুভব করবার জন্যে; প্রতীকের আবেদন ফুরিয়ে যায় অর্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই। অথবা বলা যায়, প্রতীকের সম্পূর্ণ অর্থ আবিষ্কার করা সম্ভব নয়, যেহেতু প্রতীক কবির চেতনাকে মুক্তি দেয়। প্রতীক স্বষ্টির মানে আবিষ্কার কোরবার প্রয়াস; তাই এটা শুধু দুরূহই নয়, অব্যয়। 'A simple, however, precise, its translation, an artist can restore for it only its movement : there is no word for word rending,....a symbol always transends the one who makes use of it and makes him say in reality more than he is aware of expressing.' [Hope and the Absurd in the work of Franz kafka : আলবেয়ার কাম্যু] নিঃসঙ্গ চেতনা উদভ্রান্তকালে ব্যক্তিমানসের অবিচ্ছেদ্য অন্ধকার। রিলকের আবেদন নিঃসঙ্গ আত্মায়, সুতরাং এই প্রবৃত্তিহীনতায় তা এত নিগূঢ়। যে যুগের ক্লাসিক ফ্রানৎস কাফকা, সে যুগেব দ্রষ্টা কবি রিলকে। ঈশ্বর কবি।

এই নিঃসঙ্গ ঈশ্বর আধুনিক কবিদের মধ্যে সচেতনতম। তাঁর প্রতি পদক্ষেপ যুগানুসারে কিন্তু যুগের ঢেউয়ে নয়, যুগকে ডিঙিয়ে। রোমান্তিকতা থেকে প্রথম উত্তরণ নন্দনতত্ত্বে, এরপর মিষ্টিক চেতনায়—নিজকে প্রকাশের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। আর এদিক দিয়ে ছাড়িয়ে গেলেন মালার্মে গোষ্ঠীকেও যাঁদের নিছক নন্দনতাত্ত্বিক ও নৈর্ব্যক্তিক চেতনাকে রিলকে অতিক্রম করলেন। বিষাদ রোমান্তিকতায় সীমিত হোফমানস্তাল আর এগোতে না পেরে সমাপ্ত হলেন। ইয়েটস আর রিলকে অগ্রসর হয়েছেন ধীরে ধীরে,চরম উৎকর্ষে, আধুনিককালের কবিতারাজ্যের তাঁরা নৃপতি।

এলিয়ট, যাঁর আবেদন স্পন্দিত রিলকের চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যক পাঠকে, হয়ে দাঁড়ালেন সেই চেতনা যেখানে একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি আত্মস্থ হন সমস্ত দিন নিষ্ঠাবান অধ্যয়নের পর সন্ধ্যার অন্ধকারে তাকিয়ে। আর রিলকে গভীর আকুল চেতনায় ঈশ্বরের উপলব্ধি। বাতাসের স্বর, তার করুণ আকুতি। 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'র পরিবেশে রিলকের 'এলেজি'র সুর সংক্রামিত,

পরিবেশের কাছাকাছি গেলেও রিলকে অনেক গভীর আবেদনময়। আর এই তন্ময়তা এসেছে জৈবিক নিয়মের মতো ধীরে ধীরে, দীর্ঘ সাধনার ফসলের মতো।

বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ কবির স্থান পেতেন হোফমানস্তাল যদি তাঁর মৃত্যু হতো বিশ বছর বয়সে। স্তেফন গেয়র্গ যদি 'হিমস'-এর পর লেখা বন্ধ করে দিতেন, তা হলে পরবর্তীকালে তাঁর প্রভাব এড়ানো দুঃসাধ্য হত। আর রিলকে অল্পবয়সে মারা গেলে পরিচয় সীমিত হত কেবলমাত্র প্রাগের বন্ধুদের মধ্যেই। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী হলেন কেবল অবিচ্ছিন্ন নির্জন সাধনার ফলেই কোনোরকম কাব্য আন্দোলন বা গোষ্ঠীর সংগে জড়িত ছিলেন না তিনি, বিশেষ কোনো মতবাদে উৎভ্রান্ত হননি। সমালোচনার প্রতি কঠিন উপেক্ষা স্বাভাবিক ছিল তার কাছে। তিনি কবি, তাই নিজের, আত্মায় বেড়ে উঠেছেন নিঃসঙ্গ বৃক্ষের অথবা পাখির গানের মত।

জনৈক তন্বী মহিলাকে উপহার দেবার জন্যে গোলাপ তুলতে গিয়ে কাঁটার আঘাতে মৃত্যু হলো এই কবির। জীবনে অন্তিমে এক সঙ্গে লাভ করলেন সমগ্র সাধনার নির্যাস,—অন্তিম মুহূর্তগুলি ঘিরে রইলো প্রেম, গোলাপ আর মৃত্যু। আর মৃত্যুর পর আমাদেব সশ্রদ্ধ অন্তরঙ্গ আবেগ।

চন্দ্রের স্নিগ্ধ করোটিতে রিলকে হলেন মৃত্যুর সন্তান। শূন্য দিগন্ত থেকে, মৃত্যুর সারি সারি মস্তিষ্কের ওপর দিয়ে বাতাসের গতি, নতুন কোনো দিগন্তের বা অস্তিত্বের আশায়; সঞ্জীবিত সে শিশুর ম্লান স্যালিভায়, ঘামের করুণ গন্ধে, সাদা গোলাপের রুগ্নতায়, চারদিকে নতুন উদ্ভাবনায়, চার্চের পবিত্রতায়! রিলকে হলেন স্বর, সেই প্রবাহিত বাতাসের স্বর।

আলতাফ হোসেন

রবীন্দ্রনাথের গানের কথারা ও অতিলৌকিক অনুভব

[বিচূর্ণিত]

অলৌকিক তো বটেই, অতিলৌকিক অনুভবদেব যথার্থ বাহন নেই একথা মেনেও কবিরা লেখকরা শব্দের রথ চালান পরমনিশ্চিন্তে, যেন তৈরী আছে পথ আর তার স্বচ্ছ সোপানপরম্পরা এইরূপ অনুভবে। অথবা, কেউ কেউ, স্বচ্ছতা স্পষ্ট হলো এই ভাবনায়। ফলে, যা-ই হোক, তৃপ্তির তথা অর্জনের বোধ মেলে অনেকটা, লেখকের যেমন, পাঠকেরও তেমনি। লিখন ও পঠনে সত্যই কিছু পাওয়া যায়, কিছুর আবিষ্কার হয়, অন্তত অনেক জটিলতার সূত্র ছড়িয়ে পড়ে, অনেকেব মতন আমিও অনুভব ক'রে থাকি।

বিচ্ছিন্ন ও নীরস ভাষায় উক্ত উপলব্ধি পরিষ্কাররূপে অনেকের; তবুও উক্তি, অতিলৌকিক অনুভবদের বাহন নেই একথা অনুভব ক'রে রবীন্দ্রনাথকে ছুঁতে, তাঁর গানের কথাদের —চেষ্টা করা যেতে পারে।

ছড়িয়ে পড়তে চাই বিভিন্নতায়, কতোক্ষণ ভেসে থাকতে চাই মাছরাঙা পাখির মতো হাওয়ায় ও মাছের মতো, ছোট্ট রঙিন মাছের মতো জলের উপরিভাগে। আমার কাছেই, জানি, অর্থহীন অনুরূপ অনুভববিস্তার-প্রচেষ্টা কারো, আমি রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত প্রায়-লেখায়, কি বলবো, অবজ্ঞার প্রাচ্ছন্ন ভাবই পোষণ করি, প্রায়-লেখা পড়ি না বা দ্রুত অন্যমনস্ক পড়ে যাই, আমি কি ক'রে লিখি বা আশা করি আমার লেখা অন্যে পড়বে, পড়ে কিছুমাত্র উৎসুক হবে!

স্বচ্ছতা স্পষ্ট হবে এই ভাবনায় কি, ভাবের মিলনের আশায়, সূত্রে সূত্রে আবিষ্কার করবো প্রধানত এই মহালোভে খুব সম্ভব।

'মানুষের মন চায় মানুষেরি মন।'

২

অতিলৌকিক অনুভবদের বাহন নেই। কিন্তু নেই কি?

> ঝড়ের রাতে ছিনু প্রহর গণি।
> হায়, শুনি নাই তব রথের ধ্বনি।
> গুরু গুরু গরজনে কাঁপি বক্ষ ধরিয়াছিনু চাপি,
> আকাশে বিদ্যুৎবহ্নি অভিশাপ গেল লেখি।

কোথায় চলে যাই বলতে পারবো না। কিন্তু চলে যাই কোথাও। ঝড় ভাসে রাত ভাসে রথ ভাসে। আর ধ্বনি। বুক কাঁপে। কাঁপে না? বলতে কি পারবো, বুকে কি হাত দিয়ে দেখতে পারি, হৃদয় কাঁপে যে! সমস্ত আকাশ ছিঁড়ে ফেঁড়ে রাঙিয়ে দেয় বিদ্যুৎবহ্নি।

না, বাহন নয়, আপাতভাবনায়ও যথার্থেও সূত্র, কিন্তু বাহনের চেয়েও বেশি! কী বিস্ময়করভাবে আমরা কবির সঙ্গে উড়ে চলতে পারি, এক কণা জাদু আমাদের ছোঁ মেরে তুলে নেয় আকাশে। বিন্দু বিন্দু জাদু আমাদের বিরাট হয়ে বিশাল হ'য়ে নিয়ে যেতে থাকে আকাশেতর কোথাও, দিগন্তোত্তীর্ণ কোনো স্বর্গের অপূর্ব রম্যতায় কি?

বাহনের চেয়ে বেশিকে ধরার ঝোঁক আসলে কবিদের লেখকদের।

> ওগো অকরুণ, কী মায়া জান,
> মিলন ছলে বিরহ আন।

'অকরুণ' ঝঙ্কার তোলে না একা কিন্তু ওগো অকরুণ? মায়াটি কি কাঁপায়? কী মায়া! কেবল উচ্চারণে এর মাধুর্যের, বেদনার প্রকাশ সম্ভবপর, গভীরতর সুরে।

> চলেছ পথিক আলোকযানে আঁধার পানে

সঙ্গে সঙ্গে মিছিল চলে শত হৃদয়ের। আলোকযানে চলে আঁধার-পানে। কী আলোকযান? কী আঁধার? আঁধারপানে কিরূপ অন্ধকার? এ-সবই, আমি বলবো, অতিলৌকিক অনুভবে মেলে। বাহন নেই চলার। সংজ্ঞাহীন মহালোকের, বিশ্ব-জগতের এইখানেই প্রবেশদ্বার, পথের শুরু।

অনুভবে আমরা ফিরি ঘুরি। নিঃসঙ্গ, অসহায়, কখনো শক্তিমান। জীর্ণ, ভঙ্গুর, দীন ভাষাও কখনো কী আশ্চর্য জীবনসঞ্চারী। আগুন থেকে আমাদের ফেরায়, পিচ্ছিল পর্বতারোহণের অসম্ভব ও হীন চেষ্টা থেকে। একটি কথা, একটি সুর মানুষের সমস্ত শক্তিকে পরাভূত

করতে সক্ষম, সমস্ত দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলতে শক্তিধর এ-কথা কি সহৃদয় ও প্রাণবান মানুষেরা টের পাননি? কেউ বলবে না অন্বেষণ ব্যর্থ ও অর্থহীন যারাই তাদের অন্বিষ্টকে আশ্চর্যভাবে আবিষ্কার করেছে কখনো বইয়ের পাতায়, কয়েকটি সারিতে, কখনো, বিস্ময়করভাবে, একটি সারিতেই। মানুষের বৈচিত্র্য অনুভব করার ক্ষমতা সবসময় যে সমান থাকে না এই সহজ কথাটাও মানুষকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে খুব অসার্থক বোধ হয় না তা, এমনকি, অনেক সময়, এই কথা শুনেই মানুষ উঠে ব'সে গায়ের ধুলো ঝেড়ে দাঁড়াতে পারে বলে আমাদের ধারণা।

আমাদের আশ্চর্যতার অন্ত নেই, আমাদের অন্বেষণ সর্বকালের ও অফুরন্ত, এই কথার নির্বোধে ও মানবতায় শান্তি এ যথার্থ-বোধ বিঘ্নিত হতে বাধ্য, কেবল মরবিডিটি নয় চূড়ান্ত কুমিরের অন্ধকার মুখগহ্বর আমাদের অন্যবিধ পরিণতি।

পড়ি ও শুনি,

বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা

এবং

নব আনন্দে জাগো আজি নবরবিকিরণে

এবং

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে

এরপর এমন একটি রথে আরোহণ করি, এমন এক দূরত্বে বিহার করি যে অক্ষমদের লোলচর্মের খাঁজে খাঁজে জমে থাকা প্রতি ধুলিকণা নজরে পড়ে, অপরের অসহায়ত্ব হাস্যকর বোধ হয় অথবা মানুষদের বোধ হয় নক্ষত্র বহু, এক কালো আকাশে সেঁটে থাকা, অবয়বহীন। কী জানি কি বোধ হয়। অথবা বোধ হয় না কিছু। উড়ে যাই শূন্য গগন-বিহারী। জীবনমরণবিহারী।

বুঝি না, বেহাগ ও খাম্বাজের সংমিশ্রণ, দুর্বোধ্য যে, 'উত্তর ভারতের 'বসন্ত' ও 'পরজে'র সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় সুরের মৈত্রীর মধ্যে আবার সঞ্চারীতে কোমল ঋষভ ও কোমল গান্ধারের এবং কড়ি ও শুদ্ধ মাধ্যমের আশ্চর্য ব্যবহারে মুলতানের ছায়াপাতে এক বিচিত্র সুন্দর সুরের জন্ম' কিভাবে সম্ভব হয়। পরম অজ্ঞও কী ক'রে যেন টের পেয়ে যাই 'বাজে করুণ সুরে' ঐ সুরেই সম্ভব, শুধু কথার দ্যোতনা আকাশবিহারী হ'লেও,

সুরেই কখনো আরো বেশি অসীমতা প্রকাশ পায়। একি গানের ভাব-গুণের ফলেই সম্ভব হয়, না কথার উড়ন্ততায়? 'যুথী গন্ধ অশান্ত সমীরে' দূর শূন্যে 'উতলা উচ্ছ্বাসে' কোথায় কোথায় ভেসে যায় উদাস হয়ে, যাই বিচ্ছেদের নিশীথে।

এ মম পান্থচিত চঞ্চল
জানি না কী উদ্দেশ্যে।

পাঠক গীতবিতানের ৩৪৭ পৃষ্ঠা খুলুন এ গানটি পড়ে নিজেই অনুভব করুন।

৩

এমনকি, আয়োনেস্কোর জার্নাল ও নাটকেরা আপনার তরুণমনে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক প্রতীয়মান হয়েছে, কাম্যুর ভয়ানক, কলিন উইলসনের ঠুনকো কিন্তু লোভনীয় কষ্টকর বইগুলি আপনি পড়েছেন ও এমনিতর নানান বই আপনাকে সংশয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ক'রে চলেছে কিন্তু কৈশোরে বা যৌবনারম্ভে আপনার প্রেম ছিল, আপনি দান্তের মতো না হোক, রবীন্দ্রনাথের মতো ক'রে না হোক, কোনো বিয়াত্রিচে বা কাদম্বরী দেবীর প্রতি কিছুটাও প্রেম অনুভব করেছেন (প্রেমের প্রসঙ্গ ব'লেই এই দুই প্রেমিকা-শ্রেষ্ঠার নামোল্লেখ, নতুবা যথা-তথা এঁদের নামোচ্চারণ আমার কাছে পাপতুল্য), আপনার অসীম শক্তি নেই কি উদাস হওয়ার মতো, রবীন্দ্রনাথের গানের কথার কেবল একটি সারিতেই কেঁদে ফেলার মতো!

নিভৃতে বর্ষার দিনে, 'আজ কিছুতেই যায়না মনের ভার' গানটির কথাগুলি পড়েছেন কি, আষাঢ়ের সন্ধ্যায়, 'আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলৃ, গেলরে দিন বয়ে', শ্রাবণের রাতে, 'গহনরাতে শ্রাবণধারা পড়িছে ঝরে' গানের কথাগুলি! ভাবনা যত উতল হয়নি অকারণে তারপর?

এ প্রশ্ন ও প্রসঙ্গই ঠুনকো, এমন কি হাস্যকর, কিন্তু ভালোবেসে আমরা যেমন বারবার শতবার লক্ষবার ভালোবাসি উচ্চারণ করেও চুপ হই না, এ-প্রসঙ্গের সাধারণ অবতারণাও তেমনি, ভালোবাসার মতোই, অক্লান্তিকর ও স্ফূর্তিময় এবং মৃত্যুময় নয় কি?

মনে আছে,

এই ঘাসের ঝিলিমিলি
তার সাথে মোর প্রাণের কাঁপন এক তালে যায় মিলি:

কিংবা,

আজ আকাশের মনের কথা ঝরোঝরো বাজে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।

তারপর যে অনুভব তাকেই আমি, দুঃখের সঙ্গে তো বটেই কিন্তু নির্ভয়ে, অতিলৌকিক অনুভব মনে করে থাকি। অতিলৌকিক নয় তো কী? আমাদের বেশবাস ঘর-পরিবার দাবারেডিওছবি বা গান ও লোকালয় এবং অফিস ছেড়ে আমরা মুহূর্তে উধাও হয়ে যাই গভীরতর দূরে, অন্য কোনোখানে, অনুভবে নামে বাতাসবিরহী সমুদ্র ও মেঘবিহীন আকাশের শান্তভাব অথবা আকাশ ও সমুদ্রের মিলিত ঝড়, আমাদের আঁখি ছোটে উদাসীন, বক্ষে কাঁপে কম্পন!

আমাদের কৈশোর ও যৌবনারম্ভের সময়কার সেই কিশোরী প্রেয়সীরা, যারা ভালোবেসেছিল আমাদের, অথবা, এমন কি, ভাণ ক'রে গেছে, বেলাশেষে হয়তো প্রত্যাখ্যানও ক'রে হেসে চলে গেছে, তাদেরই, সেই সুচতুরা ও বুদ্ধিহীনাদেরই, আমরা রবীন্দ্রনাথের গানের কথায় স্বর্গলোকে উড্ডীয়মানা দেখি না কি! ভাবি, সত্যিই মনে কী দ্বিধা রেখে গেছে চলে তারা আর তক্ষুনি মন ছোটে শূন্যে শূন্যে অনন্তে অশান্ত বাতাসে। ভাবি, সেই বন্ধুরা চিরকালের আমাদের, তাই ডাকি, বন্ধু রহো রহো সাথে।

ভাবি,

শ্যামল তমালবনে
যে পথে সে চলে গিয়েছিল বিদায় গোধূলি-খনে
বেদনা জড়ায়ে আছে তারি ঘাসে, কাঁপে নিশ্বাসে—
সেই বারে বারে ফিরে ফিরে চাওয়া ছায়ায় রয়েছে লেগে।

শ্যামল তমাল বন খুঁজি ও পেয়ে কী উৎসুক সজল তাকাই, গোধূলিক্ষণ নজরে পড়ে, ঘাসে চোখ রাখি বেদনায়, নিশ্বাসে কাঁপি, মনে পড়ে যায় কার বারে বারে ফিরে চাওয়া. কার? অনেক সময় মনে করতে পারি না হয়তো, কিন্তু কারো। ছায়া-ছায়া, ছায়ায় রয়েছে লেগে। কায়া হয়তো ছিল না কোনোদিন কিংবা ছিল মিথ্যা কায়া, ছায়ার সন্ধানে ব্যাপৃত হই তবু।

অথবা শূন্যতার, ব্যর্থতার অনুভবও পাই, না হোক, প্রতারণার।

হায়, মম পথ চাওয়া বাতি
ব্যাকুলিছে শূন্যেরে কোন্ প্রশ্নে

দিকে দিকে কোথাও নাহি সাড়া
ফিরে খ্যাপা হাওয়া গৃহছাড়া।

এমনি অজস্র, কিন্তু তারপরই যখন

'আমার প্রিয়ার ছায়া
আকাশে আজ ভাসে, হায় হায়' চোখে ভাসে, কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় জলে? আপাত-অশরীরিণী প্রিয়াকে শাশ্বতকালের অস্তিত্ব-হীনা মনে হয় কি? মনে কি হয় না, আমার প্রিয়ার আঁচল নিবিড় বনের শ্যামল উচ্ছ্বাসে হায় কোনোদিনও দুলেছিল? হেসে গেছে সে, কেঁদে গেছে, ক্ষণিকের অতিথি হয়ে তারপর কোনোক্ষণে, কোনো এক শ্রাবণশেষে নিয়েছে বিদায়? জানা যায় না প্রেমিকাদের কোনো দিন, তাই তাদের রূপ ভাসে: শঙ্কিত চিত কম্পিত অতি, অঞ্চল উড়ে চঞ্চল। ধীরে তারা এসেছিল, লাজে ফিরে গিয়েছিল বুঝি। উদাসিনী বেশে বিদেশিনী কে সে তাকে কি জানা যায়, অচেনা পরদেশীরা চিরদিনের রহস্যঘেরা, এই রহস্যময়তাকেই গভীর ক'রে তোলা যায়, আর তাদের উদ্দেশ্যে দীর্ঘশ্বাসের কম্পন ওঠে:

আমি তোমারি বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস—
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ-মাস।

মনে-প্রাণে বলি:

আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি
তুমি অবসরমত বাসিয়ো

....

যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কী
মোর স্মৃতি মন হতে নাশিয়ো।।

দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘশ্বাস:

'আমারে পড়িবে মনে কখন সে লাগি
প্রহরে প্রহরে আমি গান গেয়ে জাগি।'
'দিনের শেষে যেতে যেতে পথের 'পরে
ছায়াখানি মিলিয়ে দিল বনান্তরে।'

৪

প্রেম-রহস্যের উপলব্ধিই তো অতিলৌকিক। অপ্রেমিকেরা চির-কালের অমানুষ, ক্ষণিকের অপ্রেমই পাপকার্য। অ-বোধে নাশকতা ও

ঘৃণা আর বোধ একান্ত ভাবে প্রেমিকের, যথার্থ জ্ঞান প্রেমিকেরই নিজস্ব। আর মহৎ সাহিত্য তাই প্রেমেরই চুল-চেরা বিশ্লেষণ ও গভীরতা। হৃদয়ের কথা সেখানে গুঞ্জরিত, সব মিলিয়ে তাই প্রেম। প্রেমেই আমরা সব পেতে পারি, ঈশ্বরকে, প্রেয়সীকে ও মাকে। প্রকৃতিকে, সমুদ্রকে, আকাশকে ও বাতাসকে।

এ-কথার তাই বারে বারে অনুভব চাই, সূর্য যেমন রোজ দেখা দেয় পূব-আকাশে গীতবিতানের যে প্রেমিক তার মতো দেখিনি আর। প্রেমিক খুঁজেছি বহু, পেয়েছি, কেঁদে ভাসিয়েছি তাব সঙ্গে, কিন্তু গীতবিতানের সুন্দরশ্রেষ্ঠ প্রেমিক আমাকে চিরকালের সঙ্গী করবে বলে ডাক দিয়েছে। কয়েকটি গানের কয়েকটি সারিতেই আমার জীবন-মরণ বাঁধা পড়ে গেছে যেন।

৫

রেকর্ডে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে গিয়েই আমি রবীন্দ্রনাথের গানের কথায় প্রথম প্রথম সম্মোহিত হয়েছি। আমার বরাবরের অভ্যেস গানের কথা মিলিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনার। শুনতে শুনতে আমি রোজই আবিষ্কার করেছি কত-কী, বর্ণনা করা যায় না যা, চক্ষু ও বুক কেঁপে কেঁপে গেছে শুধু, সমস্ত শরীর কম্পান্বিত ক'রে অনুভূত হয়েছে রোমাঞ্চ। তারপর থেকেই, আমি যতো পড়েছি রবীন্দ্রনাথের গান আমার অনুভবের ব্যত্যয় হয়নি কোনোবারেই কেবল মাঝে মাঝে এই ওঠা-নামা থেকেছে যে, কখনো সুরের চেয়েও গানের কথাগুলিকে মনে হয়েছে অনেক বেশি দ্যোতনা-দায়ী ও প্রাণসঞ্চারী আবার কখনো সুরকেই মনে হয়েছে অধিক অর্থবাহী। অধিকাংশ সময়ই অবশ্য, খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, কথা ও সুর সার্থক সমন্বিত বোধ হয়েছে।

অপ্রসঙ্গত অতিরিক্ত এই কথাগুলি বলাতে দোষ হ'লো না বোধ হয়। যা হোক রবীন্দ্রনাথের গানের কথা বিচূর্ণতায় এবং সব-মিলিয়ে সর্বমানুষের সর্বকালোপযোগী ধর্মগ্রন্থ যে, এ কথার প্রাত্যহিক উপলব্ধি আমাকে পবিত্রতর করেছে বলে আমার বিশ্বাস। ঈশ্বর ও ন্যায়ের এবং ভালোবাসার মুগ্ধতার বোধ রবীন্দ্রনাথের গানে যেরূপ অশেষ সঞ্চিত, পৃথিবীর আর কোথাও সেরূপ ছিল বা আছে আমার জানা নেই।

৬

গানগুলি এতো অসংখ্য যে, মনোহর ও অপূর্ব সারিরা এতো ছড়িয়ে যে গীতবিতান খুলে বসলে লেখা বাড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়বে অথচ

আপনি মনে পড়ে না সব সময় জীবন ও জগতের শ্রেষ্ঠ কথাগুলি এবং অপূর্ণতার কথা তো স্বতসিদ্ধ আছেই।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত পিপাসুরা সবাই শুনেছেন 'হে মহাজীবন হে মহামরণ' গানটি, শুনেছেন 'মহাবিশ্বে মহাকাশে' গানটিও। গান দু'টি নিভৃতে পড়েছেন কি কখনও? এ কোন্ মহাভাবের কথা লিপিবদ্ধ হতে পারলো ধুলিমলিন মাটির মানুষের হাতে! কেবল অনুভব, অনুভব অতুল্য অর্থ-বহতার!

রবীন্দ্রনাথের গানের কথায় কথায় আমরা পাই একাকীত্বের সবচেয়ে গাঢ় অনুভব, ভক্তির গভীরতম উপলব্ধি, ভালোবাসার নির্জনতম, অসহায়ত্বের করুণতম শক্তির শ্রেষ্ঠতম বোধ।

একটি প্রার্থনা লিপিবদ্ধ করি সম্পূর্ণ:

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।
তব ভুবনে তব ভবনে
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান॥
আরো আরো আরো আলো
এই নয়নে প্রভু, ঢালো।
সুরে সুরে বাঁশি পুরে
তুমি আরো আরো আরো দাও তান॥
আরো বেদনা আরো বেদনা
দাও মোরে আরো চেতনা
দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে
মোরে করো ত্রাণ মোরে করো ত্রাণ।
আরো প্রেমে আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক নেমে
সুধাধারে আপনারে
তুমি আরো আরো আরো করো দান॥

এ প্রার্থনার পরই বুঝি মনে অনুভব হতে পারে:

নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ—
সেই পূর্ণতার পায়ে স্থান মাগে॥

বিমল আনন্দে জাগো রে
গমন হও সুধাসাগরে।
হৃদয়-উদয়াচলে দেখো রে চাহি
প্রথম পরম জ্যোতিরাগ রে।।

অতিলৌকিক অনুভব চাই, চক্ষুষ্মানকে।

নূতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা, আজি সু-প্রভাতে।।
বিষাদ সব করো দূর নবীন আনন্দে,
প্রাচীন রজনী নাশো নূতন উষালোকে।।

শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ গীতবিতান থেকে কেবল এই প্রার্থনা ও প্রেমের উচ্চারণই **অবশিষ্ট** থাকে।

আর সবই অন্ধকার বুঝি জগতের।

মহাদেব সাহা

আনন্দের মৃত্যু নেই

শীতের নির্জন শীতল অরণ্যে ফুল ফুটতে দেখে গ্যয়টে বলেছিলেন: কবিতার মৃত্যু নেই, কবিতা অনিঃশেষ। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কবিতার যৎসামান্য অগ্রগতি পরিলক্ষণে উক্ত বচনের সাত্ত্বিক পৌনঃপুন্যে সন্ধি-স্থাপন সম্ভব, এবং বাংলা কবিতার অগ্রগতি এ অর্থে সত্য যে সে তার প্রতন স্বভাবে পুনর্লগ্ন নয়, বারংবার ঘাত অভিঘাতে নিরন্তর প্রবাহমুখী; অস্বীকৃতি অতি অসম্ভব যে কখনো কখনো সে উৎসমুখী, ঐতিহ্য সংলগ্ন, উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈতবাদই যেহেতু সর্ববাদীসম্মত মহৎ কবিতা, তাই স্থিতধী বৃত্তির প্রবর্তনায় সমুৎসারে আপতিক পরাগতি দোষবহ তো নয়ই, বরং কবিতার সমগ্র সিদ্ধিতে তা অনিবার্য মুষ্টিযোগ। অতিবিনয়ী সুধীন্দ্রনাথ নিজের কবিস্বভাবের ফলোদয়বৃত্তির অকিঞ্চিৎকরতা জ্ঞাপন প্রসংগে রবীন্দ্রনাথকে উদয়াস্ত নির্বিকার সূর্য বলে বর্ণনা করেছেন; উক্তিটির মধ্যে আত্মসচেতন ক্ষিপ্রবোধসম্পন্ন ব্যক্তির বিনয়জনিত কিঞ্চিৎ অতিশয়োক্তি থাকলেও রবীন্দ্রনাথ যে বাংলা কবিতার প্রবল ঈশ্বর ও ধূর্ত প্রতারক তা অস্বীকার প্রায়শ দুঃসাধ্য।

এবং সেহেতু বাংলা কবিতার উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি কবিতা রোগাক্রান্ত যুবকদের যযাতি পিতা, সম্ভবত এ কারণেই এ কালের এক বিরূপ বশংবদ কবি তাঁর মৃত্যুতে পিতৃবিয়োগের বেদনাবোধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অসম্ভব সাধনার পর বাংলা কাব্যের মুক্তি ও সম্প্রসারণ যে বিস্ময়াবহ মানবচেতনার কেন্দ্রে উপনীত হয়, তার উক্তি ও উপলব্ধিগত যে তাৎ-পর্যকর সন্নিপাত ঘটে, সাধ ও সাধ্যের সুচারু সমন্বয় তথা প্রসাদগুণের যে তর্কাতীত স্বোপার্জন সাধন সূচিত হয় তারপর সেই পথে অগ্রসর কেবলমাত্র দুষ্করই নয়, রীতিমতো দুঃসাহসিক।

তিরিশের কতিপয় কবিকণ্ঠ এই দুঃসাহসিকতার পরিণাম : জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে এবং অমিয় চক্রবর্তী ; কিছু বৈলক্ষণযুক্ত অন্তত উপরোক্ত পাঁচজনের তুলনায় প্রেমেন্দ্রমিত্র, অজিত দত্ত ও সমর সেন।

এঁদের বাল্যপ্রবণতাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যের অভ্যাসের সুযোগ্য ফলাফল, রাবীন্দ্রিক প্রচণ্ড বোধেই তিরিশের কবিদের হাতে খড়ি, অস্বীকৃতির আকার পরবর্তীকালে যতো স্ফীতই হোক বাল্যস্বভাবে অন্তত তাঁদের রবীন্দ্রভুবনে বহুসাধ্য পথচারণা করতে হয়েছে কমবেশি প্রতিজনেরই, এবং অতীত অস্বীকৃতি যেহেতু আত্মাবমাননারই নামান্তর, তাই মানব স্বভাবগুণে তাঁরা প্রকৃষ্টভাবে বংশজ। স্বীকার করবো তাঁদের কণ্ঠে ছিলো তারস্বর আর্তি ও দুর্বিনীত আকাঙক্ষা, কিন্তু সংবেদনার ক্ষেত্রে একবাক্যে বলতে হবে যে সকলেরই আত্মা রক্তাক্ত রবীন্দ্রপ্রভায় দীপ্ত।

তিরিশের কবিরা প্রায় সকলেই অধীত বিদ্যায় পারদর্শী, দর্শনে পারংগম, য়োরোপীয় সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন এবং সমাজ রাষ্ট্র ইতিহাস ও মনস্তত্ত্বে সমান কৌতূহলী. কেউ কেউ বিদ্যায় ও বোধিতে রীতিমতো মনস্বী; তাঁরা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর চালচিত্র অন্তরংগভাবে লক্ষ্য করেছেন এবং স্বভাবতই রবীন্দ্র শিল্পসাহিত্যতত্ত্বের কতিপয় নিহিত প্রসংগ, যথা সত্যসুন্দর কল্যাণে তাঁরা আস্থাস্থাপনে অপারগ এবং রবীন্দ্রনাথের মায়াবিনী কাব্যমন্ত্রণার কুফল সম্পর্কেও তাঁরা সচেতন, এ জন্যে রবীন্দ্ররোমান্টিক মূলসূত্রে তাঁদের অবিশ্বাস, এবং তাঁদের বিরূপতার মানসযাত্রাও এ পথেই ; প্রধানত দুটি লক্ষ্যভেদে তাঁরা স্থির : রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্তিপ্রয়াস, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর নৈরাশ্য নারকীয়তায় ক্ষয়িত মানবতাবোধের চিত্রাংকন; আবু সয়ীদ আইয়ুবের স্পষ্টতর সমীক্ষা :

"কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী, এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।"

মাত্র এ সামান্য লক্ষণ ব্যতিরেকেও সাম্প্রতিক জীবনভারকেন্দ্রে পুঞ্জিত নৈরাশ্য ও বিস্বাদ, অনিকেত মনোবৃত্তি ও স্वविরোধ, নাগরিক সমৃদ্ধির পীড়াবোধ, ফ্রয়েড ও য়ুংয়ের মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষার প্রভাব, মার্কসীয় দর্শনের সাম্যবাদী চেতনা, বিপুল জ্ঞানের দুরূহসম্ভারপ্রজাত মননধর্মিতা, প্রেম ধর্ম ও সুন্দর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত সংজ্ঞায় অবিশ্বাস ইত্যাকার লক্ষণসমূহ একালের কবিতায় স্পষ্টতর।

রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্তির প্রয়াসে তাঁরা অস্থির, সংঘবদ্ধভাবে কার্যকরী, প্রবল বিরূপতায় উচচকিত ; নিম্নে তাঁদের সোচচার ঘোষণার কতিপয় কণ্ঠস্বর উদ্ধৃতিযোগ্য ঃ

ক "রবীন্দ্রসাহিত্যে যে দেশ ও কালের প্রতিবিম্ব পড়ে, তার সঙ্গে আজকালকার পরিচয় এত অল্প যে তাকে পরীব দেশ বললেও, বিস্ময় প্রকাশ-অনুচিত।"—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ স্বগত

খ "এই কবিরা নতুন সুর এনেছেন আমাদের কাব্যে, রবীন্দ্রনাথের পরে প্রথম নতুন সুর। এঁরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, এবং স্বতন্ত্রভাবে নতুন।"
—বুদ্ধদেব বসু ঃ আধুনিক বাংলা কবিতা, ভূমিকা

গ "রবীন্দ্রব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধিনা, বরং
আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি"—বিষ্ণু দে ঃ নাম রেখেছি কোমল গান্ধার, ২৫শে বৈশাখ

ঘ "এঁদের মনোবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে এই জন্যেই বিভিন্ন যে এঁরা সাহিত্যে কল্পনাপ্রতিভার দাবি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে অকাতরভাবে মননজীবি এবং কবিতায় বিশুদ্ধ রসের কোনোরকম অবতারণার বিরোধী।"
—জীবনানন্দ দাশ ঃ কবিতার কথা

রবীন্দ্রনাথ এ পালাবদল সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, এবং পরবর্তীরা যে তালে পা ফেলে চলেছেন তার গতিবিধি পর্যলক্ষ্যের ক্ষিপ্রতা ছিলো তাঁর অসাধারণ, তাই যুগের হাওয়ায় যে তরী আগে চলেছিলো তা রবীন্দ্রনাথের ; এই অহংকৃত বক্তব্যে তিলমাত্র অতিশয়োক্তি নেই, তার স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ ১৯৩২-এর 'পরিশেষ', 'পুনশ্চ' এবং '৩৬-এর 'সাহিত্যের পথে' প্রভৃতি রচনাবলী ; রবীন্দ্রভুবনে রবীন্দ্রনাথ এক অনন্য নায়ক, রক্তাক্ত, হৃদয়বান এবং বিক্ষুব্ধ। বিশ্বব্যাপী সমর অন্তে মূল্যবোধের দ্রুত পরিবর্তন, সামাজিক সংস্থিতি, রাষ্ট্রিক নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিক সত্তা সর্বাংশে বিচলিত হয়েছিলো, রবীন্দ্রমানস তার অভিক্ষেপ থেকে বিমুক্ত ছিলো না ; এবং কোনো মহৎ শিল্পীর পক্ষেই তা প্রায় অসম্ভব, মহাভারতের দ্বৈপায়ন হতে দান্তে, রঁলা, টলস্টয়, সার্ত্র অবধি তার বিস্তৃত প্রমাণ।

রবীন্দ্রনাথের এ জাগর বিশ্ববীক্ষার মূলে ক্রিয়াশীল তাঁর প্রাণের অতলস্পর্শী আগুন, প্রচণ্ড অতিমর্তবাদ ; তাই অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় যথাযথই বলেন, "প্রথম বিশ্বসমরের পর ইয়োরোপে যে সামগ্রিক কালান্তর সূচিত

হল এবং যা পরে সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করে নিল, বাংলা সাহিত্যে সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম সচেতন হলেন।"

এবং দেশকালের ইতিহাস যে ব্যাপক ও গভীর পরিবর্তনের ধারায় বিচলিত, মানুষের আত্মজৈবনিক সংহতি ও বিরাম অস্থির, সমাজের বহু অচলায়তন ভংগুর, প্রতিটি অন্তঃসারশূন্য মানুষ প্রেক্ষিত অন্বেষায় মর্মান্তিকভাবে পীড়িত, জীবন নিষ্প্রেম এবং এই বন্ধ্যা ভূখণ্ডে মানবিক সত্তা রুগ্ন বিকৃত, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নবিলাসী ঔদাসীন্য নেই; বরং রবীন্দ্রমানসলোক নিরন্তর কালপ্রবাহের বিচিত্রবিধ ঘটনাপুঞ্জে তর্জিত, রবীন্দ্রহৃদয়ের এই অসম্ভব গ্রহণ ক্ষমতাই সম্ভবত তাঁকে এমন মানবরসের নিবিড় নিকেতনে এনে দাঁড় করিয়েছে।

তিরিশের কবিতার ত্রিবেণীতে তিনটি নিঃসংগ আত্মা: রক্তাক্ত নির্জন জীবনানন্দ, বিচ্ছিন্ন উন্মূল সুধীন্দ্রনাথ, আশাবাদী বিষণ্ন বিষ্ণু দে, অবশ্য স্বীকার্য যে বুদ্ধদেব বসু ও অমিয় চক্রবর্তী তিরিশের ধ্বনিকে গভীর কণ্ঠ দিয়েছেন, কিন্তু এ নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত প্রথমোক্ত তিনজন কবি ও তাঁদের কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথের অতিলৌকিক প্রতিভার বিদ্যুৎচ্ছটা তাঁদের কবিতার কোন্ মর্মে নিহিত তার অনুসন্ধান।

যেহেতু জীবনানন্দের বিষণ্ন ভুবনে বিচরণ করতে ভালোবাসি, যাঁর অপরিমেয় অবসাদে গাঢ় ঘুমাই, নিরঞ্জন অন্ধকারে স্বস্তিবোধ করি, পরিচ্ছন্ন ইতিহাসবোধে প্রসন্ন হই, তাঁর প্রতি মোহপ্রবণতা স্বভাবসিদ্ধ, এবং যাঁর সান্নিধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রবল প্রেম থেকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও নিষ্কৃতি পাই, অতএব তাঁকে কী অভিধায় ডাকি: নির্জনতার কবি, নিশ্চেতনার, প্রতীকী, ইতিহাস বা সমাজ চেতনার, সম্পূর্ণ অবচৈতন্যের? এর কোনো একটি নির্দিষ্ট অভিধায় যেমন তাঁকে বাঁধা দুরূহ, তেমনি তাঁর কাব্যবিচারেও এক কথায় সহজ মন্তব্য প্রকাশ সুকঠিন।

কবি নিজেই ইত্যাকার আখ্যা সম্পর্কে বলেছেন,

"আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য—কোনো কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।"

জীবনানন্দ দাশের কবি প্রতিভা অলোকসামান্য এবং অভিনব, প্রবলভাবে রক্তাক্ত শিহরিত গাঢ় রোমান্টিক ধূসরতায় তিনি লীন, এ কবির আবেগ ও উপলব্ধি একান্ত ব্যক্তিগত, কোনো এক কুয়াসা কুহকাচ্ছন্ন রাত্রির দীর্ঘ

সড়কে হেঁটে চলেছেন তিনি, বিমূঢ় বিভ্রান্ত; তিনি ক্লান্ত, দুর্বোধ্যজনক ভাবে ক্লান্ত, নিশ্চুপ নির্জন; এ নির্জনতাও তাঁর কাছে একঘেয়ে, বহু পথ অতিক্রম করে অস্তিত্ব তাঁর বিধ্বস্ত, তিনি নিঃসংগ কিংবা সংগী তাঁর শীতল শবদেহ, বারংবার বেবিলন শ্রাবস্তী ঘুরে মধ্য রাত্রির মৃত লোকালয়ে ফিরে এসেছেন:

বেবিলনে একা-একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর
কেন যেন; আজো আমি জানিনাকো হাজার-হাজার ব্যস্ত বছরের পর।
'পথহাঁটা': বনলতা সেন

তাঁর 'কবিতার অস্থির ভিতরে ইতিহাসচেতনা' এতো ব্যাপক ও গভীর যে কোনোক্রমেই তাঁর মননবিচিত্রতা ঐতিহ্য ছিন্ন হয়নি, যদিচ তাঁর অন্তরধর্ম সর্বতোভাবে স্ববৃত্তে সংলগ্ন, প্রায় সমুদয়বোধ স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে জটিল দুরূহ ও নতুন এবং যদিচ তাঁর কবিচৈতন্য নিরঙ্কুশভাবে পৃথক ও অনন্য, সম্ভবত ইএটসের সাবলীল মনন স্বভাবের সংগে সংযুক্ত বলে তা রোমান্টিক মানসের কুললক্ষণজাত, অথচ তাঁর মানসগঠনের পদপাঠ এতো বিচিত্রধর্মী যে অতি সহজে রোমান্টিক বলে শনাক্ত করা প্রায় দুষ্কর, তবু ঐতিহ্যভ্রষ্ট তো তিনি ননই, বরং ঐতিহ্যের সংগে যোগ তাঁরই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ, অবশ্য এর বিপরীত সত্যে একথাও খাটে যে তিনি যতো বেশি পাশ্চাত্যমুখী, বাংলা কবিতার অন্যান্য কবিরা তুল্যমূল্যে অধিক দেশীয়বৃত্তে বদ্ধমূল।

জীবনানন্দ সত্যিকার অর্থেই বড়ো স্বাতন্ত্র্যধর্মী কবি, প্রকৃতি এবং প্রবণতায়; তিনি দুরূহ ও জটিল, এবং ব্যক্তি হিসেবে আরো দুর্বোধ্য, এ যেনো স্মৃতিসঞ্চিত আবেগের সংগীতে মুখর এক কবি নিজের বিধ্বস্ত সত্তার বিকলাংগ শবদেহ বিমূঢ় প্রত্যয়ে ক্রমাগত গাঢ় অন্ধকারের মধ্যবর্তী নির্জন প্রদেশে বয়ে নিয়ে চলেছেন, সংশয়ী মানবাত্মার ক্ষতবিক্ষত শোণিতাক্ত চিত্র তাঁর কবিতা; সম্ভবত বহুকালের ব্যথিত ক্রন্দন, বহু জীবনের বিমূঢ় বিস্ময়, বহু প্রেমিক যুগলের ঘনিষ্ঠ আর্তি তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু; জীবনের প্রকৃত সত্যের জন্যে পীড়িত, কিন্তু কৌতূহল নেই, যেহেতু তিনি জানেন: **Man can embody truth but he cannot know it.** তাঁর অন্তর্লোকে যে নিরন্তর বেদনাবিষ উৎপন্ন হচ্ছে কবি তা নিজেই অঢেল পান করে চলেছেন, তিনি আশ্রয় খোঁজেননি, আস্থা চাননি—না ঈশ্বরে, না প্রেমে; না সমাজ, দর্শন ও অস্তিবাদে, এবং না, নাস্তিবাদেও না; কী

ভয়াবহভাবে নিঃসংগ, মর্মান্তিকভাবে নিষ্প্রেম তাঁর জীবন, উৎকট যন্ত্রণা-কাতর তাঁর আত্মা ; এবং সম্ভবত এ কারণেই জীবনানন্দের কাব্যের ট্র্যাজিক মহিমা এরূপ মর্মস্পর্শী।

নিরন্তর বিসংগতির মধ্যে ঐক্যসূত্র যোজনার তপস্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু এ দ্বন্দ্বের সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত ছিলো অন্তর্লোকের সবিরাম সক্রিয় অধ্যাত্মচৈতন্য, তাই রবীন্দ্রমানসের এ রহস্যব্যাকুলতার মর্মধ্বনি মিষ্টিক কবিচেতনা, অন্তত অধিকাংশক্ষেত্রে; এবং জীবনানন্দ সংশয় সঙ্কুল আধুনিককালের কবি, তাঁর বোধ ও জিজ্ঞাসা অন্যবিধ, তাঁর আর্তি দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের স্বরূপ ভিন্ন, চেতনায় নিশ্চেতনায় তা এতো বেশি পরিব্যাপ্ত।

জীবনানন্দের হৃদয়াবেগের প্রবল শোণিত বড়ো দুর্বোধ্য, যেহেতু তাঁর কবিতা সার্বভৌম বিস্ময়বোধের প্রতীক, কোনো বিয়োগান্ত নাটকের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নয়, বরং পালায় পালায় ব্যক্তিগত অভাববোধের শোচনীয় পরিণাম এবং দিনে দিনে কবির আপন হৃদয়েই তার জন্ম, তাই বিমূঢ়তার ঘনান্ধকারে তাঁর লোকযাত্রা ; নচেৎ ফসলপ্রত্যাশী নিতান্ত জনন-ক্ষমতাশ্রয়ীর সর্ববিধ অকাট্য নিয়ম মেনেও কেন এমন আড়ষ্ট :

> হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয় ;
> আমি তারে পারিনা এড়াতে,
> সে আমার হাত রাখে হাতে ;
> সব কাজ তুচ্ছ হয়—পণ্ড মনে হয়,
> সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়
> শূন্য মনে হয়,
> শূন্য মনে হয়।
>
> 'বোধ' : ধূসর পাণ্ডুলিপি

এবং 'আট বছর আগের একদিন' নামক কবিতা এই বিস্ময় বিমূঢ়তা-বোধের অনন্য পরাকাষ্ঠা, বিমূঢ় প্রায় হতবোধ অথচ প্রচণ্ডভাবে অস্থির সত্তার টানাপোড়নের দৃশ্যাবলী এখানে আরো প্রকট, এ মৃত ব্যক্তির বিষণ্ণ শীতল শব যেন কবির নিজেরই প্রতীক : এক দুর্বোধ্য জটিল ক্লান্তি, গভীরতর অসুখের মতো এ ক্লান্তি, কোন এ ভয়ঙ্কর শূন্যতাবোধ, কিসের অভাবে এ আত্মহত্যা ?

> বধূ শুয়েছিলো পাশে—শিশুটিও ছিলো ;
> প্রেম ছিলো, আশা ছিলো—জ্যোৎস্নায়—তবু সে দেখিল

কোন ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাসকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।

'আটবছর আগের একদিন': মহাপৃথিবী

এ আত্মহননেচ্ছার হেতু অন্বেষায় প্রাণমাত্রার সাধারণ নিয়মে প্রত্যাবর্তন ক'রে বিফল হই, স্মারণাতীতকাল হতে জৈবযাত্রাব দীর্ঘপথে এ মৃত্যুর কি স্বগোত্রতা নেই? অথবা, এ মৃত্যু প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর কঠিন বাস্তবতার কাছে প্রতিটি মানুষের শাশ্বত সত্তার অপমৃত্যু;

আত্মহননের এ মতিভ্রম শোকাবহ সন্দেহ নেই, কিন্তু তদপেক্ষা শোকাবহ ঘটনা তার চরম আত্মবিস্বাদ, বিবর্ণ বিধ্বস্ত জীবন, আর সর্বাপেক্ষা বিস্ময়াবহ যে আপাতদৃষ্টিতে এ জীবনের মধ্যে কোনো রুগ্নতাই চোখে পড়ে না।

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়—
আরো-এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে;

'আটবছর আগের একদিন': মহাপৃথিবী

এ 'বিপন্ন বিস্ময়'কে দীপ্তি ত্রিপাঠী অবশ্য সৃষ্টির বেদনা বলেছেন এবং তা'হলে রবীন্দ্রনাথের 'এ অলৌকিক বেদনার ভার। বিধাতা যাহারে দেন তার বক্ষে বেদনা অপার। তার নিত্য জাগরণ', 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতার উপর্লেখ্য এ পংক্তিগুলিকেই মনে পড়ে; কিন্তু জীবনানন্দের এ বিপন্ন বিস্ময় অতিসম্ভব কিঞ্চিৎ ভিন্নধর্মী, তা সুদ্ধ কবিজনেব সৃষ্টির অলৌকিক বেদনা নয়, তার সংগে লৌকিক ক্লান্তি ও বিষণ্ন বিষাদ জড়িত, বহুবিধ কারণেই তো জীবন থেকে বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্য খসে পড়তে পারে এবং তারপরেও অন্তত জৈবিক নিয়মে বেঁচে থাকতে হয়, সে বাঁচা তো নিতান্ত সময়ের কাছে বাঁচা। সম্ভবত এ মৃত্যুর সংগে সে বাঁচার আত্মিক কোনো প্রভেদ নেই; নিরুপাধিক অন্বীক্ষশাস্ত্র যেমন ব্যক্তিমনেরই বিলক্ষণ প্রতিক্রিয়া, অনুরূপভাবে উক্ত প্রতিজ্ঞাদ্বয়ে নিশ্চিত সন্ধিস্থাপনও কিঞ্চিৎ জটিল. অবশ্য স্বীকার্য যে এই বিপন্ন বিস্ময় জাতীয় বোধসমূহের মধ্যেও একটি সূক্ষ্ম

রোমান্টিক আবেগই ক্রিয়াশীল। রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কবিতা গ্রন্থের 'বাঁশি' কবিতাটিতে এমনি এক জীবনের চিত্র :

ঘরেতে এলনা সেতো, মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া—

পবনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর ॥

'আত্মহত্যা' এই বিশেষ শব্দ সম্বলিত আর একটি কবিতার কএকটি বিশিষ্ট পংক্তিতে আত্মবিনাশী বোধ সুস্পষ্ট :

যতদিন বেঁচে ছিল
আমি জানি কী তারে দহিতে।
সে কেবল হাসির যন্ত্রণা,
আর কিছু না।

'তারকার আত্মহত্যা' : সন্ধ্যা সংগীত

হেন-বোধ সম্পৃক্ত 'সন্ধ্যা সংগীতে'র আরো কএকটি কবিতার নাম এ সংগে স্মরণযোগ্য, যথা : 'অসহ্য ভালোবাসা', 'হলাহল', এবং 'প্রভাত সংগীতে'র 'আহ্বান সংগীত', 'ছবি ও গানের' 'রাহুর প্রেম', ইত্যাদি কবিতা অবিশ্বাস্য-রূপে বিষণ্ণ; হতাশা, বিকার, মৃত্যুগ্লানি, ক্লেদ ও অন্ধকার কবির হৃদয়-শোণিতের ক্ষরণে ক্ষরণে সর্বত্র তুমুল।

রবীন্দ্রনাথের এই অন্তর্জ্বালা, নৈঃসংগ্যচেতনা ও মৃত্যুবিকারবোধ জীবনানন্দীয় সাম্প্রতিকবোধের সংগে সমমাত্রিক এরূপ উক্তি যে নিঃসন্দেহে হঠকারী, তা বলাই বাহুল্য, আমরা কবিতার ঐতিহ্যপরম্পরার প্রসংগ উত্থাপন করেছি মাত্র, এবং তার সপ্রমাণে আরো কিঞ্চিৎ স্পষ্ট ইংগিত সম্ভব এবম্বিধ উপায়ে।

রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত কবিতাসমূহ যদি প্রেমজ আবেগজাত হয় এবং সে কারণেই যদি তাঁর নৈঃসংগ্যবোধ জ্বালাবিকার ও আত্মবিনাশীচেতনা জীবনানন্দের বিপন্ন বিস্ময় ক্লান্তিজনিত বোধসমূহ হতে ভিন্নধর্মী অনাধুনিক হয়, তবে তন্ময়তা বা অন্তঃপ্রেরণার কথা না তুলেও এ উক্তি সম্ভব যে প্রভেদ যতো গভীরই হোক, আসলে উভয়ত্র ক্রিয়াশীল সর্বতোমুখী রোমান্টিক আবেগ, বৈসাদৃশ্য যা তা এই রোমান্টিক রূপ ও রূপান্তরের।

জীবনানন্দের মৃত্যু বর্ণনার চমৎকার রূপ 'মৃত্যুর আগে' কবিতা, গাঢ় ও ঘনিষ্ঠ; পৌষ সন্ধ্যার নিভৃত কুহক আর মৃত্যুর রহস্যঘনিল রূপ তুল্য-মূল্য; কবি সমগ্র ইন্দ্রিয় দিয়ে জীবনের আধারে মৃত্যু আধেয়ের রূপ পান করেছেন। পৌষ সন্ধ্যার নির্জন খড়ের মাঠ, হিজলের জানালায় আলো

আর বুলবুলির খেলা, নদীর মতো নরোম নারীর হাতে কুয়াশার ফুল ছড়ানো, অপরূপ শীতের রাতে নম্রনীল জ্যোৎস্নার মায়াবী আলোছায়া : পৃথিবীর এই ধূসর শীত সন্ধ্যার রূপে যারা মুগ্ধ, মৃত্যু তাদের কাছে আর ভয়ঙ্কর নয়, কারণ মৃত্যু ও এই শান্ত শীত সন্ধ্যার মতো রমণীয়, প্রকৃতি চেতনার স্তরপরম্পরায় মৃত্যু চেতনার উপলব্ধি।

একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিলো—সোনা ছিলো যাহা
নিরুত্তর শান্তি পায়; যেন কোন মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।
কি বুঝিতে চাই আর?....রৌদ্র নিভে গেলে পাখি পাখালির ডাক
শুনিনি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক।

'মৃত্যুর আগে' : ধূসর পাণ্ডুলিপি

প্রাতিস্বিক জীবনের অসহ্য পীড়া অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর, প্রতিদিনের গভীরতর অসুখে রুগ্ন সত্তার কাছে মরণ অধিক সুস্থ ও অনাময় : 'জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ'। এবং সব ভালবাসা যার বোঝা হ'ল—দেখুক সে মৃত্যু ভালোবেসে।' স্বীকার করতেই হবে যে কবির এসব উক্তিব মধ্যে আবেগই প্রবল. কোনো দার্শনিক প্রজ্ঞাপারমিত বোধির উপলব্ধি নেই, এবং যতোদূর সম্ভব এ জন্যেই নিতান্তই কবির মতো এ উক্তি তিনি করতে পেরেছেন : 'দেখুক সে মৃত্যু ভালোবাসে, জীবনের ক্লান্তি ও জ্বরে পীড়িত সত্তার আত্মসমর্পণ'।

প্রচণ্ড মর্ত্যবাদী রবীন্দ্রনাথের নিকটও মৃত্যু রমণীয় মনোহর, যদিচ বারংবার এ ভুবনের প্রেমে তিনি রোমাঞ্চিত হয়েছেন, 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে' বা, 'ছেড়ে দিবে তুমি। আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি—। যুগ যুগান্তের মহা মৃত্তিকা বন্ধন। সহসা কি ছিঁড়ে যাবে?' ইত্যাদি বিশিষ্ট খেদের রাবীন্দ্রীয় মিহিসুরে আমরা বারংবার অভ্যস্ত. তবু 'ভানুসিংহের পদাবলী'র 'মরণ' কবিতাটি হেন-যুক্তির সামান্য লক্ষণ মাত্র।

মরণ রে,
তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজুট,
রক্তকমলকর রক্তঅধরপুট
তাপবিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু—অমৃত করে দান।

এ রচনা অপরিণত বয়সকালের অপরিপক্ব কবি উক্তি-হিসাবে পরিগণ্য হলে অন্তত তাঁর আদি কবিতাবলীর যন্ত্রণাক্ষোভ গ্লানির প্রজ্জ্বলিত হৃদয়াবেগের উষ্ণ শোণিত হতে আমরা বঞ্চিত হই; আরো উল্লেখ্য যে তাঁর আদি রচনা ও অন্তিম রচনাবলীর অন্তর্লীন হৃদয় শোণিত প্রায় সমপর্যায়ে প্রবল, ক্ষুব্ধ ও যন্ত্রণাবিধ্বস্ত আদি ও উপান্তের রবীন্দ্রহৃদয়। তাঁর সংগীতেও মৃত্যুর প্রশান্তরূপ চিত্রিত:

সম্মুখে শান্তি পারাবার—
ভাসাও তরণী, হে কর্ণধার।

জীবনানন্দের কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ 'চিত্ররূপময়' ব'লে আখ্যায়িত করেছেন এবং বুদ্ধদেব বসু উক্ত ভাষ্যকে সম্প্রসারিত ক'রে বলেছেন: 'তাঁর কাব্য বর্ণনাবহুল, তাঁর বর্ণনা চিত্রবহুল এবং চিত্র বর্ণবহুল।'

এবং এক্ষেত্রে তিনি সত্য সত্যই সফল, তাঁর বোধি ও উপলব্ধি ঐকান্তিক; তাঁর কাব্যের বিষয় ও চিত্র একান্ত অনন্যনির্ভর, সম্ভবত এ ফলোৎপাদনের জন্যে যে মনীষার প্রয়োজন তার দিব্য শরাসন থেকে তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেখি না।

"কারণ আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে, খণ্ড-বিখণ্ডিত এই পৃথিবী. মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক এক সময়ে থেমে যায়,—একটি-পৃথিবীর অন্ধকার-ও-স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন যেন জ্বলে ওঠে হৃদয়, এবং ধীরে ধীরে কবিতা-জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়।"

এই প্রতিভা ও আস্বাদের আহ্বানে অন্তত সকল ব্যুৎপত্তির অধিক একটি বোধ জাগে যার স্পর্শে অনুভূতি, বর্ণনা ও চিত্র তুমুল বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে, এজন্যে তাঁর কবিতা পাঠে ইমপ্রেশনিস্ট চিত্র সমৃদ্ধ অস্পষ্টতার তিমিরে ফিরে যেতে হয়; ছেঁড়া-ছেঁড়া অসংলগ্ন বিপর্যস্ত রেখার টানের মতো, বিভ্রান্তিকর অথচ গুঞ্জনময়, আলো-ছায়া-রৌদ্র, প্রান্তর-সমুদ্র-আকাশ, মেঘ-নদী-বন, পাখির ডানা হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে স্পষ্ট থেকে অস্পষ্ট হয়েছে, এবং এই অস্পষ্টতা থেকে চিত্রের শারীরী বর্ণাঢ্যের জন্ম।

দেখার চোখ জীবনানন্দের অত্যন্ত প্রখর, তাঁর অবিরল দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও বস্তু উভয়ই বলীয়ান, একদিকে যেমন ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ ভোর, বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম, শিশুর মুখের গন্ধ, মাছির গানের মতো অনেক অলস শব্দ, অন্যদিকে তেমনি লোকজ সাধারণ বিষয়াদি

হতে গৃহীত কপালের ঘাম, অলস গেঁয়ো, রূপশালি-ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ, ইঁদুরের রেশমের মতো রোমে খুদ, শরীর, শেমিজ, উটের গ্রীবা, স্থবির ব্যাং। এমন কি বিদেশী অতিতুচ্ছ শব্দগুলি যথা, গ্যাস-লাইট, রবারের বল, ফসফরাস ইত্যাদি নিপুণ প্রয়োগে চিত্ররূপসম হয়ে উঠেছে।

সূর্যের আলোয় তার রং কুঙ্কুমের মতো নেই আর ;
হয়ে গেছে রোগা শালিখের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।
সকালের আলোয় টলমল শিশিরে চারিদিকের বন ও আকাশ
ময়ূরের সবুজ নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে।
'শিকার' : মহাপৃথিবী

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অওারস্পিরিট বা বিস্ময় অনুভূতির মধ্যে তাঁর রোমান্টিক পর্যাকুল চৈতন্যে গাঢ় চিত্রময়তার জন্মলাভ ঘটেছে, মন্তব্যটি আপাত-তাচ্ছিল্যে যতই মিথ্যা মনে হোক না কেন উপেক্ষার উপান্তে অন্তত একটি বিসংগত সত্যে উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী, যেহেতু উক্তিটি আপাত অসম্ভব বলে মনে হলেও অহেতুক নয় : 'ছিন্ন পত্রের' আত্মজৈবনিক বর্ণনায় কবিমানসের অঢেল যথার্থ পরিচয় নিহিত, উদাহরণ :

"তখন ঠিক মনে হচ্ছিল এ সমস্ত যেন ছেলেবেলাকার রূপকথার অপরূপ জগৎ....প্রদোষের অন্ধকারে এবং একটি গীতিবিস্ময়পূর্ণ ছমছম নিস্তব্ধতায় সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন—যখন সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে মায়াপুরে পরমাসুন্দরী রাজকন্যা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত।"

এখানে যেমন তাঁর আত্মস্বভাবের কল্পনারীতির নামাংকন, তেমনি ধীর প্রক্রিয়ায় এর সংগে সৃষ্টি হয়েছে তাঁর অন্তর্লোকে চিত্রানুভূতি, 'সোনার তরী'র সূচনা কবিতা হতে ক্রমান্বয়ে তা ঘনিষ্ঠ ও স্পষ্ট ; অপিচ জীবনা-নন্দীয় ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রধর্মিতার সংগে উল্লিখিত চিত্রাদির পার্থক্যও যে অঢেল সে সম্পর্কে তিলার্ধমাত্র সন্দেহ নেই, অথাচ এমন চিন্তা কি খুব ইঅমূলক যে রবীন্দ্রনাথের বিপুল রচনাবলীর বিক্ষিপ্ত চিত্রসমূহ জীবনানন্দ গভীর অন্তরংগতায় উপলব্ধি করেছেন, বারংবার পাঠ করেছেন। লোকারণ্যের অন্তরালে কখনো মধ্যরাত্রির নির্জন রাস্তায় বিচরণ করেছেন তিনি এবং যদি বলি, ইএটসের 'দি ফলিং অব দি লাভস' যেমন গান করেছেন, রবীন্দ্রনাথের 'একখানি অন্ধকার অনন্ত ভুবনে' 'তরুছায়া মসীমাখা' 'শ্রাবণরজনী' 'দাঁড়িয়ে থাকা বক' 'সূর্য ডুবছে, আলো ডুবছে,

সব ডুবছে' প্রভৃতির এক একটি চিত্র তাঁর অনুভূতিতে গাঢ় হয়েছে, তাহলে অন্তত জীবনানন্দের চিত্রতাৎপর্যের মারাত্মক কোন ব্যাঘাতের সম্ভাবনা নেই।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথ ছবির সম্রাট, অসংখ্য অনিঃশেষ ছবি তাঁর মনে; যার অভূতপূর্ব সন্নিবেশ তাঁর কবিতায় সংগীতে নাট্যরচনায় ও গল্পে, এমনি দিনানুদৈনিক আত্মজৈবনিক রচনায়ও তা বিচিত্র উচ্ছল; এবং তদপেক্ষা চমকপ্রদ যে রবীন্দ্রনাথ জীবনউপান্তে চিত্রকর, সুর ও স্বর সাধক সর্বাধিক নিঃসংগতম মুহূর্তে চিত্রী, সে চিত্রালেখ্যের যথার্থ কোন অর্থ নেই, অথচ অর্থাধিক তাৎপর্য আছে, নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞায় বাঁধা যায় না তাকে, অকংনের অকাট্য নিয়মচারিতা নেই শিল্পীর, কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয় চিন্তা করে অংকনী হাতে নেননি তিনি, দান্তে গেব্রিয়েল রসেটির মতো সহোদরার কুমারী মূর্তি থেকে অংকিত হয়নি কোনো ধ্রুপদ চিত্র, অংকনের সূচনা হতে শেষাবধি অজস্র বিক্ষিপ্ত বিপর্যস্ত চেতনারাশি, তুমুল আবেগ, হৃদয়ের বহু উষ্ণ শোণিত, কিছু ধ্বনি, স্বর ও সংগীত, বিচিত্র বর্ণলেপের মধ্যে কখোনো কোনো মানবীয় মুখাবয়ব হয়তো বা ধীরে অস্পষ্ট হ'য়ে বর্ণাঢ্য হ'য়ে ওঠে মেঘরঞ্জিত ধূমল আকাশ, ঘনান্ধকার সূর্যাস্ত কিংবা অতিপ্রাকৃত কোনো অস্পষ্ট কায়ালেখ্য, যার স্পষ্ট কোনো নাম দিতে পারেন না চিত্রী নিজেও, কএক পংক্তি শ্লোকে তার অভিধা দিতে চান তিনি; উদাহরণত একটি অরণ্যআদিম শ্বাপদ চিত্র: কুশলী চিত্রীর খেয়ালী রাগবিন্যাসে চিত্রার্পিত ছটি পশুমূর্তি, প্রাগৈতিহাসিক অদ্ভুত; চিত্রকরের নিজেরও অদৃষ্টপূর্ব, হিংস্র অথচ দৃষ্টিমুগ্ধকর এই পশুমূর্তিসমূহ; ইত্যাকার চিত্রের নির্দিষ্ট নামকরণ এ জন্যেই প্রায় অসম্ভব। এই অসম্ভব রক্তাক্ত বিষণ্ণ ভুবনের পাশ্বিকে দাঁড় করানো যাক 'সে' 'তিন সংগী' প্রভৃতি রচনাবলীর ভয়ংকর মানবিক চরিত্রসমূহ।

সুররিয়ালিজম তত্ত্বের অভেদার্থক বক্তব্য পাই তাঁর 'চিত্রলিপি ১ম'-এর 'মাইপিকচার্স' নামী ভূমিকাতে; এবং লক্ষ্যযোগ্য যে সমসাময়িককালে ১৯২৪-এ প্যারিতে আঁদ্রে ব্রেঁত সুররিয়ালিজমের মূলতত্ত্ব ঘোষণা করেন: **Manifesto du Surreaalisme**; ইত্যাদি প্রসংগে হায়াৎ মামুদ তাঁর একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে আলোকপাত করেছেন। জীবনানন্দের কবিতায় মগ্নচৈতন্যের গভীরে সত্যানুসন্ধান, অবচেতনার বাস্তব চিত্রাংকন। বলাই বাহুল্য ইমপ্রেশনিস্ট বিরোধী বিভিন্ন ধারার শিল্পপ্রতিক্রিয়ার একটি

বিশিষ্টধারা সুররিয়ালিজম। অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সংগে সমস্ত স্মৃতি ও বোধ অচেতনার গভীরে প্রবেশ, সেই মগ্নচৈতন্যের জাগর সত্তায় যে কবিতার জন্ম তা যুক্তিগ্রাহ্য ও বিশ্বাসযোগ্য নয়, অথচ মনকে দুর্নিবারভাবে আকর্ষণ করে:

সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিলো—
আকাশে একতিল ফাঁক ছিলো না;
পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি
অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা
চোখের মতো
ঝলমল করছিলো সমস্ত নক্ষত্রেরা;
জ্যোৎস্না রাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মতো জ্বল জ্বল করছিলো বিশাল আকাশ!
কাল এমন আশ্চর্য রাত ছিলো।

'হাওয়ার রাত' : মহাপৃথিবী

জীবনানন্দের প্রাথমিক রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনায়াস দৃষ্টি গোচর, এমন কি সত্যেন্দ্রনাথের সমকালীন ইতিহাসবোধ, নজরুলের তারুণ্যনিষ্ঠ ভোগবাদ, মোহিতলালের দেহনির্ভরতা ইত্যাদির প্রাধান্যও তাতে সমুপস্থিত; 'ঝরাপালক' কবিতাগ্রন্থ রাবীন্দ্রিক সৌন্দর্যধ্যানের অন্তঃসংগতিশীল ভাব-পরম্পরা, এ ক্ষেত্রে বিরূপতার মূল সূত্র ভিন্নপথগামিতায় অমিতাচারী কবিকেও মারাত্মকভাবে প্রতারিত করেছে: 'নীলিমা' 'পিরামিড' 'সেদিন এ-ধরণীর' প্রভৃতি তার নানবিধ সামান্যলক্ষণ।

রবীন্দ্রঐতিহ্যের উত্তরাধিকারে সাম্প্রতিকবিদের বিশ্ববীক্ষা, আত্মানুশীলনের লোকযাত্রা; জীবনানন্দের স্বউক্তির আলোকচ্ছটা উক্ত বাক্যের সত্যাসত্য নিরূপণে অধিক ফলদায়ক মহৌষধি:

"আধুনিক কবিতা সেই কিনানার থেকে সূত্র তুলে নিয়ে যে ধরনের সমাজ ও ঐতিহ্যবোধের আশ্রয় গ্রহণ করেছে তার পরিচয় রবীন্দ্রকাব্যে পাওয়া যায় না বললে উক্তি অসংগত হবে, কারণ রবীন্দ্রকাব্য বিরাট সমুদ্রের মতো................কিন্তু তবুও বাংলার মাটিতে রবীন্দ্রনাথের যুগে এসে যারা ভাবাবেগ ও রোমান্টিসিজমকে সংহত করে কবিতার ভিতরে তীর্থিকের মতো তপঃশক্তি অথবা হোরেসের রীতি অথবা নিজেদের হৃদয়ের ঈষদকুঁরিত অন্য এক সংহতি আনতে চায় তারা তাকিয়ে দেখে

উপরে—নিচে—সম্মুখে রবীন্দ্রকাব্যের অনপনেয় ছায়ায় তাদের সাবলম্বনের বিবর্তন চলেছে।"

২

সুধীন্দ্রনাথের কবিতা নঞর্থক জড়বাদীর নার্গসংগীত; তিনি স্বর্গভ্রষ্ট, মর্ত্যে অনিকেত। তাঁর ঈশ্বর নেই, প্রেম নেই, মুক্তি নেই; এবং বৈদান্তিক অদ্বৈতের অনীহায় তিনি অনেকান্ত জড়বাদে নিমগ্ন, মর্মান্তিকভাবে নিঃসংগ, নির্বিকার, অস্থির;

কাব্যরচনায় তিনি সর্বাপেক্ষা সংযতআবেগ পরিমিতবাক, ধ্রুপদনিষ্ঠ, মাত্র স্বদেশে নয়, বিদেশেও তাঁর তুলনা বিরল, স্তেফার্ণ মালার্মে, পল ভালেরি ব্যতিরেকে; অবিরাম নিঃসীম শূন্যতায় নৈরাশ্যভারে তিনি বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত অবিশ্বাসী, মর্মেমর্মে বিষণ্ণগভীর।

মনে হয় তাই
আত্মরক্ষা হাস্যকর, সুসংকল্প মৌখিক বড়াই,
জীবনের সারকথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া
নির্বিকারে, নির্বিবাদে সওয়া
শবের সংসর্গ আর শিবার সদভাব।
মানসীর দিব্য আবির্ভাব,
সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী:

'নরক': ক্রন্দসী

সুধীন্দ্রনাথ শব্দব্রহ্মবাদী, প্রৌঢ়ে তিনি নিজেই বলেছিলেন যে মালার্মের কাব্যাদর্শ তাঁর অন্বিষ্ট, একারণে কবিতায় যৎপরনাস্তি সংহতিবিধানে প্রয়াসতৎপর, শিথিল শব্দপ্রয়োগে তিনি বিরোধী, অর্থবোধের সংগতিনির্মাণে বিরামহীনভাবে যত্নবান; অবশ্য তাই তাঁর কবিতা নির্বিরোধ ন্যায়বাদের কূটতর্ক এমন প্রতিজ্ঞা অযৌক্তিক, মালার্মে নিজেও নৈয়ায়িক উক্তিকে কবিতা বলতে নারাজ, যদিচ সুধীন্দ্রনাথ ন্যায় ও যুক্তির পথেই অগ্রসর হতে চান; অন্যদিকে এও সত্য যে মালার্মের সংগে কাব্যাদর্শে তাঁর বৈসাদৃশ্য আরো কতিপয় অংকে, তবে মালার্মের মতো দৈববর্জনে তিনি সমান সোহংবাদী। তাঁর কবিতার প্রধান গুণ প্রবল আন্তরিকতা, সম্ভবত এ তাঁর সম্পূর্ণ নিজের। প্রতীকি কাব্যচর্চার সংগে যুক্ত থেকে তিনি নিরন্তর শব্দকৌষিক অর্থের ঊর্ধ্বে উক্তির অনন্য ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতে প্রচেষ্টারত;

সাধারণ বাচ্যার্থের অতীত অনন্যকল্প অর্থব্যঞ্জনা তাঁর কাব্যের অংগভূষণ,- 'বৈদেহী' বাচ্যার্থে বিদেহরাজতনয়া সীতা, সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় ব্যঞ্জিত অর্থে 'দেহহীনা' এবং 'দ্বৈপায়ন' অর্থে মহাভারত রচয়িতা ব্যাস নয়, 'নিঃসংগ' বা 'বিচ্ছিন্ন' না দ্বৈপায়নের পৌরাণিক জন্মইতিবৃত্তের সংগে যুক্ত; তিনি 'দ্বিধা-মলিদা', 'অভিধা', 'প্রমা', 'প্রজ্ঞাপারমিত', 'সুমধ্যমা', 'অবৈকল্য' প্রভৃতি শব্দাদির জনিতা।

অবশ্য এতদপ্রসংগে একথাও যুক্ত হওয়া অধিক বাঞ্ছনীয় যে তাঁর নির্মল চরিত্রে শুদ্ধচারিতার যতোই পরাকাষ্ঠা থাক, কবিজনোচিত হৃদয়বোধের বৈলক্ষণ সেখানে ঘটেনি, যদিচ মনস্বী ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন যে 'দুর্বল বা **incompetent** কবি হতে তাঁর লজ্জা', সম্ভবত কোনো কবিই, তা যতোই নিরাবেগ তিনি হন, বিষয়মাহাত্ম্যে বা শব্দগৌরবে কবিতার ভাবের জলাঞ্জলি দিতে পরিকর হবেন না, সুধীন্দ্রনাথেও তেমনি শব্দের স্বয়ম্ভূ মূল্য নেই, কবিতার স্বভাবমহিমাতেই তার গৌরব।

ধ্রুপদীয় স্বভাব সুধীন্দ্রনাথের সামান্য পরিচয় হলেও, এ ধ্রুপদ লক্ষণের সংগে মাইকেলের চারিত্র্য লক্ষণের কোনো সাদৃশ্য নেই, বরং সুধীন্দ্রনাথের নির্বিকার নিরাসক্ত পুরুষীয় স্বভাবের সন্ধিস্থাপন রবীন্দ্রনাথের নির্মল অভিজাত মানসিকতার সংগে, উভয়েই উচ্ছ্বাসের অপক্ষপাতী, নির্বিকার, নিস্পৃহ, নিঃসংগ এবং রুচিবান।

তাঁর কাব্যে ধ্রুপদী শিল্পীর নিষ্ঠা আছে, ব্যঞ্জনাধর্মী স্বল্পভাষ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ এবং প্রেরণার পরিবর্তে অধ্যবসায় তাঁর কাব্যকলাচর্চার মৌলতত্ত্ব; হেন কর্মে নিয়োজিত থাকার ফলে স্বভাবতই অপ্রচলিত তৎসম ও সংস্কৃত শব্দাবলীর প্রতি তাঁকে অনুরাগী হতে হয়েছে, এবং এ লক্ষণযুক্ত কবি-কর্মের ভাষ্যে কেউ কেউ মাইকেলের সংগে তাঁর সন্ধি কল্পনা করেন; কিন্তু উভয়ের মেজাজ ও মর্জি এতোই প্রখর বৈপরীত্যে সংলগ্ন যে হেন কল্পনা প্রায়ই স্বকপোলকল্পনার মতো মনে হয়, যেহেতু প্রথমোক্ত অগ্রজের কাব্য যেখানে মূলত বক্তব্যধর্মী, শেষোক্ত অনুজের কবিতা সেখানে যথার্থত ব্যঞ্জনাধর্মী; এই মৌলবিভেদ আরো অধিকতর স্পষ্ট হয় যখন উভয়ের কাব্যপ্রকরণ বিশ্লেষণ করি, মহাকাব্য ও গীতিকবিতার, উপমা ও উপকরণাদির; এবং আরো প্রত্যক্ষ যে শেষোক্ত জন প্রতীকী কাব্যকলার কারুবিদ, অন্যার্থে যদি মর্ত্য ও ব্যক্তিবাদের সংজ্ঞায় অগ্রসর হতে চাই, তাহলেও নিরাশ হতে হয়, কেননা সুধীন্দ্রনাথ মর্ত্য হতে অতিমর্ত্যে

লম্বমান এবং ব্যক্তি অভিব্যক্তি সকল বাদেই তিনি অবিশ্বাসী, তাঁর সর্বাবিধ বিশ্বাস যেন নীলিমার নিচে ফেটে পড়া এক বিষফল, তাই নিখিল নাস্তির মৌনে তিনি আত্মসমর্পিত;

আমি বিংশ শতাব্দীর
সমান বয়সী; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে; বীর
নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে
নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যতনা পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।
কারণ ভূতের নির্বন্ধাতিশয়ে, তথা ভবিষ্যের
নিষেধে, অধুনা ত্রিশংকু, এবং সে-খণ্ডবিশ্বের
মধ্যে দ্বৈপায়ন আমরা সকলে, জানি কিনা জানি,
নাস্তিরই বিবর্তবাদ।

'যযাতি': সংবর্ত

বা,

আমি ক্ষণবাদী: অর্থাৎ আমার মতে হয়ে যায়
নিমিষে তামাদী আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, তথা
তাতে যার জেব, সে-সংসারও।

'উপস্থাপন': দশমী

এ কবিতা নিটোল, সংহত এবং গাঢ়বদ্ধ; প্রতিটি শব্দ যথাযথ, স্পষ্ট ও গভীর, কবিতার এ সংহতি কবিরই চরিত্রগত মৌলবৃত্তির অংশভাক, যেহেতু তাঁর মতো আত্মরটনা বিমুখ বিনয়ী সুদ্ধ স্বীকার করছেন যে লিপিচাতুর্যে তাঁর অধিকার সার্বভৌম হোক বা না হোক অন্তত বিচারবুদ্ধি সন্নিকর্ষের ফলে ব্যাহত নেই, অন্তত এই কথিত বিচারবুদ্ধির অসম্ভব কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় তাঁর শব্দযোজনায়, অবশ্য এ উক্তির অর্থ এ নয় যে তাঁর কবিতাও এই কাণ্ডজ্ঞানেরই অনিবার্য সুফল, বরং বলা যায়, ভাব বা আবেগের সংগে কায়মনোবাক্যের সন্নিপাত, যেহেতু তিনি জানেন যে প্রসাদগুণের সার্থকতা অনাবিল উপলব্ধি, এবং কাব্য রচনায় আত্মোপলব্ধি শতনামের মূলনাম।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যদিও এহেন বাঙ্‌রীতি অন্বেষণ পণ্ডশ্রম কেবলমাত্র, বরঞ্চ প্রাগবর্তী মাইকেলের রচনাবলীতেই ইত্যাকার বৃহৎ শব্দা-

বলীর সন্নিবেশ যা তৎসম বা সংস্কৃতের বংশজ, যথা: দম্ভোলি, কর্বুর, রবাব, জীমূতমন্দ্র, শিঞ্জিনী; কিন্তু শব্দের গাম্ভীর্য সত্ত্বেও প্রয়োগকারীর সর্বতোমুখী সচেতনতার অভাব মেঘনাদবধে স্পষ্ট হয় তখনি যেমাত্র এরূপ শব্দের পার্শ্বে 'আপেক্ষিয়া', 'আয়াসিতে' প্রভৃতির ন্যায় শিথিল নামধাতু বা 'খেদান' জাতীয় ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখি, এবং যদিও কটাক্ষনিপুণ 'শনিবারের চিঠি' সুধীন্দ্রনাথকে এককালে 'হাতীবাগানের মাইকেল' আখ্যা দিয়েছিলেন, তথু রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বাসবিহীন প্রাণযাত্রার সংগেই তাঁর ঐক্যলক্ষণ অধিক, রবীন্দ্রনাথ মানসিক দিক হতেও সর্ববিধ অসংযমকে আজীবন ঘৃণা করতেন এবং তাঁর কাব্যও সংযনরক্ষার উজ্জ্বল স্বাক্ষর, সংহতি ও শব্দসার্থকতায় তা অনন্য, স্মরণযোগ্য যে এ বিশিষ্টতাই বাংলা কবিতার পরবর্তী কণ্ঠস্বরসমূহ নিয়ন্ত্রিত করেছে।

সেদিন অম্বর মাঝে
শ্যামে নীলে মিশ্রমন্দ্রে স্বর্গলোকে জ্যোতিষ্ক সমাজ
মর্তের মাহাত্ম্যগান করিলে ঘোষণা। যে জীবন
মরণ তোরণদ্বার বারম্বার করি উত্তরণ
যাত্রা করে যুগে যুগে অনন্ত কালের তীর্থপথে
নব নব পান্থশালে বিচিত্র নূতন দেহরথে,
তাহারি বিজয় ধ্বজা উড়াইলে নিঃশঙ্ক গৌরবে
অজ্ঞাতের সম্মুখে দাঁড়ায়ে।

'বৃক্ষবন্দনা': বনবাণী

ধ্রুপদীয় স্বভাব সমন্বয়বৃত্তির সদগুণে ভূষিত, এবং সুধীন্দ্রনাথের মতো স্বায়ত্তশাসিত নিরাবেগ পুরুষের চরিত্রে ঐতিহ্য অস্বীকারের তাড়না স্বভাবতই নিরুত্তেজ, সম্ভবত আধুনিকদের মধ্যে প্রকৃতিতে সর্বতোভাবে য়োরোপকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও তিনিই সর্বাধিক স্বদৈশিক ঐতিহ্যসংলগ্ন, শ্রুতিস্মৃতিপুরাণে সঞ্চারণশীল, রবীন্দ্রঐতিহ্যকেও এ কারণেই তিনি পায়ে ঠেলে আত্মশ্লাঘা বোধ করেন না।

সোহংবাদে শরণাপন্ন হ'য়েও যেহেতু তিনি বৌদ্ধদের মতো বৈনাশিক কর্মে আস্থাবান, তাই যদিচ তাঁর মতে বিনাশই অকাট্য সত্য, তবু সর্বভাবে আত্মধ্যানবিমুখ তিনি, এমন উক্তি অন্তত একালের কোনো মল্লিনাথের মুখেই শুনিনি; এবং যেহেতু এই আত্মচিন্তা রোমাণ্টিক স্বরূপ লক্ষণের শতমূলের অনন্যমূল, তাই বিরোধী স্বার্থ তাঁর মধ্যে যতো প্রবলই হোক,

তিনি যে সম্পূর্ণ রোমান্টিক ব্যাধিমুক্ত এমন বলা যায় না। রোমান্টিক মনোভাবের ভাষ্যদান প্রসংগে তার স্বউক্তি: 'রোমান্টিক শব্দের অর্থ অদ্যাবধি অনিশ্চিত; এবং পল্লবগ্রাহীদের ভাষায় বিশেষণটা তার সম্বন্ধে প্রযোজ্য, যে-ব্যক্তি অনশনে দিবাস্বপ্ন দেখে, অথবা খামাকা খেয়ালে ধ্রুপদের তাল ভেঙে দেয়। কিন্তু অন্তর্দর্শী জানেন যে ক্লাসিক যুগেও প্রথাবিমুখ লেখক দুর্লভ নয়; এবং উদাহরণত য়ুরিপিডিস-এর নামতো উল্লেখযোগ্য বটেই, এমন কি ধ্রুপদী রীতির প্রবর্তক সফোক্লিস-এর মধ্যেও বিবাদী মনোভাবের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।"

দুর্বিনীত সময়ে মানুষের ইচ্ছাশক্তি এক অবোধ্য প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার হাতে নির্মমভাবে প্রতিনিয়ত বিধ্বস্ত হচ্ছে, এই ভীষণ চরাচরে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, প্রবৃত্তি ও আত্মদমনের মিথুন এক স্বর্গচ্যুত ও মর্ত্যবিতাড়িত আকাশমর্ত্যপ্রসারী প্রেতপুরুষের আর্তনাদরত, অন্তত এ আর্তি, বিলাপ ও যন্ত্রণা সুধীন্দ্রনাথ আত্মগত জাগরচৈতন্যে বারংবার উপলব্ধি করেছেন, যার প্রকাশ তাঁর 'উটপাখী' এবং 'অর্কেস্ট্রা'র 'মৃত্যু কেবল মৃত্যুই ধ্রুবসখা। যাতনা শুধুই যাতনা সুচির সাথী'-র মতো আবেগ সংক্ষুব্ধ পংক্তিতে। তাঁর কবিতার কতিপয় চিত্রকল্পেও যে নিঃসীম অন্তঃসারশূন্যতা, আত্মপ্রবঞ্চিত মানুষের আর্তচিৎকার ও ক্লীবরতিগ্রস্ত বন্ধ্যা বার্ধক্যের যৌবনস্মৃতির বেদনাবিলাস ব্যঞ্জিত তা তাঁর ধ্রুপদীয় বৈদগ্ধ্য সত্ত্বেও রোমান্টিক হৃদয়াতিশয্যেরই পরিচয় বহন করে; এবং 'উটপাখীর' প্রতীকে ক্ষয়িত মূল্যবোধের যে নগ্ন রূঢ় সত্যের সম্মুখে উপনীত হই সেখানে বালিতে মুখ গুঁজে আত্মরক্ষার চেষ্টাও নিষ্ফল, এবং 'কোথায় পালাবে? ছুটবে বা আর কত? উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা'—তাতে পল, ভালেরির 'পামগাছে'র ছায়া থাকলেও এলিঅটের বন্ধ্যাযুগের 'হলোম্যান'-র মতো অন্তঃসারশূন্য আত্মপ্রবঞ্চিত মানুষের সাযুজ্যই অধিক; 'ওয়েস্টল্যাণ্ডে'র বর্ষণবিমুখ নিষ্ফল উষরতায় যেমন: **'Here is no water but only rock. Rock and no water and the sandy road'**; তেমনি অপ্রত্যাশিত ফাল্গুনীর পলাশের জন্যে উদ্যত অঞ্জলি দেখে সুধীন্দ্রনাথও বলেন: 'বনের বাহিরে ক্ষওয়া মাটি ধূধূ করে। নেই ফসলের দুরাশাও অম্বরে'; তাই রোমান্টিক লক্ষণ সুধীন্দ্রীয় চিদ-বৃত্তিতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত এমন উক্তি বহুলাংশে ভ্রান্তিপ্রসূত, তাঁর 'প্রশ্ন' কবিতায় যে খেদোক্তি এবং ঈশ্বরের সর্বময় ক্ষমতার স্বরূপ অদর্শনে যে

ব্যাকুলতা তা নির্বিবাদে রোমান্টিক চেতনারই জাগরণস্বপ্ন, অন্যথায় রবীন্দ্র-নাথের অন্তত এ কবিতার তুলনায় ঢের বেশি সংক্ষুব্ধ 'পরিশেষে'র 'প্রশ্ন' কবিতাকে রোমান্টিক মানসলোকের আর্তি বলা যায় না।

সুধীন্দ্রনাথের রোমান্টিক মর্মানুভূতির স্বাক্ষরযুক্ত অন্য একটি কবিতা 'প্রার্থনা' ঈশ্বরের অস্তিত্ব অভাবে তাঁর স্বোপার্জিত সোহংবাদের শূন্যতায় তিনি ভয়াবহভাবে পীড়িত।

> ভগবান, ভগবান,
> অতীতের অলীক, আত্মীয় ভগবান.
> অতিব্যাপ্ত আবির্ভাবে আজ
> আমার স্বতন্ত্র শূন্যে করো তুমি আবার বিরাজ।
>
> 'প্রার্থনা': ক্রন্দসী

স্বৈরসৃষ্ট চরাচরে লগ্নভ্রষ্ট প্রেতকান্নায় মানবিক সত্তার শাশ্বত সত্য-মূল্য নিহত. চতুর্দিকে করাল কুলগ্নের রাক্ষসী অপচ্ছায়া, এবং ভালেরির মতো সুধীন্দ্রনাথও জানেন যে প্রেমের চিরন্তন প্রতিশ্রুতি অর্থই 'নির্বোধ বিদ্রূপ' যেহেতু মানুষের পক্ষে পরস্পরকে ভালোবাসা অসম্ভব, তাদের একে অপরে সাক্ষাৎ সে কেবল 'অশ্লেষার' রাক্ষসী বেলায়' এবং কোনো এক সমুদ্যত দৈবদুর্বিপাকে; তাঁর কাছে প্রিয়তমা নিষ্ঠুর ছলনাময়ী এবং 'অসঙ্গত চিরপ্রেম' তথাচ সব জেনেও এই নশ্বর প্রেমেই তিনি আশ্রয় খোঁজেন: 'চাই, চাই, আজও চাই তোমাকে কেবলই'; যদিচ বুদ্ধদেব বসু গুরুগম্ভীর জটিল রচনাভংগিবশত তাঁর দেহনির্ভর প্রেমের কবিতাসমূহ 'ঈষৎ ক্লান্তিকর' ব'লে মন্তব্য করেছেন, তবু অন্যত্র তিনি সুধীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার তীব্র আবেগের কথাও স্বীকার করেছেন; বস্তুত তাঁর প্রেমের কবিতাগুলির সংগে বিজড়িত আছে নঞর্থক জীবনবাদীর গভীর বিষণ্ণতা, নির্মম নৈরাশ্যবোধ ও 'দয়ার্দ্র বঞ্চনার' মর্মান্তিক বেদনা; ফলে প্রেমের সহজাত আবেগ-উচ্ছলতা তার কবিতার বহিরংগে ব্যাপ্ত হয়নি, কিন্তু সুতীব্র আবেগের গভীরতর সংহত ফল্গু অন্তঃসলিলা নদীর মতোই তাঁর প্রেমের কবিতার নৈরাশ্য নেতি ও বিষাদের মর্মে মর্মে প্রবাহিত হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথের ধ্রুপদীয় নীতিবিচিত্রার সমন্বয়বৃত্তিতে তাই রোমান্টিক কবিচেতনার যৌগপদ্য অন্বেষণ অমূলক নয়; এ প্রেক্ষিতে বুদ্ধদেব বসুর উক্তি স্মর্তব্য: "তাঁর বিষয়ে অনেকেই বলে থাকেন যে তিনি বাংলা কবিতার 'ধ্রুপদী রীতির প্রবর্তক'। এই কথার প্রতিবাদ করে আমি এই

মুহূর্তেই বলতে চাই যে সুধীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে রোমান্টিক কবি, এবং একজন শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক।"

সুধীন্দ্রনাথের নৈরাশ্য, নেতি, প্রেম প্রভৃতি প্রায় সর্ববিধবোধের এরূপ নিটোল কঠিন ইস্পাতসংকাশ সংহতির হেতুবাদ ন্যায় ও যুক্তিতে তাঁর অবিচলিত আস্থা, তাই মর্মান্তিক বেদনা ও রাক্ষসী বাস্তবের সম্মুখে তিনি দাঁড়িয়েও নিরুত্তেজ মানবগুণের পরিচয় দিয়েছেন, কবির জীবনে যা দুর্লভ ও বিরল।

তিরিশের কবিতার রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্তির সূচনাপর্বটি চমৎকার হাস্যকর ও বিশিষ্ট, মুক্তিপ্রয়াস কবিতার তরুণ জনিতারা অধিক রাত জেগে রবীন্দ্রনাথ পড়েন, তাঁর প্রবর্তিত মুক্তছন্দে অথবা বলাকায় ছন্দে তাঁদের অনেকেই কবিতা লেখেন, এবং বৈঠকী সমস্বরে রবীন্দ্রবিরূপতায় সোচ্চার হন, এবং তিরিশের অন্যান্য সম্প্রতিবিৎদের ন্যায় সুধীন্দ্রনাথেরও সূচনাপর্ব রবীন্দ্রানুসরণ, তাঁর আদি রচনা 'তন্বী' কবিতাগ্রন্থে এ প্রমাণ সুস্পষ্ট; 'ভ্রষ্টলগ্ন': তন্বী, 'ভ্রষ্টলগ্ন': কল্পনা এ উক্তির স্বপক্ষে মাত্র একটি ক্ষীণ দৃষ্টান্ত।

৩

কাব্যানুভূতি, যে-মুহূর্তে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নের সংগে জড়িত হ'য়ে দ্বিতীয় রসায়নে রূপান্তরিত, সে মুহূর্তেই অভিযোগ ক্যাব্যানুভূতি বিনষ্টপ্রায়, অন্তত মার্কসবাদী কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কিত এই অভিযোগ অতিপরিচিত, কারণ রবীন্দ্রনাথ তো বটেই, সুধীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসুও কাব্যের অমর্ত্য চেতনায় বিশ্বাসী, অথচ বিস্ময়কর সত্য এই যে তিনি মার্কসবাদী হ'য়েও প্রায় ঐশ্বরিক প্রেরণার শব্দ ও ছন্দের সুষম বিন্যাসে সমসাময়িকতাকে প্রগাঢ় কণ্ঠ দিলেন, এবং এ পর্যন্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায় ব্যতীত তাঁর দ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী অনুপস্থিত এবং এতদসত্ত্বেও তিনিই একমাত্র কবি যিনি এলিঅটের সিদ্ধিকে হস্তগত করেও, রোমান ক্যাথলিকের কুসংস্কারাচ্ছন্ন দুর্গে আশ্রয় খোঁজেননি, যেমন এলিঅট খুঁজলেন প্রৌঢ়কালে, এবং আরো ইতর জনতার ম্লানস্পর্শকে কাব্যে ধারণ করে যাঁর কাব্য প্রায় ঐশ্বরিক প্রভায় ভাস্বর; এবং এক অন্তরংগ ভাষার ধ্যেয় সংগীতে যে জীবিত কবির মহৎ উৎস সর্বাপেক্ষা উৎফুল্ল নদী, ইদানীং যে সুর তন্ময়তুখোড়, এবং প্রাণযাত্রার করুণ বীভৎস জগতে সর্বাধিক বৈরী সময়ের

ক্লান্তিকর জীবনধারণ হতে স্বস্তি প্রার্থনায় যে কণ্ঠ অন্ততপক্ষে বারেক জীবন শিহরিত তাঁর নাম বিষ্ণু দে।

তাঁর বিশ্ববিশ্বাস ধ্রুবীয় আস্তিকনার শ্বেতচন্দন, সম্ভবত যা অনেকের কাছে একালে সোনার পাথরবাটি; কিংবা তাঁর কাব্যে কতিপয় চমৎকার অবসন্ন বিষণ্ণ-ধীর পংক্তি দেখেও কেউ কেউ এই ভুলস্বর্গেই আস্থার লোকালয় খোঁজেন, অথচ 'ক্যানিভাল এ জীবনে ঘুম পায় আজ' বা এ নরকে। মনে হয় আশা নেই জীবনের ভাষা নেই' এ সুর নিশ্চিত হতাশার, এবং যেহেতু তাঁর কাব্যে হেন সুর শুনি; তাই চতুর্দিকে জীবনের অসংগতি যতোই ব্যাপক হোক তাঁর কবিতা অনর্থক কোনো বিপরীত মন্ত্র উচ্চারণ করে না, যেহেতু তাঁর মনীষার যোগফলে চাণক্যীয় কুটিলতার নামমাত্র নেই এবং তাঁর বিশ্ববীক্ষা যদিও মূলত সমাজচেতনাপ্রসূত, তবু সুরসিক নারদই তাঁকে বীণাযন্ত্রে মন্ত্রণা দেন, আধুনিক চাণক্যরা নন, এক্ষেত্রে তাঁর দর্শন এতো জটিল যে প্রায়শই মারাত্মক ভুল হবার সম্ভাবনা, তাই বিশ্ব-মানবিকচেতনায় তাঁর অন্তঃকরণ যেমন প্রস্ফুটিত, দৈশিক ঐতিহ্যগ্রহণেও অনুরূপ তৎপর; এখানে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় তাঁর মনের বহ্নি, যা নৈরাশ্য, অসংগতি, অনাচার ও নিষ্ফলতার মধ্যেও নিরন্তর জ্বলতে থাকে, বিষ্ণু দে'র কবিতায় যা কিছু আশার স্বর শুনি তা এই, তা এই।

তিরিশের বাংলা কবিতায় এলিঅট সমৃদ্ধ উৎমর্ণ, তাঁর কুশলী বিশ্ব-বীক্ষায় এযুগের অনেক কবির আত্মদীক্ষা: বিষ্ণু দে মনে করেন এলিঅট বাংলাকাব্যের বিষাদক্লিষ্ট অর্জুনদের কাছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর অতিকুশল পাঞ্চ-জন্যের লঘু সংগীতে অশ্রুসংবরণের এক ভয়ঙ্কর জাদু আছে, যার মোহিনী মন্ত্রে ক্লৈব্যগ্রস্ত কবিরা আত্মসচেতনতায় অধিক স্পষ্ট হলেন, যদিচ আমাদের পূর্বজ চেনা অগ্রজেরাও নিঃসন্দেহে আত্মসচেতন ছিলেন, কিন্তু তাঁরা বিচ্ছিন্ন অস্পষ্ট এবং দূরালোকে ধূসর। দ্বিতীয় দীক্ষা ঐতিহ্য সচেতন-তার, বা হলো না, এটিই প্রথম ও প্রধান, এবং এক্ষেত্রে এলিঅটের বিশ্ব-রূপে অনেকের দিব্যদৃষ্টি; এবং এই ঐতিহ্য সচেতনতাতেই যে বাংলা কাব্যের মুক্তি, বিষ্ণু দে সে সম্পর্কে অবহিত, সম্ভবত তাই তাঁর কবিতায় পুরাণ ইতিহাস ও সাময়িকের সীমারেখা সংবেদনায় এমন শিলীভূত, দেশ ও কালে তাঁর ঔদার্য সমপরিমাণে ব্যাপ্ত, এবং মনে হয়, একমাত্র তাঁরই কবিতায় ঐতিহ্যচেতনার বিরলগুণে আর্টেমিসের চিত্রকল্পের সংগে উর্বশীর, অর্জুনের সংগে হ্যামলেটের, ক্রবাদুর সংগীতের সংগে দেশীয়

বারোমাস্যার এবং এলিঅটীয় মননের সংগে রাবীন্দ্রীয় মনীষার এমন সফল যুগলমিলন। নৈর্ব্যক্তিক পুরুষসিদ্ধিতে এলিঅট বিষ্ণু দে'কে আর একবার ঋণপাশে জড়ালেন, অপরিসীম কৃতজ্ঞতাবশে এ ঋণের আদ্যকৃত্য-পালনে বিষ্ণু দে'র চেষ্টার ত্রুটি নেই : 'মিঃ এলিঅট এমং দ্য অর্জুনস্' তাঁর সকৃতজ্ঞ মাত্রাজ্ঞানের পরিচয়।

এলিঅটের প্রতি বিষ্ণু দে আকৃষ্ট হয়েছিলেন যেমন, সরে এসেছেনও নিতান্ত কম নয়, যেহেতু তাঁর মানসলোক বড়ো বিচিত্রকর মহাদেশ, তাঁর আচার ও আদর্শ সমতালের করতালি নয়, প্রায়শই তিনি অভিজ্ঞতার চতুঃ-সীমা বাড়িয়ে দিয়ে দেশকাল ইতিহাসে গা ভাসান, এবং সবচেয়ে বিস্ময়-জনক যে তিনি যখন নরকে যান, তাও একান্ত জ্ঞাতসারেই, সেজন্যে প্রেমের মতো এমন রসঘন ব্যাপারেও তিনি পারিপার্শ্বিকেরই মুখাপেক্ষী, তাই কবিপরিচয়ের জন্যে তাঁকে যেমন কপালে প্রতিভার যজ্ঞলেখা এঁকে বেড়াতে হয় না, অনুরূপভাবে মনন বা আধুনিকতার জন্যেও তিনি প্রাণান্তকর দুঃসাহস দেখান না, এতদ্‌উভয়ের সন্নিপাতই তাঁর মনীষা, 'প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের যোগফল'; তাঁর এলিঅট প্রীতির মূল কারণ সম্ভবত জীবনের অজস্র অসংখ্য অসংগতি ও বৈপরীত্যের মধ্যেও সূক্ষ্ম অস্তিবাদ, যা মননে ও মনীষায় এমন এক জটিল বিভূতি যে তাকে অতি সহজে প্রত্যয়ধর্মী বলা দুরূহ, কারণ তা এতোই দ্বন্দ্ববিধুর, সংশয়জর্জরিত ও ক্লান্তিভারাক্রান্ত যে অস্তি ও অধ্যাত্মের কেন্দ্রচ্যুতিতেই প্রথম দৃষ্টি পড়ে, যদিও বলাবাহুল্য নিহিতার্থের সংজ্ঞা অভিনিবিষ্ট পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না, এবং যেহেতু এলি-অটের কবিতায় বিশেষত 'ওয়েস্টল্যাণ্ড'-এ উদ্দেশ্যহীন নগরসভ্যতার সমৃদ্ধ শূন্যতার চিত্র প্রবল ও প্রকট।

বিষ্ণু দে'র কলাকৈবল্য দ্বৈতসত্তার অন্বেষায় অস্থির, এ কারণে তাঁর কাব্যে কি প্রেম, কি প্রকৃতি কোনো কিছুই স্থাণু নয়, ঐতিহ্যের সর্বাংগীণ প্রসারেই তাঁর ব্যক্তিগতবোধ স্বস্তি পায়, এজন্যে কবিতা তাঁর হাতে এক সোনার জাদুকাঠি, ঐতিহ্যের অংগীকারকে তিনি প্রতীক ও চিত্রকল্পে এমন অন্তরংগ করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে শ্রীমতী কাব্য তাঁর প্রণয়সূত্রে বাঁধা; তাই তাঁর কবিতার ভাব ও ভাবনা অংগাংগীভাবে প্রতীকসত্যে সংলগ্ন। বিষ্ণু দে'র প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র মূল বিষয়াবলী প্রেমাদি অনুভূতি, তজ্জনিতবোধে যদিচ বলা উদ্ভট যে রাবীন্দ্রীয় আবেগের বিশুদ্ধ মদই সবেমাত্র জারকরস, তবু এবম্বিধ সারসংগ্রহের অপারগতার

আত্মদ্বন্দ্বে যে তিনি ভীষণপীড়িত তা তাঁর সৌন্দর্যস্বপ্ন উচ্ছ্রিতিতেই স্বাংগী-কৃত:

আজো এই আমাদের কাল
আজো এই জ্ঞান-বিজ্ঞ জরাবৃদ্ধ অভিজ্ঞ ভুবন
পলাতক উর্বশীর প্রতি পদপাতে
দুলে দুলে ওঠে স্নায়ু আলোড়িত উতল কম্পনে।

'উর্বশী ও আর্টেমিস: উর্বশী ও আর্টেমিস

বিষ্ণু দে'র কবিস্বভাবের মূলে নিরুপাধিক কাল, ইতিহাস ও নৈরাত্মবোধ সুস্পষ্ট ধারায় চিহ্নিত; এবং যেখানে তিনি স্বধর্মীদের মধ্যে স্মরণীয় ব্যতিক্রম, সেখানে তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি প্রথম হতেই স্বাতন্ত্র্যাশ্রয়ী, রবীন্দ্রানুসরণের প্রথাসিদ্ধ পথে তাঁর কাব্যযাত্রা ঘটেনি, তথাপি উক্ত প্রতিজ্ঞা মেনে নিলেও, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতাসমূহের দীর্ঘসারিতে আরো কএকটি কবিতার সাক্ষাৎ মেলে যাদের মৌল সুর তীক্ষ্ণ আত্মদ্বন্দ্ব, স্বপ্নসুষমামণ্ডিত পথবর্জনের বেদনা; যেন স্বপ্নভংগের খেদ বিস্মরণের জন্যেই সম্ভবত কবি উর্বশীর স্বপ্নাচ্ছন্ন মোহান্ধতাকে ত্যাগ করতে চেয়েছেন কৌমার্যের দেবী আর্টেমিসের স্মরণে. অথচ উর্বশীর জন্যে তাঁর মমত্ববোধ নিরন্তর উৎসারিত।

আর এক রাত্রি রবে কি উর্বশী
আকাশের নক্ষত্র-আভায়, রজনীর শব্দহীনতায়
রাহুগ্রস্ত হ'য়ে রবে বাহুবন্ধে পৃথিবীর নারী
পবশকম্পিত দেহ সলজ্জ উৎসুক?

'উর্বশী': উর্বশী ও আর্টেমিস

যদিচ স্বীকার্য সাপেক্ষ যে কালচেতনা ও ঐতিহ্যবোধে আশ্রয়ী বিষ্ণু দে রোমাণ্টিক প্রেমের মোহাচ্ছন্নতায় ডুবে থাকেননি, প্রেমসম্পর্কিত প্রাক্তন মূল্যবোধসমূহ তাঁর আধুনিক দৃষ্টিতে খণ্ডিত হয়েছে এবং যেহেতু তাঁর প্রেমও প্রজ্ঞারই সমীকরণ, তাই 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা' কবিতায় তাঁর সংস্কারমুক্ত প্রেমবোধের জটিল চিত্র অংকিত হয়েছে; তাঁর ব্যক্তিগত অভাববোধের মূলে যে ফ্রয়েডীয় ভাষ্যই সত্য তা অনুধাবন করতে অন্তত বিষ্ণু দে'র মতো কবির দীর্ঘ সময় অপব্যয় করতে হয়নি, আর হয়তো একারণেই এমন নৈরাত্মিক উপকরণে তিনি কাব্য রচনা করতে পেরেছেন।

বিষ্ণু দে'র কাছে যদি জিজ্ঞাসা অনন্ত হয় এবং তার নির্ধারণ ক্ষমতায় সম্ভবত তিনি এতোই অপরাগ যে কালিদাস হতে শেকসপীঅর এবং বিশ্বচেতনার সার্বভৌমিক অংগনে তাঁকে নিরন্তর উৎস সন্ধানী হতে হয়েছে, এই বিপুল ঐতিহ্য তাঁর কাব্যনির্মাণে অলৌকিক মহিমার অংশীদার এবং যেহেতু শোকতাপে ও হৃদয়াবেগে তিনি প্রায় নিস্পৃহ, তাই প্রণয়সংক্রান্ত অনুসংগেও তাঁকে এমন নৈর্ব্যক্তিবোধের পরিচয় দিতে দেখি, এবং তাঁর ব্যক্তিগত অনুকম্পার আহ্বানে যদিও প্রায় সর্বত্রই তুমুল আলোড়ন আনে; তবু বিস্ময়াবহ যে সম্মুখে দর্শন ও বিজ্ঞানের জ্ঞানচক্ষুই খুলে যায় অকপটে, বিষ্ণু দের সিদ্ধিতে তাই জ্ঞানচক্ষুই তার মনঃচক্ষুর নামান্তর।

কতিপয় রসবেত্তার মতে এলুয়ার ও আরাগঁর অনুপ্রেরণায় তাঁর সৃষ্টিশীল প্রেমচেতনা উদ্বুদ্ধ, বিকৃত ও অন্তঃসারশূন্য। রুগ্নপ্রেমের জন্যে প্রয়োজন নতুন আদর্শ ও সদর্থক মূল্যবোধ, যা বিশ্বাসভংগের দায়ভাগে দায়িত্বশীল প্রেমকে সংস্থাপিত করতে পারে, প্রাণের প্রতিষ্ঠায় প্রেম তাই নিরন্তর সংগ্রামে তাঁকে সহমর্মিতা জোগাবে; এ পর্যায়ের কবিতায় প্রেম ও সমাজ সমার্থক।

রাবীন্দ্রীয় প্রেমচেতনার সংগে এ প্রেমের পার্থক্য স্বীকার না করে উপায় নেই, যেহেতু প্রথমোক্তের প্রেম সৌন্দর্যময় জীবন আকাঙক্ষা এবং শেষোক্তের আকাঙক্ষা উৎসও একই কিন্তু তা অগ্নিদগ্ধ গোলাপ, সম্ভবত কবির এ সময়ের সর্ববিধ প্রেরণায় সংক্রিয় ছিল মার্কসীয় দৃষ্টিভংগির আলোকে পরিবর্তিত মূল্যবোধ, তবুও বিষ্ণু দে'র প্রত্যয়াদিতে ইত্যাকার উপলক্ষণ অবান্তর লাগে না, কেননা তাঁর মানসিকতা এমন সংস্কারমুক্ত যে কোন কিছুতেই তিনি শুচিবায়ুগ্রস্ত নন, ব্যতিরেকী সত্ত্য এও যে অনুরূপভাবে কোন সহসা সচকিত জৌলুসে তিনি আসক্তও নন, তাই রোমান্টিকতাকে কখোনো তিনি সংক্রামক ব্যাধির মতো ভাবেননি, সমাজের আশা তাঁকে এমন শক্তি দিয়েছে, যে তিনি প্রসন্নচিত্তে শেষের দিকের প্রেমের কবিতা-বলীতে রাবীন্দ্রীয় প্রেমোক্তিকে ঐতিহ্য হিসেবেই গ্রহণ করেছেন এবং একজন মহৎ কবির দায়িত্ব এতেই বর্তায়, ঐতিহ্যের সারসংগ্রহও এরই নাম; এবং ধ্রুপদ, রোমান্টিক দেশজ ও কুলীন প্রভৃতির শ্রেণী-ভেদের শুচিতাবর্জন; রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিষ্ণু দে বরাবর শ্রদ্ধাশীল, রবীন্দ্রকাব্যের সিদ্ধরস তিনি অঢেল পান করেও রাবীন্দ্রীয় আদর্শের বরপুত্র সাজেননি; বহু কাব্যস্মৃতিকে বিচূর্ণ করে আপন কবিতার অনুপান তৈরী করেছেন, তবু তাঁর স্বভাষণে রবীন্দ্রযুগের সংগে উত্তরকালের ব্যবধানের চিত্র প্রবল:

"তবু মোটামুটি বলতে হবে যে তাঁর নক্ষত্রবিহারী প্রতিভা বাংলার রসাল মাটিতে মানুষ আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তবতায় বিরাজমান থেকেও বহু উর্ধ্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেখানে মধুসূদন বা দীনবন্ধু বরং আমাদের চেনা অগ্রজ।"

এ বিরোধিতার মূল লক্ষ্য যে রোমান্টিক অতি আবেগ তা বাহুল্যবলা, তবু বর্জনের কোন অর্থেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর লোকযাত্রার অন্তরায় হননি, এর মূল কারণ যথাসম্ভব তাঁর কবিস্বভাবের অতিশয় সদগুণ, যার গ্রহণ ক্ষমতা এমন আন্তরিক যে, সমস্ত সমাচার বোধিও বুৎপত্তিগুণে অসাধারণ অর্থময় হয়ে ওঠে, নানার্থব্যঞ্জনের অভাবে কোন অসংগতি বাধায় না; মোটামুটি এর সুফল বিষ্ণু দে'র কাব্যে স্মরণযোগ্য কলাকৌশল, এবং এমন কি আবেগতাড়িত হয়ে তিনি যখন অসহায় অতীতের জন্যে খেদ প্রকাশ করেন, তখনো এই নাজটালজিয়ার মধ্যে তাঁর প্রাতিস্বিক স্বভাবের বৈচিত্র্য এতো বিপুল যে অস্বাভাবিক মননচারিতাগুণে তা আমাদের নৈর্ব্যক্তিক সার্বজন্য আবেগের নামান্তর বলেই মনে হয়, এবং তা নিখিলের সার্বভৌম সম্বন্ধ স্বীকারেব সুগভীর সৌহার্দ্য।

'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' কবিতা গ্রন্থে তিনি অতীত ও অনাগতের ক্রান্তি-কালে দাঁড়িয়ে অধুনার সর্ববিধ প্ররোচনার তুমুল কোলাহল শুনেছেন: নিষ্ঠুর কৃত্রিমতায় মানুষের সত্তা বিধ্বস্ত, বৃষ্টিহীন আবাস; অতীত অন্ধকার, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, এবং যে বর্তমানের মাটিতে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে তা প্রচণ্ড প্রতারক, যেহেতু বিষ্ণু দে আত্মবিনষ্টিতে ভবযন্ত্রণা জুড়াতে রাজি নন, তাই এই নিরাবেগ অস্তিত্ব তাঁর কাছে অসহ্য:

> রৌদ্র হানো, বান দাও, হে সূর্য, হে চৈতন্য আকাশ
> এই নিত্য অপঘাত দূর করো,
> এর চেয়ে দগ্ধ দিনে এনে দাও সানালপুরের যুগান্তের ভুশণ্ডী প্রান্তর।
> 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত': স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত

'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতে'র বিষ্ণু দে বিস্ময়করভাবে প্রকৃতির সংগে অন্তরংগ, তিনি উদার আকাশ, প্রকৃতি ও জনতায় এই বিকৃত সভ্যতায় রুগ্ন মানবসত্তার নিরাময়ের বিধান দেখেছেন: 'এ রোগের বিধান আকাশে। পৃথিবীতে, বনস্পতি, ওষধিতে, ক্ষেতমাঠ, ঘাসে। পাহাড়ে নদীতে বাঁধে' বিরোধী সত্য যতো প্রবলই হোক, তবু অন্তত 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতে' বিষ্ণু দে অস্বাভাবিকভাবে প্রকৃতি প্রেমিক, তাঁর মননের খাত বেয়ে আবেগের উৎস

ধারা নিরন্তর প্রবহমান, এবং কাব্য প্রকরণের বিশিষ্ট তিনটি গুণের **Phanopeia** বা সংগীতধর্মের প্রাধান্য এ কাব্যের কবিতাবলীর প্রতি অংগে বিজড়িত। হৃদয়ের সহস্র মুখ খুলে দিয়ে প্রকৃতিকে অন্তর-চেতনায় অনুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আকাশের মেঘ দেখে তাঁর আনন্দ, এবং এ আনন্দের উৎসে জন্ম তাঁর কবিতার, আনন্দ তাঁর কবিতার অন্য নাম, যদিচ এ আনন্দাবেগের মর্মে মর্মে বেদনার অশ্রু ঘনীভূত: 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে, ময়ূরের মতো নাচেরে হৃদয় নাচেরে' এ উক্তির বিপর্যাস সত্য তীব্র বেদনা, যদিও আপাত শ্রবণে উল্লাসাবেগের ছোঁয়াই লাগে। বিষ্ণু দে'ও প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পিত, অন্তত ইদানীং, এবং এ চৈতন্যের ভিন্নতর ব্যাখ্যা যাই হোক, তিনি যেভাবে তাঁর কবিতা শাল, হিজল, স্বর্ণচাঁপা, ময়ূর, তিতির প্রভৃতিতে ভ'রে তুলেছেন, রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ ব্যতিরেকে খুব কম কবিরই তা সাধ্যে কুলায়।

কতিপয় কবিতার শীর্ষনাম নির্ণয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করেছেন, নির্বিবাদে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্টনাম তাঁর কবিতায় যুক্ত হয়েছে, বহু ক্ষেত্রেই তা বিরোধের সাক্ষ্য নয়, বরং ঐতিহ্যরূপেই গৃহীত। তাঁর 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কবিতাগ্রন্থটির নাম শুনে রবীন্দ্রনাথের 'কোমলগান্ধার' কবিতাটিই মনে পড়ে, এবং আরো মনে পড়ে কবিতাটির পংক্তি: 'নাম রেখেছি কোমলগান্ধার। মনে মনে'। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু প্রায় এক শতাব্দীর নির্মম প্রতিভায় চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত করেছিলেন, এবং যেহেতু আজো প্রচ্ছন্ন তিনি সকলের গভীরে, এসব এবং আরো বহু কারণে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার পুনশ্চর্চা দেখে স্বতই মনে হয়, আনন্দের বুঝি মৃত্যু নেই, কবিতার মৃত্যু নেই।

১৯৬৯

আকরম হোসেন

কথামালা এবং পূর্ব বাঙলার কবি ও কবিতা

কথা ১

আবেগ-অভ্যাস, আচার-আচরণ, চিন্তাপ্রবাহ, মতাদর্শ, ধর্মচিন্তা, তত্ত্বকথা ও দর্শন প্রভৃতির যোগফল সমাজচেতনা—যা বস্তুজগৎ বা সমগ্র সমাজজীবন ও প্রকৃতিলোকের নির্বিবাদী দর্পণ। সমাজ সংগঠন যদি হয় শ্রেণীবিভক্ত, জটিল, দ্বিধাগ্রস্ত ও দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ—চৈতন্যপ্রবাহও হবে তার নিঃসন্দেহ অনুগামী। সমাজচৈতন্য এক সার্বিক প্রবাহ, যার অন্তর্গত রাষ্ট্রচিন্তা, নৈতিকতা, ধর্ম-চিন্তা। শিল্প-বিজ্ঞান পরস্পর বহমান, দর্শন প্রভৃতি গতিবান। প্রকাশ-মাধ্যম ও ব্যক্তির মানস-সংগঠনের বিভিন্নতায় একক চেতনাপ্রবাহ প্রজা-তিতে বিভক্ত, তবে একে অপরে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং অন্তর্গূঢ় সূত্রে পরস্পর সাপেক্ষ।

সমাজজীবনের অন্তর্গঠনের রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তার বহির্গঠন অর্থাৎ চৈতন্যপ্রবাহ। বস্তুত, সমাজরূপের বিবর্তন-শীলতা স্বায়ত্তশাসিত বা স্বয়ংক্রিয় নয়, বরং তা নির্ভরশীল উৎপাদন যন্ত্র বা উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশের ওপর। সামন্তসমাজের সকল ধ্যান-ধারণা নতুন উৎপাদন যন্ত্র ও উৎপাদন সম্পর্কবহ বুর্জোয়া সমাজে কার্যত অচল। মধ্যযুগীয় সাহিত্যচিন্তা, সমাজদর্শন, রাধাকান্ত প্রমুখের সমাজতত্ত্ব হিন্দু কলেজের নব্যশিক্ষিতের কাছে হয়েছিল অগ্রাহ্য, পরিত্যাজ্য।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-অন্তর্গঠনের চৈতন্যপ্রবাহও বহুভুজ হতে বাধ্য। কোন শ্রেণীর অস্তিত্বরক্ষানুগ রাষ্ট্রীয় চিন্তা, ধর্মবোধ, শিল্প-সাহিত্যাদর্শ, নীতি-চেতনা, কল্যাণবোধ প্রভৃতি এবং নানাবিধ ধ্যানধারণার যোগফলই হোল সে শ্রেণীর একক চৈতন্যপ্রবাহ। প্রতিটি শ্রেণী-উদ্ভূত চৈতন্যপ্রবাহ

স্বার্থানুগ এ কারণে যে, প্রতিটি শ্রেণীই তার সমাজদর্শনকে প্রতিযোগী শ্রেণীর বিরুদ্ধে সচেতন, অর্ধচেতন বা অবচেতনভাবে ব্যবহার করে।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মতাদর্শ যদি শ্রেণীচেতনার প্রতিভাস হয়, তবে সাহিত্য-শিল্প নিঃসন্দেহে সামগ্রিক জীবন-সত্য প্রকাশে অক্ষম। অথচ পরিপূর্ণকে আবিষ্কার, শাশ্বত সত্যকে চিহ্নিত করাই হোল সাহিত্য-শিল্পের অন্বিষ্ট। সত্য নিরপেক্ষ নয়, বরং সাপেক্ষ। সমাজ এবং চেতনার ক্রম-বিকাশই শাশ্বত। সমাজ বিকাশের ধারায় যে শ্রেণী-উদ্ভূত জীবনদর্শন প্রগতিশীল, তাই তুলনামূলকভাবে সত্য এবং সুন্দর। যতক্ষণ বুর্জোয়া-শ্রেণী সামন্তশ্রেণীর সংগে সংঘর্ষরত, সে পর্যন্তই বুর্জোয়া চেতনাপ্রবাহ সত্যান্ধ, যেমন রামমোহন রায়ের শিক্ষাদর্শ ও ধর্মচিন্তা ; কিন্তু যখন বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্র এবং ক্ষমতা অধিকারে সক্ষম হয়, তখন থেকেই সে হয় ক্রমবিকাশ-বিরোধী—অর্থাৎ সত্যবিরোধী।

এখানে প্রশ্ন উত্থিত হওয়া স্বাভাবিক, সমাজ সংগঠনের কঠোর শাসনে যদি চেতনাপ্রবাহ অঙ্কশাস্ত্রের মত নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে ব্যক্তিভাবনাও হবে শর্তবন্দী, সাপেক্ষ ও শৃংখলিত। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত সত্যদর্শী নয়। কারণ সমাজ গঠন যেমন ব্যক্তিদর্শনকে নিয়ন্ত্রণ করে, ব্যক্তি চেতনাও তেমনি সমাজগঠনকে প্রভাবাক্রান্ত করে। যেমন জাতিগত শোষণ ও বৈষম্য থেকে আওয়ামী লীগের জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রচিন্তার জন্ম হয়েছে, তেমনি উক্ত রাষ্ট্রচিন্তাও ঐ বৈষম্যকে প্রভাবিত করছে এবং করবে। কোন ব্যক্তি অধীতবিদ্যা, ইতিহাসজ্ঞান ও সমাজ বিকাশের মৌল সূত্র প্রভৃতিকে আক্রান্ত করে ভবিষ্যৎ রূপাবয়ব প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম। এবং দৃশ্যমান সত্যে পৌঁছোতে ব্যক্তির সক্রিয় ভাবনা ও ভূমিকা বর্তমান সমাজগঠনকে আক্রান্ত করে। শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্বরূপ, ব্যক্তিক প্রতিক্রিয়া, প্রবহমানতা ও জটিলতা প্রভৃতি সম্পর্কে সমগ্র ধারণাজাত প্রতিভা শর্তনিরপেক্ষ। সমাজ শর্ত-নিরপেক্ষ প্রতিভাই কালোত্তীর্ণ কারণ শ্রেণীদ্বন্দ্বের টানাপোড়েনের ধূলি-ঝড়ে কিম্বা স্বার্থের অভিশাপে তারা একচোখা নন, নন অকালতাড়িত জন্মান্ধ। অথবা শ্রেণীস্বার্থের চক্রপথে তাঁরা নন মুদ্রাদোষে জ্ঞানপাপী।

সাহিত্যকর্ম নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রচিন্তা, বিজ্ঞান কিম্বা নীতিকথা নয়। তবে তা সমাজচৈতন্যপ্রবাহের অন্তর্গত অন্যবিধ উপাদান থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং স্বাতন্ত্র্যকামী সহযাত্রী। সাহিত্য হ'ল সমাজ-অন্তর্গত মানুষের চেতনালোকের চিত্রকল্পের অন্তর্গূঢ় শৈল্পিক প্রতিফলন। বিজ্ঞান বা অন্য

শাস্ত্রসমূহ তত্ত্ব-প্রমাণের প্রকাশ। পক্ষান্তরে সাহিত্য হ'ল সামগ্রিক জ্ঞান, অনুভূতি, চৈতন্য যা শৈল্পিক চিত্রকল্পরূপকে উপমায় উদ্‌ভাসিত, যা পঞ্চেন্দ্রিয়ের কাছে অর্থময়, আবেগবাহী, ব্যঞ্জনাধর্মী। বস্তুজগতে সংঘর্ষরত ব্যক্তির চেতনান্তর্গত ভাবাবেগ (**emotion**) এবং সৌন্দর্যানুভূতি (**Artistic feelings**) সাহিত্যের উপাদান হ'লেও সমাজ শর্ত-মুক্ত গতিশীল জীবন-দর্শনই তাকে যেমন করে শিল্পময়, তেমনি করে প্রসারিত ও সামগ্রিক। সাহিত্যকে যাঁরা বস্তুবিয়োজিত সুন্দর শাশ্বত-এর শৈল্পিক বাণীময়তা বলে বিশ্বাস করেন, তাঁদের কাছে আমার নিবেদন, যে ভাবাবেগ ব্যক্তির অস্তিত্বানুকূলে, তাই সুন্দর, কল্যাণময় আর চিরন্তন; যা প্রতিকূলে তাই অসুন্দর আর গর্হিত, তাৎক্ষণিক। বস্তুত শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সৌন্দর্য-চেতনাও বহুভুজ। শক্তিমান শাসকশ্রেণী স্বীয় অস্তিত্ব-অনুগ ভাবাবেগ আর জীবনদর্শনকে চিরন্তন, মহৎ আর সুন্দর বলে প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠাবান। প্রকৃতি-জগতের একটি দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য: সমুদ্রকে আমরা সুন্দরতম চোখের উপমায় ব্যবহার করি নির্দ্বিধায়, কিন্তু নভেম্বরের লেজাচ্ছ্বাসের পর তাকে অনেকেই ডেকেছি রাক্ষুসী। সমুদ্রকে অনেকেই দেখেছি নির্বিবাদী, কিন্তু জলোচ্ছ্বাসের পর হয়েছে সে অস্তিত্বসংহারক, রাক্ষুসী। একই সমুদ্র দ্বিমাত্রিক ভাবাবেগ সৃষ্টি করেছে—একটি অস্তিত্বের স্বপক্ষে, অন্যটি অস্তিত্বের বিপক্ষে।

কথা ২

বাঙলাদেশে ব্রিটিশ বেনিয়াপুঁজি ও শিল্পপুঁজি বিনিয়োগের ইতিহাসের সঙ্গে এদেশীয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব-ইতিহাস অভিন্ন। ইউরোপ-আমেরিকার বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষপুটে লালিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর চেতনাপ্রবাহের একমাত্রিক প্রকাশ তার সাহিত্যে, যা বুর্জোয়া জীবনদর্শনের ঐশ্বর্যবহ অহংকার। বাঙলায় বিধ্বস্ত উৎপাদনযন্ত্র আর উৎপাদন সম্পর্কের উপর সামন্তশ্রেণী পুনর্বিন্যস্ত হোল, দেশীয় পুঁজিও অবিকশিত—ঔপনিবেশিক শাসনের এটিই স্বাভাবিক ফলাফল। সুতরাং দেশীয় পুঁজি, ইংরেজাশ্রয়ী সামন্তশ্রেণী আর ব্রিটিশ পুঁজিবাদী-বেনিয়াদের পক্ষচ্ছায়ায় উদ্ভূত, ক্রমবিকশিত হোল বাঙলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বাঙলার রেনেসাঁস, বস্তুতই, কলকাতা বা কয়েকটি শহরের ইংরেজাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত, সামন্তপ্রভু বা কয়েকজন বেনিয়ার পুনর্জাগরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইউরোপীয় মধ্যবিত্তের শ্রেণী-মানসিকতার সঙ্গে বাঙলার অবিকশিত বাস্তব অবস্থার সংঘর্ষজনিত ট্রাজেডিই মাইকেলের

জীবন-যন্ত্রণার উৎস। উপরোক্ত সংঘর্ষে মধুসূদন আক্রান্ত, ক্ষত; সেই বিক্ষত জীবনের আর্তনাদই রাবণের পরাজয়ের, চতুর্দশ পদাবলীর মর্মকথা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃতিত্ব তিনি সামন্ত চিন্তার সঙ্গে বুর্জোয়া দর্শনের সং-ঘাতকে চিত্রকল্পময় প্রকাশে ছিলেন সক্ষম। রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য কালপ্রবাহচেতনা; তিনি ছিলেন নির্বিবাদী সহঅবস্থানে বিশ্বাসী। রবীন্দ্র-নাথ ঔপনিবেশিক শাসন এবং দেশীয় সামন্তশ্রেণীর মধ্যবর্তী মরুরজ্জুতে পদচারণার কৌশল আত্মস্থ করেছিলেন; এ ব্যাপারে গাইডবুক ছিল উপ-নিষদ। অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের সন্দেহাক্রান্ত, অবিশ্বাসী পুনর্বিচার-প্রত্যাশী পদক্ষেপ দুর্লক্ষ্য নয়।

১৮৮৫-এ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা বাঙলার মধ্যবিত্তের (যার অধিকাংশই হিন্দু) জীবনসংকট প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর অর্থ-নৈতিক বিপর্যয় রাবীন্দ্রিক সর্বদ্বন্দ্ব-মীমাংসিত জীবনদর্শনকে করল প্রচণ্ড উপহাস; অকারণ আনন্দজগৎ সঙ্কটের দীর্ঘশ্বাসে হোল শ্বাসরুদ্ধ। দেশীয় পুঁজিবাদী শ্রেণী অবরুদ্ধ, সামন্ত অর্থনীতি ত্রিশঙ্কু; পক্ষান্তরে স্ফীতকায় মধ্যবিত্তশ্রেণীর সুস্থ ও প্রত্যাশিত চলাচলের জন্যে অত্যাবশ্যকীয় হোল বৃহৎ পরিসর সড়কের। এই সঙ্কটাপন্ন মানসগঠনের চেতনারূপ হবে পরিবর্তিত, এটাই স্বতঃসিদ্ধ। অপরপক্ষে বিকাশশীল সমাজ হিসেবে রাশিয়ার মুক্তিধ্বনিও বাঙালী মধ্যবিত্তের একাংশের মানসলোক চঞ্চল কোরল বিষাদক্লিষ্ট প্রত্যাশায়। বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের যাবতীয় আন্দোলনই হয়েছে দরবারী, স্বল্পপরিসরহেতু আসন টানাটানি করেছে হিন্দু আর মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন পৌরাণিক প্রতীকাশ্রয়ী হওয়ায় একাংশের পূর্ণ সমর্থন পায়নি। উপরোক্ত প্রেক্ষিতে বাঙলা সাহিত্য-অঙ্গনে এলেন তিরিশোত্তর কবিবৃন্দ। অবিশ্বাসী, হতাশা-গ্রস্ত যুদ্ধ-প্রতিবাদী এই কবিবৃন্দ সামাজিক কার্যকারণ ও সমগ্র সমাজপ্রবাহ আবিষ্কারে উন্মুখ হলেও, ব্যক্তিক প্রতিক্রিয়াজাত ভাবাবেগই ছিল তাঁদের কাব্য-ঐশ্বর্য। তাঁদের পক্ষে দেশীয় কোন ঐতিহ্যকে সাহিত্যাদর্শরূপে গ্রহণ করা ছিল অসম্ভব। কারণ অনুরূপ জটিল শ্রেণীবিভক্ত সমাজচেতনার আত্মীয়তা ঐতিহাসিক কারণেই দেশীয় সাহিত্যাদর্শে ছিল দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং অবক্ষয়াক্রান্ত ও বিকৃত ইউরোপীয় বুর্জোয়া-মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীব-দর্শনজনিত সাহিত্যাদর্শই হোল তাঁদের অন্বিষ্ট। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকেই ইউরোপীয় বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের আপাত-উজ্জ্বল থাবার

ভেতর থেকে সাম্রাজ্যবাদী নখ বের করতে শুরু কোরল। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ, নাজীবাদ, ফ্যাসিবাদের উদ্ভব মধ্যবিত্তশ্রেণী-লালিত মানবতাবাদ, নীতিধর্ম, কল্যাণচিন্তা, সৌন্দর্যচেতনাকে কোরল বিধ্বস্ত, পীড়িত এবং প্রয়োজনবোধে শ্বাসরুদ্ধ। তথাকথিত স্বাধীন, স্বাতন্ত্র্যকামী, মানবদরদী মধ্যবিত্ত ও পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীশ্রেণী করুণাপ্রার্থীরও অযোগ্য হয়ে উঠল, হয়ে উঠল শাসক-ইচ্ছার মর্মান্তিক ক্রীড়নক। উত্তরসামরিক বিধ্বস্ত প্রান্তরে পোড়ো জমিতে দাঁড়িয়ে ইউরোপীয় কবিবৃন্দ ব্যক্তিক প্রতিক্রিয়া-প্রসূত জীবনদর্শন দিয়ে পচনশীল বুর্জোয়া জীবনসত্য উপস্থাপনে হলেন অগ্রসর। জর্মান-ফরাসী-ইংরেজ কবিবৃন্দের প্রকাশক্ষম রীতি, একারণে, তিরিশোত্তর কবিকুলের কাছে হোল আত্মীয়।

কথা ৩

বিশ শতকের প্রথম দশক থেকেই পৌর, স্থূলকায় বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বার্থে বাঙালী মুসলিম তরুণ মধ্যবিত্তশ্রেণীর সংঘাত হচ্ছিল ক্রমপ্রসারিত। এই শ্রেণীসংঘাতকে নেতৃত্ব দেয়া ও স্বার্থ-করী করার প্রশ্নে সদা সচেতন ছিলেন বহিরাগত হিন্দু-মুসলিম সামন্ত-প্রতিনিধিবর্গ, ব্যবসায়ী, কয়েকজন শিল্পপতি এবং তাঁদের ধ্বজাবাহী দেশজ সামন্তপ্রতিনিধিবর্গ ও ব্যবসায়ীশ্রেণী। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও ব্যবহার ঐতিহাসিক সত্য। বস্তুত, এটি ছিল অনিবার্য। শ্রেণীচরিত্রে খাজা নাজিমুদ্দিন ছিলেন সামন্তশ্রেণী, ব্যবসায়ী ও সামন্তমানস সৃষ্ট ও প্রতিপালিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিনিধি। অপরিণত ও দুর্বল বুর্জোয়াশ্রেণী ও তাদের আশ্রয়ী ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর নেতা ছিলেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। সর্বগামী এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন মূলতই বাঙলার মুসলিম ধনিক ও মধ্যকৃষকের স্বার্থবাহী। বস্তুত, লাহোর প্রস্তাবের পর বাঙলার মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণী, সামন্তশ্রেণী ও নব্য ব্যবসায়ীরা পাকিস্তান পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল অনিশ্চিত অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার সঙ্কট থেকে নিরাপদ ভাগ্যের জন্যে। বহিরাগতদের নেতৃত্বাধীনে তারা যে নবতর প্রতিযোগিতায় সঙ্কুচিত হবে, সেটা তাদের দৃষ্টি বহির্ভূত ছিল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তিন দশকের মধ্যবিত্তশ্রেণীর শক্তিশালী অংশই সামন্তশ্রেণী উদ্ভূত অথবা ঐ শ্রেণীর জীবনদর্শনে প্রতিপালিত। পাকিস্তান আন্দোলন তাঁদের মনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার যেমন আশা

জুগিয়েছে, তেমনি সক্রিয় রেখেছে সামন্ত জীবনাগ্রহ। বুর্জোয়া আশ্রয়ী মধ্যবিত্তশ্রেণীর ক্ষমতায় নেতৃত্ব থাকলে অর্থনৈতিক সুবিধার সঙ্গে তারা হয়তো সংস্কৃতিকে সহজ সমীকরণ করতেন না। অবশ্য বুর্জোয়া জীবনাচরণঋদ্ধ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এই সময় ক্ষমতায় সক্রিয় ছিলেন। উপরোক্ত দুই শ্রেণী-আদর্শের মধ্যবর্তী দ্বন্দ্বলালিত একটি তৃতীয় অংশের অস্তিত্বও দুর্লক্ষ্য নয়। এই ত্রিধারা বিভক্ত মুসলিম মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী তথা কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীবৃন্দের পদচারণায় মুখর ছিল বিভাগ-পূর্বকালীন চিন্তাক্ষেত্র, সাহিত্য-প্রাঙ্গণ। একালের সামন্তবাদাশ্রয়ী কবিগণের মধ্যে গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭), রওশন ইজদানী (১৯১৭), ফররুখ আহমদ (জন্ম ১৯১৯), তালিম হোসেন (জন্ম ১৯১৮) প্রমুখ; বুর্জোয়া আদর্শাশ্রয়ীদের মধ্যে আহসান হাবীব (জন্ম ১৯১৯), সিকান্দার আবু জাফর (জন্ম ১৯১৮), আবুল হোসেন (জন্ম ১৯২১), সানাউল হক (জন্ম ১৯২৩) প্রমুখ এবং উভয় শ্রেণী-আদর্শের সংঘাত-উদ্ভূত দ্বন্দ্ব-লালিত স্রোতধারায় সৈয়দ আলী আহসান (জন্ম ১৯২২), সৈয়দ আলী আশরাফ (জন্ম ১৯২৪) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। রেনেসাঁ সোসাইটি (কলিকাতা), পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ (ঢাকা), সামন্তদর্শী ও দ্বন্দ্ব-লালিত কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতিষ্ঠান ছিল।

কথা ৪

তিন দশক থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১) ও পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন কলেজ-স্কুল উত্তীর্ণ নব্যশিক্ষিতের সমবায়ে ক্রমবিকশিত হচ্ছিল ঢাকা শহর কেন্দ্রিক এক মধ্যবিত্তশ্রেণী। চার দশকে এরাও হোল স্ফীতকায়। ফলে স্বায়ত্তশাসন প্রত্যাশী প্রাসঙ্গিক একটি বক্তব্যের উপস্থাপন হোল অত্যাবশ্যক। দুই দশকের শেষাশেষি বাঙলার মানস-তটভূমে আছড়ে পড়েছিল রুশ বলশেভিক বিপ্লবের তীব্র ভাবাবেগ। একালেই মুজফ্ফর আহমদের প্রচেষ্টায় শহর কলকাতায় জন্ম নিল ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি। চার দশকে এঁরা হলেন স্বাবলম্বী শক্তিবান; প্রতিষ্ঠিত হোল জেলা ভিত্তিক সংগঠন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে গান্ধীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের প্রতিকূলে তাঁদের মিত্রপক্ষ সমর্থন উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধান্ত কেবল বৈজ্ঞানিকই ছিল না, ছিল দূরদর্শিতাবহ; জর্মান কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হলেই তা হয়েছিল প্রমাণ-সিদ্ধ। উপরোক্ত সিদ্ধান্তের ফলাফলে কম্যুনিষ্ট নেতৃবর্গ

সরকারী অবরোধ থেকে আপাত মুক্ত হন। এ সময়ে কম্যুনিষ্ট সংগঠন ছিল স্বচ্ছন্দ পদচারী, সদস্য-কর্মী হিসেবে আত্মপ্রচারে ও সক্রিয় অংশ পালনে পূর্বাপেক্ষা বিপদাশংকা ছিল কম। এদের কর্মচাঞ্চল্য, সেকালে, নিরাপদ না হলেও, চরম নিরাপত্তাহীন ছিল না।

ঢাকা শহরেও কম্যুনিষ্ট সংগঠন সক্রিয় ছিল। মার্কসবাদী জীবন দর্শনে বিশ্বাসী বুর্জোয়া মানবতাবাদী কিছু ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী বিভাগ-পূর্বকালেই 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। বিভাগ পরবর্তীকালেও এর বৈঠক বসতো। যাঁরা উপস্থিত থাকতেন তাঁদের মধ্যে কিরণশঙ্কর দাশগুপ্ত, কল্যাণ দাশগুপ্ত (ক. দা. গ.), মদনমোহন বসাক, সরলানন্দ দাশগুপ্ত, কবীর চৌধুরী, শাহাদাৎ আলী, মকসুদ আলী, মুনীর চৌধুরী (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ) আশরাফ সিদ্দিকী (বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের ডিরেক্টর), আবদুল্লাহ্ আল মুতী, হাসান হাফিজুর রহমান (প্রেসট্রাস্ট পরিচালিত দৈনিক পাকিস্তান-এর সহকারী-সম্পাদক), আলাউদ্দীন আল আজাদ (সরকারী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ), বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখ। সুতরাং প্রগতিবাদী ও প্রতিষ্ঠাকামী মধ্যবিত্তশ্রেণী-উদ্ভূত কবিগণের সঙ্গে বিভাগ-পূর্বকালীন সামন্তাদর্শী কবিগণের (যাঁদের অনেকেই ছিলেন কলকাতা-কেন্দ্রিক) সাহিত্যাদর্শগত বিরোধ অনিবার্য হোল। এটি, বহুল উচ্চারিত প্রতিষ্ঠালোভের সংঘর্ষ নয়, বরং শ্রেণীগত মতাদর্শের সংঘাত।

৪৭-এর পরবর্তীকালে পূর্ব বাঙলার রাষ্ট্র-ক্ষমতা ও উৎপাদন-সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হোল দেশীয় সামন্ত-প্রতিনিধি ও ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় পশ্চিম পাকিস্তানী সামন্ত ও বৃহৎ বেনিয়া-পুঁজির দ্বারা। পূর্ব বাঙলার সমাজবিকাশ হোল রুদ্ধগতি। সামন্ত শোষণ ও পশ্চিম পাকিস্তানী বড় ধনিক বেনিয়াদের শোষণে ও শিল্পপুঁজির প্রয়োজনে এবং ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের কাঁচামাল ও বাজারের অনুকূলে পূর্ব বাঙলা গড়ে উঠল আধা ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্তবাদী সমাজরূপে। ফলত বিভাগ-পূর্বকালের সামন্ত-আদর্শাশ্রয়ী বুদ্ধিজীবী ও কবিগণ পেল আত্মপ্রতিষ্ঠার ও অস্তিত্ব রক্ষার বাস্তব অবস্থা ও সরকারী আনুকূল্য। পক্ষান্তরে বুর্জোয়া মানবতা-বাদী ও মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও কবিগণের আপস করার সুযোগ থাকলো

সামন্ত বেনিয়া-পুঁজিবাদী শোষণের সহায়করূপে। তাঁদের সামনে ছিল লোভ এবং সরকারী ভীতি।

বিভাগপূর্ব কবিগণ সাহিত্য-আদর্শকে আবিষ্কার করলেন মূলতই সগোত্রীয় দোভাষী পুঁথির মধ্যে। কারণ, দেড়শ' বছরের হিন্দু মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর ক্রমবিকশিত বুর্জোয়া সাহিত্যাদর্শে (তাঁরা মধ্যযুগীয় সামন্ত-সাহিত্যাদর্শ পরিত্যাগ করেছিলেন প্রায় একশো বছর আগেই) সামন্তাশ্রয়ী কবিগণের পক্ষে স্বচ্ছন্দ পদচারণা সম্ভব ছিল না। তাঁদের মুসলিম জাতিভিত্তিক সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ যতটুকু না মুসলিম জীবন-চিত্রণ প্রয়াসজাত তার চেয়ে অধিক ছিল ধর্মগত সাম্প্রদায়িকতা ও শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণ মানসিকতা-জনিত। এই ধর্মগত ধ্যানধারণা সমাজ-জীবনের প্রধান দ্বন্দ্ব-উত্থিত না হওয়ায়, এবং প্রগতিশীল নয় বিধায়, তৎকালের ও বিভাগ পরবর্তী পূর্ব বাঙলার বুর্জোয়া ভাবাদর্শী ও মার্কসবাদী কবিগণ কর্তৃক পাঁচের দশকে হয়েছিল পরিত্যাজ্য।

পক্ষান্তরে আহসান হাবীব, সিকান্দার আবু জাফর, আবুল হোসেন প্রমুখ সমাজ-কাল-জীবনকে তুলনামূলকভাবে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে চিহ্নিত করায় সচেষ্ট হলেন—তাঁদের কাব্যভাবনায়, চিত্রকল্পে, রূপকে, উপমায় আর স্বাতন্ত্র্যকামী কণ্ঠস্বরে। তাঁরা মধ্যবিত্তশ্রেণীর অবশ্যম্ভাবী পরাজয়, সঙ্কট, অবরোধকে উপলব্ধি করেন অন্তরঙ্গ আলোকে। পাকিস্তানের স্বপ্ন তাঁদের উৎসাহিত করেছে, তবে অন্ধ বা মুগ্ধ করেনি। ফলে তাঁরা তিরিশোত্তর কবিগণের অনুভাবনায় ভাবিত হয়ে বাঙলার ক্রমবিকশিত কাব্যাদর্শকে গ্রহণ করেন আত্মপ্রতিক্রিয়ায় রূপান্তরিত করার তাগিদে।

২

পূর্ব বাঙলার পাঁচ দশকের কাব্যঅঙ্গন যাঁদের পদপাতে, কণ্ঠস্বরে মুখর ছিল তাঁরা মধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্তর্গত বুর্জোয়া মানবতাবাদী ও মার্কসবাদী কবি। যেমনঃ আবদুল গণি হাজারী (জন্ম ১৯২৫), আশরাফ সিদ্দিকী (জন্ম ১৯২৬), আবদুর রশীদ খান (জন্ম ১৯২৭), আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্ (জন্ম ১৯৩২), শামসুর রাহমান (জন্ম ১৯২৯), হাসান হাফিজুর রহমান (জন্ম ১৯৩২), আলাউদ্দিন আল আজাদ (জন্ম ১৯৩২), আজীজুল হক (জন্ম ১৯৩২?), সৈয়দ শামসুল হক (জন্ম ১৯৩৪), আবদুস সাত্তার (জন্ম ১৯৩১), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (জন্ম ১৯৩৬), ফজল শাহাবুদ্দীন (জন্ম

১৯৩৬), আল মাহমুদ (জন্ম ১৯৩৬), জিয়া হায়দার (জন্ম ১৯৩৬) প্রমুখ। অবশ্য এঁদের অনেকেরই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে ছয় দশকে। এঁদের যৌথ কাব্য-ভাবনায় বুর্জোয়া মানবতাবাদ, দর্শন, মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিবাদী মন, রোমান্টিকতা স্মৃতিমন্থন, পরাজয়-চেতনা, ভাববাদ-বাস্তববাদের দ্বন্দ্ব, পলায়নী মনোবৃত্তি, আত্মরতি, ইতিহাসজ্ঞান প্রভৃতি প্রকাশ পেয়েছে। এঁরা, সমাজ গঠনগত কারণে, তিরিশোত্তর কবিকুলের জীবন-সঙ্কটের আর্শীতে আত্মরূপ আবিষ্কারে, আত্মীয়তা স্থাপনে সমর্থ হন—ভাবে ও রীতিতে। বস্তুত, বিভাগ পরবর্তী পঞ্চাশের কবিকুল তিরিশোত্তর কবিগণের প্রসারিত রূপ। মান ও ব্যক্তিভেদে এঁরা স্বাতন্ত্র্যকামী নিঃসন্দেহে, যেমন: রাবীন্দ্রিক পরিশীলন ও জীবনানন্দীয় কণ্ঠস্বর সত্ত্বেও শামসুর রাহমান চেতনার চিত্রকল্প ও উপমারূপক নির্মাণে অনেকাংশে স্বাবলম্ব; সমাজপ্রবাহ সত্ত্বেও হাসান হাফিজুর রহমান আত্মাশ্রয়ী, দেশজ উপমা নির্মাণে স্বতন্ত্র; আজাদ আবেগের দ্রুততায়, রোমান্টিক উষ্ণতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা বিষ্ণু দে নন। তবে তিরিশোত্তর কবিদের জীবনাবেগ ও যন্ত্রণার তীব্রতা, এঁদের চৈতন্য-লোকে, বাস্তববিরোধী হওয়ায়, অনুপস্থিত। এঁদের পাঁচদশকী বৈশিষ্ট্য হোল, এঁরা অনেকেই ছিলেন সক্রিয়, সংঘর্ষরত অনুভূতির উপর নির্ভরশীল; জীবন-সংঘাতের গভীর প্রদেশ থেকে বোধ ও চৈতন্যবাহী প্রকাশরীতি, শব্দ, উপমা সংগ্রহে পঞ্চাশের কবিকুল হলেন উৎসাহী; এঁদের আত্মমুখি-তার সঙ্গে বস্তুজগৎ, সমাজ-জীবনের চরম বিধর্মিতা ছিল না। আধা-সামন্ত সমাজে পঞ্চাশের কবিদের চৈতন্যপ্রবাহ (পাঁচ-এর দশক) ছিল প্রগতিশীল, বিকাশ-উন্মুখ; এঁদের কাব্যভাবনা ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াস সমান্তরাল রেখায় বহমান ছিল—উনিশ শ' আটচল্লিশ ও বায়ান্নর পরীক্ষায় তাঁরা উত্তীর্ণও হয়েছিলেন।

বিভাগ-পূর্বকালীন গোলাম মোস্তফা, ফর্‌রুখ আহমদ প্রমুখ কবি পাঁচ-এর দশকে একটা স্বতন্ত্র স্রোত ও আবর্তের অন্তর্গত ছিলেন। উক্ত স্রোত-ধারার একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিভাগ-পরবর্তী অনুগামী মোহাম্মদ মাহফুজ-উল্লাহ্ (জন্ম ১৯৩৬)। পাঁচ-এর দশকে আহসান হাবীব মৃদুকণ্ঠ, স্বল্পপ্রসূ, আত্মভুক, আত্মমুখী। সৈয়দ আলী আহসান দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ হয়েছিলেন, সামন্ত-শ্রেণীর আভিজাত্যবোধের সঙ্গে বুর্জোয়া অহংবোধের সংমিশ্রিত নির্মোক আবিষ্কারে। এই সমকালীনতা অর্জনের অন্তরালে সমাজসত্য নির্মাণের প্রয়াস অপেক্ষা শ্রেণী অস্তিত্ব সার্থকতর করা বা অত্যুজ্জ্বল করার প্রবণতা

অধিক সক্রিয়। অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বুর্জোয়া মানবতাবাদ, রীতিচর্চা অধিকতর নিরাপদ। কর্ম এবং কাব্যধ্যান-এর মধ্যে তাত্ত্বিক পার্থক্য সূচিত করে সিকান্দার আবু জাফর পরিতৃপ্ত। একারণে তাঁর কবিতা উত্তাপহীন; দুর্বল চিত্রকল্প, উপমা রূপক আরোহী এবং রীতিহীন বক্তব্যের যোগফল মাত্র।

পঞ্চাশ-এর কবিগোষ্ঠীর মধ্যে জীবনদর্শন ও চৈতন্যপ্রবাহগত প্রশ্নে দ্বি-স্রোত লক্ষণীয়। একটি বুর্জোয়া মানবতাবাদ—মযহারুল ইসলাম, আশরাফ সিদ্দিকী, শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আবদুস সাত্তার, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ফজল শাহাবুদ্দীন, আল মাহমুদ, আজীজুল হক, আবুবকর সিদ্দিক প্রমুখ এর অন্তর্ভুক্ত। অপরপক্ষে মার্কসবাদী জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত প্রতিবাদী কবিবৃন্দ—আবদুল গণি হাজারী, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দীন আল আজাদ প্রমুখ। এখানে উল্লেখ আবশ্যক যে অর্ধবিকশিত সমাজ-গঠন সৃষ্ট শ্রেণীদ্বন্দ্ব-প্রসূত চৈতন্যপ্রবাহও জটিল হতে বাধ্য। এ পর্বের মানবতাবাদী জীবনাদর্শ যেমন ছিল সামন্ত-বেনিয়া শোষক কর্তৃক ব্যবহৃত হবার প্রবণতাবিশিষ্ট, তেমনি ছিল বুর্জোয়া ব্যক্তিত্বহীন। পক্ষান্তরে মার্কসবাদী জীবনাদর্শেও ছিল মধ্যবিত্তশ্রেণী চরিত্রের নিরাপত্তা প্রত্যাশাজাত দৌর্বল্য, দ্বিধা এবং লক্ষমুখী রোমান্টিক স্বপ্নসাধ। ৫৮-এর আয়ুবী শাসনামলের সূত্রপাতে এবং পরবর্তী দশকে দেখা গেল পঞ্চাশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী কবি-সাহিত্যিক পূর্ব-চরিত্রভ্রষ্ট। শাসকগোষ্ঠী সচেতন বুদ্ধিজীবী কবি সাহিত্যিকদেরকে শৃঙ্খলিত ও বেতনদাসে পরিণত করতে সচেষ্ট হোল রেডিও, টেলিভিশন, প্রেসট্রাস্ট, বি.এন. আর. প্রভৃতির মাধ্যমে। কারণ, **All mass media (Press, Cinema, Radio, TV. etc.) are utilised, for example, by imperialist bourgeoisie to poison the minds of the working people and disarm them idiologically.**

আমূল পরিবর্তন ঘটল মার্কসবাদী কবিবৃন্দের। তাঁরা জীবিকার উন্নতি ও নিরাপত্তার সঙ্গে সৎভাবেই কাব্যভাবনার কাব্যশরীরের রূপান্তর করলেন। কেউ ফ্রয়েডে আশ্রয়ী, কেউ স্বল্পভাষী, কেউবা অক্ষমতার যন্ত্রণাকে সংগোপন করলেন আত্মধিক্কারে, রোমান্টিক বিপন্ন বিলাপে, ব্যঙ্গ বিদ্রূপে। মানবতা–

বাদী শ্রেণী আক্রান্ত হলেন অংশত, কারণ অশক্ত বুর্জোয়া মানবতাবাদ যতখানি বর্ণচোরা, ততোধিক নিরাপদ। এঁদের অধিকাংশই হলেন আত্ম-রোমন্থনে তুষ্ট, হাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী, জ্বলন্ত কল্পলোকের জতুগৃহে যন্ত্রণাবিদ্ধ, বিদ্রূপে, উৎসাহী, ঐতিহ্যলোকের পুনর্নির্মাণে অতিব্যস্ত, ক্রম-বিকাশে শঙ্কাগ্রস্ত, দেহবাদীপঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এ কথা নিঃসন্দেহ, একালেও এঁদের ব্যবহৃত বিচ্ছিন্ন উপমা, রূপক, প্রতীক, চিত্রকল্প, ছন্দ-পরীক্ষার ফলাফল, শব্দরূপ প্রভৃতি পূর্ব বাঙলার কাব্যসাহিত্যে যৌথ সংযোজন।

৪

ছয় দশকে যেসব কবি আবির্ভূত হলেন, বস্তুতই তাঁদের সম্মুখে ছিল বন্দীমুহূর্ত, অলংঘ দেয়াল, অবরুদ্ধ সমাজচেতনা ও জটিলতম সমাজগঠন। পঞ্চাশ-এর শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী স্ফীত হয়েছে দ্বিগুণ। অথচ রয়েছে কেবল অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, বেকারত্বের সঙ্কট আর রাষ্ট্রনৈতিক অনধি-কার। স্বাধীন (বুর্জোয়া স্বাধীনতা) চিন্তাক্ষমতা হয়েছে লুণ্ঠিত, ফলত তাঁদের জীবন হোল বন্দীপ্রহরের যোগফল। অগ্রজ কবিগণের চলার পথে সংঘর্ষ-উপক্রুত পদক্ষেপের চিহ্ন নেই; তাঁরা প্রতিষ্ঠিত, নিরাপদ আশ্রয়ে আসীন। একালের কবিদের মানসচক্ষের হেডলাইটে উদ্ভাসিত হয়েছে—সুউচ্চ প্রাচীর, অকালরূপী হত্যাকারী আর সুবিধাভোগী পরিতৃপ্ত মুখচ্ছবি।

আয়ুব খানের শাসনামলে পূর্ব বাঙলার সামন্তশ্রেণী নবরূপে বিন্যস্ত হোল, জাতিগত শোষণের প্রয়োজনে। অখণ্ড পাকিস্তানের শ্লোগান, পরাজিত-প্রায় ধ্যানধারণা, ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা হল পুনর্জীবিত। ফলত, বিভাগ পূর্বকালীন সামন্ত-আশ্রয়ী বিদায়ী প্রতিভাগুলো সুবিধাকামী অনুচরসহ হোল মঞ্চে অবতীর্ণ। পূর্বেই বলেছি, ইতিমধ্যে, অধিকাংশ মানবতাবাদী ও বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক বিকারসহ ও নির্বিকারে বেতনদাসে রূপান্তরিত ও বিচিত্র লোভের শিকারে পরিণত। বুর্জোয়া রাজনীতি ড্রয়িংরুমবাসী; বামপন্থী আন্দোলন বহুধা-খণ্ডিত, সিদ্ধান্ত আর তত্ত্ব গবেষণায় নেতৃবর্গ তখন ব্যস্ত। এবং স্ফীতকায় মধ্যবিত্তশ্রেণীর অস্তিত্ব-অহংকার সঙ্কটাপন্ন। এই প্রেক্ষিতে ছয়-এর দশকের নতুন কবিবৃন্দ—শহীদ কাদরী, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, হায়াৎ মামুদ, আফজাল চৌধুরী, রফিক আজাদ, মোহাম্মদ রফিক, সাযযাদ কাদির, নির্মলেন্দু গুণ,

আবুল হাসান প্রমুখের আবির্ভাব। অনেকাংশে এ দশক তাঁদের উন্মেষ ও প্রতিষ্ঠার কালও বটে।

স্বকালকে আত্মস্থ ও বিচার করার অবকাশ তাঁদের ছিল না বললেও চলে। এদেশে বিজ্ঞান আছে, বিজ্ঞানে বিশ্বাস নেই; ধর্ম আছে, তা বহু ব্যবহৃত; রাষ্ট্র আছে, রাষ্ট্রনীতি নেই; আদর্শ আছে অথচ কর্মযোগ নেই। ফলত অন্ধকার আচ্ছাদিত দৃষ্টিতে তাঁরা কাল-সমাজ-জীবনকে দেখলেন। এ দশকের কবিকুলকে তাই 'জন্মান্ধ' বলা অসার্থক নয়। এঁরা তিরিশোত্তরের কাব্যভাবনায় বীতশ্রদ্ধ, স্বভাবতই পঞ্চাশ-এর কবিবর্গের প্রতি অবিশ্বাসী। গত দু' দশকের সমাজ পার্থক্য অগ্রজ কবিগণ চিনতে অক্ষম হলেও, এঁরা অভিজ্ঞতার যন্ত্রণায় তা আবিষ্কারে ছিলেন সক্ষম। তিরিশোত্তর কবিদের সাহিত্যাদর্শ ও বক্তব্য এবং পঞ্চাশ-এর পূর্ব বাঙলার কবিগণের বক্তব্যরীতিকে অস্বীকার করে এঁরা, ছয় দশকের কবিগণ, হস্ত প্রসারণ করলেন সমকালীন পশ্চিমবঙ্গজ সাহিত্যভাবনায় এবং ইউরোপীয় কাব্যভাণ্ডারে।

তাঁদের দৃষ্টি ও মন সংযুক্ত হোল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অবক্ষয়িত ইউরোপীয় মধ্যবিত্ত ও পেটিবুর্জোয়া **intellectual**-দের ব্যক্তি প্রতিক্রিয়াজাত কাব্যভাবনা ও শিল্পরীতিতে। **Formalism**-এর কয়েকটি শাখা **Dadaism, Expressionism, Existentialism** এ প্রসঙ্গে প্রধানত উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত সাহিত্য-শিল্পাদর্শগুলি ব্যক্তিপ্রতিক্রিয়ার শর্তসাপেক্ষ একান্ত সৃষ্টিফল। **Formalism**-এ চৈতন্যই **A priori**; তাঁদের বক্তব্য: **We must forget all laws.. only our soul is the true reflection of the world**। যন্ত্রের অংশরূপে মানুষদেহ হোল কল্পিত; ব্যক্তি-অস্তিত্বের বিরোধী হিসেবে সমাজ চিত্রিত এবং বস্তুজগৎ হোল নির্বাসিত। তাঁরা প্রচলিত চিত্রকল্প, রূপক,-উপমা ভেঙেচুরে রূপান্তর করলেন শূন্যপৃষ্ঠায়, বিন্দু, রেখায় আর একান্ত আত্মগত কল্পচিত্রে। স্বাভাবিকতার স্থান অধিকার করলো ভীতি, দুঃস্বপ্ন, কার্যকারণহীনতা, উত্তেজনা আর রিরংসা। ইউরোপীয় পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর উপরোক্ত সাহিত্যাদর্শ হোল ধ্বংসোন্মুখ বুর্জোয়া সমাজের প্রতিক্রিয়া-সৃষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল ভাববাদী জীবনদর্শন। পক্ষান্তরে, পূর্ব বাঙলার সমাজ-সংগঠন অর্ধসামন্ত, অর্ধ ঔপনিবেশিক। বস্তুত, পূর্ব বাঙলার ছয় দশক পুঁজিবাদীদের শক্তিসঞ্চয়ের গুপ্ত প্রস্তুতিকাল, আর ইউরোপে তা পতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে।

সুতরাং অসম সমাজের দুই আদর্শপ্রান্তে জীবনের জ্যা পরাতে অগ্রসর হলেন ছয় দশকের কবিগণ।

একালের কবিগণের কাছে, স্বভাবতই, ব্যক্তিচৈতন্যপ্রবাহ অধিকতর শ্রদ্ধাবহ, সমাজ শত্রু, প্রতিপক্ষ। রাজনীতি ঘৃণ্য, কল্যাণ পরিত্যাজ্য; প্রেম প্রহসন আর রিরংসার যোগফল। একালের কবিবর্গের প্রধান লক্ষণ অন্তর্মুখিতা নয়, আত্মসর্বস্বতা; প্রচলিত সবকিছুকে অবজ্ঞা করার প্রবণতা; এবং জীবন নামক শত্রুকে নির্বাসিত করার অক্লান্ত প্রয়াস। রীতি, মগ্ন চিত্রকল্প, বিচূর্ণিত উপমা-রূপক আর ছন্দের যথেচ্ছ প্রয়োগ এঁদের অন্বিষ্ট। তবুও, বলা প্রয়োজন ছয়-দশকের কবিগণ বীততিরিশ নন, তিরিশোত্তরের উৎস থেকে এঁরাও উৎসারিত; কারণ অনুরূপ সমাজ সংগঠনে ভিন্নরূপ চৈতন্য সৃষ্টি করার সর্বভুক প্রতিভার পরিচয় এঁদের কেউই প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি। পাঁচ-এর দশকের কবিবৃন্দ যে-অবক্ষয়-চৈতন্যকে সমাজ-জীবনের অন্তর্লোকে প্রত্যক্ষকরণে ছিলেন সচেষ্ট, ছয়দশকের এঁরা আত্মমগ্ন-চৈতন্য-অন্ধকারে তাকে করেন উপহাস ও পরীক্ষা। এঁরা আত্মভুক চেতনা বিলাসী; বিকৃত সমাজ-গঠনের চারদেয়ালে শৃঙ্খলিত, শর্ত-সাপেক্ষ, ব্যক্তিপ্রতিক্রিয়াবাদী। এই চৈতন্যসামগ্রীই এ-পর্বের কবিদের গৌরব এবং দৌর্বল্য। জলস্তম্ভের মত উর্ধ্বগামী কোন প্রতিভা শর্তমুক্ত সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়ে রুদ্ধ অবক্ষয়, অচলতাকে চাবুকাঘাত করে তাকে সচল করেননি। এমন কি আলোক-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কার্যকারণের সন্ধানেও তাঁদের ছিল অনীহা। পূর্ব বাঙলার পাঁচ দশকের কবিবর্গ একালে ছিলেন সত্যান্ধ, আর ছয় দশকের কবিকুল হলেন, বলা চলে, জন্মান্ধ। বস্তুত আবদুল মান্নান সৈয়দ থেকে নির্মলেন্দু গুণের কাব্যশরীর ডিকেডী নশ্বর বিক্ষত; এই বিক্ষত, পচনশীল, ভ্রান্তি-বিলাসী অথচ নির্মম পরিতৃপ্ত মুখচ্ছবিই—আমাদের সযত্ন-লালিত আত্মরূপ। পঞ্চাশ-এর এবং ছয় দশকের কবিবর্গের যৌথ কাব্যভাবনা, চেতনাপ্রবাহ ও জীবনদর্শনে এবং তাঁদের চিত্রকল্প-উপমা-রূপক-প্রতীক নির্মাণের অস্থিরতায়, অবজ্ঞায়, অবিশ্বাসে, অভিনবত্বে আমাদের বন্দীচেতনা-স্রোত বিধৃত; ওঁদের বোধ-বোধি-চেতনা-লোক আমাদের উৎপীড়িত বিবেক, অক্ষমতার আর্তনাদ, সত্যান্ধের বিবেকী ধিক্কার, জন্মান্ধের আত্মমুক্তির ক্রমিক পরিণাম।

১৯৭০

মনসুর মুসা

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। এ প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চরম নৈরাশ্য প্রকাশ করেছেন। তিনি দূর ভবিষ্যতের কথা ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র ২০০১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মর্যাদা কিরূপ হবে তার আলোচনা করেছেন। বিশী মহোদয় গণতন্ত্র ও শিক্ষাগত প্রেক্ষাপট বিচার করে বলেছেন—"গণতন্ত্রের ভিত্তি উদার শিক্ষা, রবীন্দ্র-সাহিত্যেরও ভিত্তি উদার শিক্ষা; গণতন্ত্রের ভিত্তি ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্র-সাহিত্যেরও ভিত্তি ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য; গণতন্ত্র ও রবীন্দ্র-সাহিত্য দুই-ই একটি সর্বাঙ্গীণ ও পূর্ণ জীবনোপলব্ধির সাধনায় নিযুক্ত; জীবন সম্বন্ধে দুয়েরই ধারণা ও মূল্যবোধ সমান। কোনো একনায়কতন্ত্রের দেশে রবীন্দ্র-সাহিত্য যেমন সম্ভব নয়, তেমনি গণতন্ত্র লোপ পাইলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্য ও মর্যাদার হানিও অনিবার্য।" এরপর তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে ভারতে এখন গণতন্ত্র ও উদার শিক্ষার মূল উচ্ছিন্ন হতে চলেছে; যন্ত্রশিক্ষার প্রসার ঘটছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০০১ খ্রীষ্টাব্দের দিকে যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে তাতে শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, অন্যান্য ভারতীয় সাধক-দের জীবনোপলব্ধির সাধনাও নিরর্থক বোধ হবে। তারপর তিনি হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছেন—'সেদিন নিঃসন্দেহে আমাদের বৈষয়িক উন্নতি হইবে, কিন্তু সেই বৈষয়িক উন্নতির পিরামিড-শিখর হইতে কোন্ জীবন-দৃশ্য আমাদের চোখে পড়িবে? পিরামিড শিখরে উঠিলে তো চোখে পড়ে চতুর্দিক-ব্যাপী মরুভূমি—নীরস, দুস্তর, বন্ধুর ও অনিঃশেষ।'

প্রমথনাথ বিশী নির্বোধ নন; তিনি যুগের ঐতিহাসিক ধারার পরি-ণতিটি মোটামুটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

যে অন্ধকার এবং বুর্জোয়া উদার শিক্ষার দিন যে শেষ হয়ে এসেছে, এটা তিনি ভালভাবেই টের পেয়েছেন। এবং সেজন্য অন্যান্য অনেক রবীন্দ্র অন্ধ-ভক্তদের মতো বলেননি যে রবীন্দ্র-সাহিত্য কালজয়ী, বিশ্বজয়ী, চিরন্তন। সত্যনিষ্ঠ বিশী মহোদয় সত্যের খাতিরে যদিও স্বীকার করেছেন যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়, বরং অন্ধকার তবুও তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ দুর্দশার কথা চিন্তা করে মন খারাপ না করে পারেননি। এর কারণ কি? কেন তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্ধকার ভবিষ্যতকে সানন্দে বরণ করে নিতে পারেননি? ২০০১ খ্রীষ্টাব্দে অবশ্যই আমরা সাহিত্য সাধনা ত্যাগ করবো না। তখন হয়তো রবীন্দ্রনাথ বা ফর্‌রুখ আহমদ কেউ থাকবে না, তবে অবশ্যই কালু কর্মকার আর লাল মিয়া মিস্ত্রী সাহিত্য-সাধনা করবে এবং অবশ্যই তখনকার হরিপদ কেরানীরা এদের কবিতা গল্প উপন্যাস রসাপ্লুত হৃদয়ে পাঠ করে যাবে। এদের সাহিত্য পাঠে কি বিশী মহোদয়ের অনীহা? কেন? তাহলে অনেক কথা বলতে হয়।

বিশী মহোদয়ের 'গণতন্ত্র ও উদার শিক্ষা' যে বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও উদার-শিক্ষা এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতে যে সেই তথাকথিত গণতন্ত্রের নাভিশ্বাস উঠছে এবং সেই ঔপনিবেশিক উদার শিক্ষার অনুদারতা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠছে এতেও কোনো সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, বিশ্বের অসংখ্য নিপীড়িত জনগণ যে এই তথাকথিত গণতন্ত্র ও উদার শিক্ষার অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম চালাচ্ছে, তাও সন্দেহাতীত। বিশী মহোদয় ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য বলে একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন। শব্দটার অর্থ কি ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য? ইংরাজীর **Individuality**? যাকে অন্য কথায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বলে অনুবাদ করা হয়? তাই যদি হয় তাহলে এ সম্পর্কে আগে আলোচনা করা দরকার।

আমরা জানি প্রত্যেক মানুষ একজন অপর জন থেকে কতকগুলো ব্যাপারে পৃথক। কোনো মানুষই কোনো মানুষের প্রতিরূপ নয়; কোনো কালেই ছিল না, কোনো দেশেই ছিলো না, এখনো নেই: সমাজতান্ত্রিক কিংবা ধনতান্ত্রিক কোনো দেশেই না। আর কতকগুলো হচ্ছে শর্তশূন্য মৌলিক মানবত্ব; এগুলো অপরিবর্তনীয়। যেমন মৌলিক ইন্দ্রিয়ানুভূতি সবদেশের সব মানুষের এক রকম। কিন্তু মানুষের চিন্তাধারা, ভাবমানস, রুচি,

ধারণা অর্থাৎ গৃহীত জ্ঞান সম্পর্কিত মানসিক প্রতিক্রিয়া এক রকম নয়; সামাজিক শর্ত বা উপরিকাঠামোর শর্ত প্রতিফলন মাত্র। তাই গৃহীত জ্ঞান সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়া সামাজিক শর্তাবলীর প্রকৃতি-ভেদে বিচিত্র হতে বাধ্য। তাহলে এখন আমরা এ কথা বলতে পারি যে সামাজিক শর্তা–বলীই আমাদের রুচি, ধারণা, চেতনা অর্থাৎ সমগ্র ভাবমানস গঠন করে।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, যে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে আমরা শর্তায়িত আছি, সেখানে রবীন্দ্র-সাহিত্য সর্বোৎকৃষ্ট জিনিস। কিন্তু ভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে তা সর্বোৎকৃষ্ট না হয়ে বরং অস্পৃশ্য ও বিপজ্জনক বলে পরিগণিত হতে পারে। এতে দুঃখ করার কি আছে। আমাদের কাছে মানবজীবন সবচেয়ে মূল্যবান। আমরা মানবজীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারি না। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্য না পড়লেও পারি। আমাদের দেশের যে শর্তায়িত যুগে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিকাশ ও প্রয়োজন, সে শর্তা–য়িত যুগের যদি অবসান ঐতিহাসিক কারণে অনিবার্য হয়, তবে রবীন্দ্র-সাহিত্যেরও অবসান অনিবার্য ধরতে হবে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের উত্তপ্ত আবহাওয়ায়, আর্জেন্টিনার সেই সংবেদনশীল মেয়ে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর অশান্ত-অস্থির মনে গীতাঞ্জলির সুশান্ত-প্রশান্তি যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলো, আজকের পিকিং-এর কোনো লাল প্রহরিণীর আদর্শ-কঠিন সামরিক-চিত্তে সে-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে কি? নিশ্চয়ই করবে না। তাই, অনিবার্য প্রয়োজন মানবজীবনের সমুন্নতির সহায়ক হলে তাকে বরণ করতে দ্বিধা করবো কেন? রবীন্দ্র-সাহিত্যকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে আমরা নতুন শর্তের উদ্বন্ধনে ধরা দেবো।

তাহলে বিশী মহোদয়ের দুঃখ কেন? কেন এ নৈরাশ্যের বেদনা প্রকাশ? সেটা রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্ধকার ভবিষ্যতের জন্য, নাকি বিশী মহোদয় যে শ্রেণীর সদস্য তার অন্ধকার ভবিষ্যতের জন্য? তিনি বুর্জোয়া পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক দেশের অধিবাসী, অধিবিদ্যক ও ভাববাদী ভাবধারায় তাঁর ভাবমানস সমাচ্ছন্ন, শ্রেণী-সংগ্রামে কণ্টকিত আর্থিক অবস্থায় তিনি শর্তায়িত, কলাকৈবল্যবাদের বুর্জোয়া শ্রেণীর ভাবধারায় তিনি পুষ্ট। এ সব শর্তের বন্ধন তাঁর পক্ষে ছিন্ন করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্র-সাহিত্য তাঁর ভাব-মানসের এ সব শর্তায়িত তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি সাধন করে, তাঁকে পরিতুষ্ট করে, তাঁর শ্রেণীস্বার্থ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও সামাজিক স্বার্থ যথাযথভাবে

রক্ষা করে। এ সাহিত্য তাঁর চেতনায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই এর উষর, নীরস অন্ধকার পরিণতি তাঁর মনে দুর্বহ বেদনা জাগাবে, এটাই স্বাভাবিক। এটা তাঁর অবস্থানগত স্বার্থের অনুকূল নয়, প্রতিকূল। তাই তাঁর এ আর্তনাদ। এটা তাঁর একার আর্তনাদ নয়, তাঁর মতো শর্তায়িত অবস্থায় বিদ্যমান আরো বহুজনের আর্তনাদ।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার আগে তাঁর সমকালীন প্রেক্ষাপটটি আগে জানা উচিত। রবীন্দ্রনাথেব জীবনকাল ১৮৬১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সময়ে ভারতবর্ষে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। তখন কোম্পানী আমল শেষ হয়ে ভারতে পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী শাসন চালু হয়েছে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী-বিপ্লবের মতো ব্যাপক আন্দো-লন হয়ে গেছে। দেশের ব্যাপক জনগণের সাথে শাসক-শ্রেণীর বিরোধ তীব্রতর হযে দেখা দিয়েছে। নীল-বিদ্রোহ, কৃষক-বিদ্রোহ, ফকির-বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, সাঁওতাল-বিদ্রোহ, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, ওহাবী আন্দো-লন ইত্যাকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অসন্তোষ প্রবল হয়ে উঠেছে। আর এ সব গণ-অসন্তোষ দমন করার জন্য বৃটিশ সরকার তার সাম্রাজ্যবাদী হিংস্র রূপ ধারণ করেছে। প্রথম দিকে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে এ দেশের লোকের মনে যে মোহ ছিলো তা ভেঙে গেছে। বৃটিশ শাসনের নিগড় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এ দেশের বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়ারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। ফরাসী-বিপ্লবের মুক্তিমন্ত্র তারা পেয়ে-ছিলো ইউরোপের সাথে নব পরিচয়-সূত্রে। এই মন্ত্র তাদের উদ্বুদ্ধ করে-ছিলো স্বাজাত্যবোধ ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের মন্ত্রে। অন্যদিকে ১৯০৫ এর রুশ-বিপ্লব, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তাদের মনে যুগিয়েছে পরিবর্তন-প্রেরণা। রাজনৈতিক দিক থেকে এ যুগটি ইংরেজ-বিরোধিতার যুগ হলেও, সাংস্কৃতিক দিক থেকে ছিল ঠিক এর উল্টো। এ যুগে ইউরোপীয় রেনেসাঁস-উদ্ভূত বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধের অনুশীলন হয়েছিল পূর্ণমাত্রায়। সাহিত্য-বিচারের প্রধান মানদণ্ড ছিলো কলাকৈবল্যবাদ; দার্শনিক চিন্তার মূল কেন্দ্র ছিলো ভাববাদ; যুক্তির ভিত্তি ছিলো অধিবিদ্যা। তাই রবীন্দ্রনাথের সমকালীন যুগমানসে একটি বিরাট দ্বন্দ্ব ছিলো। এই দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথকেও মুক্তি দেয়নি। ফলে তিনি ইংরেজ শাসনকে অপছন্দ করলেও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবকে অপছন্দ করতে পারেননি।

দুর্ভাগ্যবশত রবীন্দ্রনাথ এ দেশের শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সবচেয়ে উঁচু তলার মানুষ ছিলেন। তাঁর সমস্ত পারিবারিক পরিবেশ তাঁকে এদেশের ব্যাপক গণজীবন থেকে বহু পরিমাণে দূরে সরিয়ে রেখেছিলো। উপনিবেশিক সামন্ত পরিবেশের উদারতা ও সীমাবদ্ধতা দুটোই তাঁর ছিলো। তাই তিনি সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, দেশপ্রেমের বাণী প্রচার করেছেন, দেশের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেছেন কিন্তু শক্তি প্রয়োগ করে সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে উৎখাত করার কথা চিন্তা করেননি। বরং অনুরূপ প্রচেষ্টার মধ্যে পশু-শক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করে, তার বিরোধিতা করেছেন। সোজা কথায় তিনি পরিবর্তন চেয়েছেন, কিন্তু পরিবর্তন করেননি। বৃটিশ শাসকচক্রের অত্যাচার জুলুমের প্রতিবাদে তিনি পদবী ত্যাগ করেছেন, প্রতিবাদমূলক টেলিগ্রাম করেছেন, মহত্ত্বের দোহাই সহ ধ্বংসের অভিশাপ দিয়েছেন কিন্তু পরিবর্তনের বাস্তবকর্মে যোগদান করেছেন কি? তাঁর দেশপ্রেম ছিলো বুদ্ধিগ্রাহ্য, আবেগহীন। তাই নিয়মতান্ত্রিক শান্তির পথ তিনি চেয়েছেন—যে পথে মুক্তি কখনো আসে না। কারণ 'কসাই কখনো স্বেচ্ছায় তার ঘাতকের তলোয়ার ত্যাগ করে না।' তাই বুর্জোয়া মনোভঙ্গিপ্রসূত 'শান্তির ললিত' বাণীর পরিহাসই তিনি চিরদিন করেছেন। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন যুগে পারিবারিক, পারিপার্শ্বিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ, তাই এ দেশের লোকের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি তাঁর সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন বটে কিন্তু সে সাড়ায় ব্যাপক জনগণের সংগে একাত্ম হয়ে যাওয়ার উদগ্র কামনার আন্তরিকতা ছিলো কি? বোঝা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের একটি বিরাট অংশ বহির্বিশ্বে কাটিয়েছেন; হিমালয়ে কাটিয়েছেন; পদ্মা নদীতে কাটিয়েছেন; ইছামতি—শিলাইদহে কাটিয়েছেন। কিন্তু তিনি কোনোদিন সচেতন কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে নিজের সামন্তযুগীয় বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে এসে লক্ষ্য করেননি এ দেশের ব্যাপক জনগণের দৈনন্দিন জীবনের অলিগলিগুলো কি রকম? অনেকে অসহিষ্ণু হয়ে বলবেন: এসবের কি প্রয়োজন? তাঁর তো কোনো দরকার ছিলো না? হাঁ, দরকার ছিল না ঠিকই। এবং দরকার যে ছিল না, এই অপ্রয়োজনই রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সীমাবদ্ধতা, তাঁর সাহিত্যের সীমাবদ্ধতা।

উপনিষদের ভাববাদী অধিবিদ্যক ধারণা রবীন্দ্রনাথের ঘাড়ে ভূতের মতো চেপে বসেছিলো; তাই তাঁর স্বাজাত্যবোধ ও দেশপ্রেমের মধ্যেও এই

পূর্ণজাগরণের চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর শান্তিনিকেতন পরিকল্পনায়ও তাই লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের মৌলিক আবিষ্কার-গুলোর খোঁজ খবর জানতেন কিন্তু তাঁর সে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কোথাও তাঁর ভাববাদী অধিবিদ্যক ধারণাকে আঘাত করতে পারেনি। মার্ক্সের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সংগে তিনি হয়ত পরিচিত ছিলেন কিন্তু এ মতবাদ তাঁর ভাবমানসে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলো তা জানা যায় না।

তাই বিশীর মনে প্রশ্ন জেগেছে ভাববাদী, অধিবিদ্যক বুর্জোয়া বুদ্ধি-জীবী এবং কলাকৈবল্যবাদী রবীন্দ্রনাথ বস্তুবাদী নিরীশ্বর সর্বহারা জীবন-বাদী যুগে কি ভাবে গৃহীত হবেন? সজীব চেতনার মূর্ত প্রতীক হিসেবে? নাকি মৃতবাসী চেতনার নিদর্শন হিসেবে?

এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথের সমকালে ও তাঁর পরবর্তী-কালে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অবস্থা কি রকম ছিলো তার হদিশ নেওয়া দরকার। রবীন্দ্রযুগেও রবীন্দ্র-সাহিত্য সর্বজন সমাদৃত ছিলো না। কারণ কোনো সাহিত্যই সর্বজনের মনোরঞ্জনে সক্ষম হয় না। রবীন্দ্র-সাহিত্যও সক্ষম হয়নি। রবীন্দ্রযুগে যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিশারদ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্র লাল, সুরেশ সমাজপতি, বিপিনচন্দ্র পাল, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রধান। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের প্রধান প্রধান অভিযোগ ছিলো রবীন্দ্র-কাব্যে অস্পষ্টতা, রবীন্দ্র-সাহিত্যে দুর্নীতি, এর বস্তুতন্ত্রহীনতা-অতিরিক্ত বিদেশী ভাব ও খাঁটি বাঙলার প্রাণস্পন্দনহীনতা। সেদিন রবীন্দ্র-নাথের পক্ষে দাঁড়িয়ে যাঁরা এ অভিযোগ খণ্ডন করে রবীন্দ্রকাব্যের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ, প্রিয়নাথ সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মোহিতচন্দ্র সেন, শশাঙ্কমোহন সেন, যদুনাথ সরকার, অজিত চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী ও আরো অনেকে। যাঁরা রবীন্দ্র-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের কেউবা রক্ষণশীল দৃষ্টি ভঙ্গীর জন্য, কেউবা সামাজিক কারণে, কেউবা রাজনৈতিক কারণে আর কেউবা ব্যক্তিগত কারণে এ সব অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। যাঁরা প্রশংসা করেছিলেন তাঁরা কেউবা কলাকৈবল্যবাদের সমর্থনে, কেউবা রোমান্টিকতার সমর্থনে, কেউবা আত্মীয়-তার কারণে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। বস্তুত তাঁদের এই বিপ-

রীতিমুখী আলোচনার মধ্যে বুর্জোয়া ঔপনিবেশিক সমাজের মূল্যবোধের ক্ষেত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশই লক্ষ্য করা যায়।

যাঁরা মার্ক্সবাদী সমালোচক বলে কথিত তাঁদের একজনের মন্তব্য ছিলো রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাঁদের শ্রেণীস্বার্থে, তাই নতুন সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রতিক্রিয়াশীলতার অজুহাতে পরিত্যাজ্য। কেউবা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ আর যা-ই হোন, ঠিক প্রতিক্রিয়াশীল নন। তাঁকে বাদ দিলে বাঙালী সংস্কৃতির অঙ্গহানি ঘটবে। আবার কেউবা বলেছেন রবীন্দ্রনাথকে প্রগতিশীল বলা এক ধরনের সুবিধাবাদ। রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে', 'ওরা কাজ করে', 'রাশিয়ার চিঠি' প্রভৃতি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কেউ কেউ তাঁকে মার্ক্সবাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। এমন কি ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হওয়া'র মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যার মতো অদ্ভুত হাস্যকর বিশ্লেষণও কেউ কেউ দিয়েছেন। মার্ক্সবাদীদের আলোচনায় দেখা যায় কেউবা মার্ক্সবাদের আলোকে রবীন্দ্রনাথকে সর্বদা বর্জনীয় মনে করেছেন। আর কেউবা কোনো কোনো রচনার উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁকে সর্বদা গ্রহণীয় মনে করেছেন। কেউবা তাঁকে মার্ক্সবাদের কল্পিত ব্যাখ্যা দিয়ে প্রগতির পরিপন্থী নয় ভেবেছেন। এই মতভেদও একদিক থেকে বুর্জোয়া সমাজ-চিন্তার বিশৃঙ্খলারই পরিচায়ক।

অজিত চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথে' যে ভাববাদী সমালোচনার শুরু হয়েছিলো তা এসে ঠেকলো প্রমথনাথ বিশীতে; আর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের হাতে যে বস্তুতান্ত্রিক সমালোচনার শুরু হয়েছিলো তার পরিণতি দেখা গেলো গুণময় মান্নার রবীন্দ্রকাব্যের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে। আর রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনায় এই সব আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক সমালোচনার ইতিহাস পর্যালোচনা করে আদিত্য ওহাদ্দেদার মন্তব্য করেছেন: 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রকৃত সমালোচনা এখনো শুরুই হয়নি। কখন কিভাবে শুরু হবে তা অবশ্য তিনি উল্লেখ করেননি।

শুধু রবীন্দ্র-সাহিত্য নয়, রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও দু' ধরনের মনোভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের সমকালীন যুগে লক্ষ্য করা গেছে। সুরেশ সমাজপতি আর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখের উক্তি এমনকি অনেক সময় ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করে বিদ্বেষের পর্যায়েও নেমে গেছে। আমরা এখানে নজরুলের একটি অভিমানক্ষুব্ধ বক্তব্য তুলে দিচ্ছি—"ওঁর (রবীন্দ্রনাথের) আমাদের উদ্দেশ্য

করে আজকালকার লেখাগুলোর সুর শুনে মনে হয়, আমাদের অভিশপ্ত জীবনের দারিদ্র্য নিয়েও যেন তিনি বিদ্রূপ করতে শুরু করেছেন।

আমাদের এই দুঃখকে কৃত্রিম বলে সন্দেহ করবার প্রচুর ঐশ্বর্য তাঁর আছে জানি। এবং এও জানি তিনি জগতের সবচেয়ে বড় দুঃখ ঐ দারিদ্র্য ব্যতীত হয়ত আর সব দুঃখের সাথেই অল্পবিস্তব পরিচিত। তাই এতে ব্যথা পেলেও রাগ করিনি।

কি ভীষণ দারিদ্র্যের সংগে সংগ্রাম করে অনশন অর্ধাশনে দিন কাটিয়ে আমাদের নতুন লেখকদের বেঁচে থাকতে হয়—লক্ষ্মীর কৃপায় কবিগুরুর তা জানা নেই। ভগবান করুন, তাঁকে যেন জানতে না হয়। কবিগুরু কোন দিন আমাদের মত সাহিত্যিকের কুটিরে পদার্পণ করেননি—হয়ত তাঁর মহিমা ক্ষুণ্ণ হত না তাতে—নৈলে দেখতে পেতেন, আমাদের জীবন-যাত্রার দৈন্য কত ভীষণ। এই দীন মলিন বেশ নিয়ে আমরা আছি দেশের একটেরে আত্মগোপন করে। দেশে দেশে প্রোপাগাণ্ডা করা ত দূরের কথা, বাড়ী ছেড়ে পথে দাঁড়াতে লজ্জা করে। কিছুতেই ছেঁড়া জামার তালি-গুলোকে লুকাতে পারি নে। ভদ্র শিক্ষিতদের মাঝে বসে সর্বদাই মন খুঁত-খুঁত করে, যেন কত বড় অপরাধ করে ফেলেছি। বাইরের দৈন্য অভাব যত ভিতবে ভিতরে চাবকাতে থাকে, তত মনটা বিদ্রোহী হযে উঠতে থাকে......।

তাঁর কাছে নিবেদন, তিনি যত ইচ্ছা বাণ নিক্ষেপ করুন, তা হয়ত সইবে, কিন্তু আমাদের একান্ত আপনার এই দারিদ্র্য যন্ত্রণাকে উপহাস করে যেন আর কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটে না দেন। শুধু এ নির্মমতাই সইবে না।" নজরুলের এ অভিযোগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আরো অনেকে প্রকাশ করেছেন। নজরুলের রচনাব জবাবে প্রমথ চৌধুরী বঙ্গ সাহিত্যে 'খুনের মামলা' লেখেন। তাতে 'খুন' শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পক্ষ-সমর্থন করে নজরুলের অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করা হয় বটে কিন্তু অন্যান্য অভিযোগ সম্পর্কে তিনি নির্বাক ছিলেন।

অন্যদিকে রবীন্দ্র-পার্শ্বচরেরা কবি রবীন্দ্রনাথকে 'রবি কবি' 'কবীন্দ্র রবীন্দ্র', 'কবিগুরু' এবং শেষ পর্যন্ত 'ঋষি' রবীন্দ্রনাথ করে তুলেছেন।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরুদ্ধে কল্লোলগোষ্ঠীর বিদ্রোহ ও অভক্তি বিষ্ণু দে'র সেই বহু পরিচিত পংক্তি ক'টিতে প্রকাশ পেয়েছেঃ

> "রবীন্দ্র ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
> চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধি না, বরং

আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, গানে গানে নেমে
সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দিই রেখা আর রং
সদাই নূতন চিত্রে গল্পে কাব্যে হাজার ছন্দের
রুদ্ধ উৎসে খুঁজে পাই খরস্রোত নব আনন্দের।"

এতে বোঝা যায় সমকালীন যুগে কিংবা পরবর্তী যুগে রবীন্দ্র-সাহিত্য সর্বত্র সমভাবে গৃহীত হয়নি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরুদ্ধে একটি সাম্প্রদায়িক অভিযোগও ছিলো। মুসলমানেরা অভিযোগ করেছিলো রবীন্দ্র-সাহিত্যে মুসলমান নেই। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'তাদের সম্পর্কে জানিনে, তাই লিখিনে।' এ উত্তর দিয়ে তিনি আত্মরক্ষা করেছিলেন বটে কিন্তু শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেননি।

সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পর রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে নতুন অভিযোগ ও অভিযোগ-খণ্ডনের প্রয়াস দেখা যায়। দেশের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণমনা গোঁড়া 'বিক্ষুব্ধ মুসলমানেরা' বলেছে—রবীন্দ্রনাথ মুসলমান বিদ্বেষী; প্রমাণ 'শিবাজী-উৎসব' ও 'হিন্দুমেলা'। তাই রবীন্দ্র-সাহিত্য পাকিস্তানের আদর্শের পবিপন্থী। এ সাহিত্য হিন্দুর জন্য হিন্দুর রচিত সাহিত্য; তাই বিষবৎ পরিত্যাজ্য। এ অভিযোগ নানাভাবে সক্রিয ছিলো। চরম পরিণতি লাভ করলো কোনো এক কুখ্যাত সবকারের আমলে জনৈক মন্ত্রীর দ্বারা রবীন্দ্র-সংগীত নিষিদ্ধ ঘোষিত হযে। আবার অন্য দিকে এ কথাও প্রমাণ করা হলো যে রবীন্দ্রনাথ মুসলমান বিদ্বেষী নন। গোলাম মোস্তফা তো লিখলেনঃ 'বিরাট রবীন্দ্র-সাহিত্যে কোথাও আমরা ইসলাম বিদ্বেষ খুঁজিয়া পাই নাই। বরং তাঁহার লেখায় এত ইসলামী ভাব ও আদর্শ আছে যে তাঁহাকে অনায়াসে মুসলমান বলা চলে।' আর কেউ কেউ মন্তব্য করলেন—মুসলমানদের স্বতন্ত্রভাবে বড় হওয়াব কথা সবার আগে রবীন্দ্রনাথই বলেছেন। তাই এ হিসেবে তিনিই পাকিস্তান আন্দোলনের জনক। অতএব যেহেতু সমগ্র বিশ্বের তিনি বিশ্বকবি তাই রবীন্দ্রনাথ প্রশ্নাতীত ভাবে গ্রহণীয়।

দেশ বিভাগের পর পশ্চিম বাংলায়ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্য বিচারে নানা বকম বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা দেখা গেছে। পূর্বেকার সেই নির্ভেজাল স্তুতি আর নেই। তাছাড়া ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে, সে-সব পরিবর্তিত শর্তেব পরিপ্রেক্ষিতে এখন রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্য বিচার হচ্ছে, এবং ভারতে এখন

যে সমাজ ব্যবস্থা ও জীবন ব্যবস্থার সূচনা হচ্ছে, যেভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্র সাম্যবাদী জীবনাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের তথাকথিত উচ্চাদর্শকে বিসর্জন দিচ্ছে, নক্সাল বাড়ীতে যে বিপ্লবের পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, নাগাভূমি প্রভৃতি অঞ্চলে যে পরিবর্তন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তা বাস্তবায়িত হলে ভারত একটি ভিন্ন প্রকৃতির রাষ্ট্র, সমাজ ও জীবন-পদ্ধতি হিসেবে দেখা দেবে। বর্তমান সমাজের শর্তাবলী সে সমাজে আর থাকবে না। ভাববাদ, অধিবিদ্যা ও কলাকৈবল্যবাদ সে সমাজে 'মৃতবাসী চেতনার নিদর্শন' হিসেবে গৃহীত হবে। বস্তুবাদ, বিজ্ঞানবুদ্ধি ও জীবনবাদ তখন হয়ে উঠবে 'সজীব চেতনার মূর্ত' প্রতীক। তখন সে পরিবর্তিত শর্তাবলীর নিরিখে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচার হবে। সে বিচার অবশ্যই প্রমথনাথ বিশীকে হতাশ করবে। কারণ 'রবীন্দ্র-স্মরণী' তখন অপাঠ্য বলে গণ্য হতে পারে।

আমরা আগেই বলেছি বিশীর আর্তনাদ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জন্য, রবীন্দ্র-সাহিত্যের জন্য নয়। আমাদের কাছে একথা বাড়াবাড়িই মনে হয় যে সাম্যবাদী সমাজে রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিত্যক্ত হবে। কারণ রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ প্রতিভার ব্যাপক প্রসারতাকে এক কথায় নাকচ করা অসম্ভব। তাঁর এক অবদানকে অস্বীকার করলে সংগে সংগে তাঁর অন্য অবদান সেস্থানে এসে প্রশ্নমুখর হয়ে ওঠে। তাঁর বিষয়কে বাদ দিলে আঙ্গিক এসে প্রশ্ন তোলে, আঙ্গিক বাদ দিলে দর্শন এসে প্রশ্ন তোলে, দর্শনকে বাদ দিলে ইতিহাস মাথা তুলে দাঁড়ায়। তবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্য বিচারের মানদণ্ড পরিবর্তিত হবে, এটা ঠিক। এখন বুর্জোয়া ভাববাদী কলাকৈবল্যবাদী চেতনা অনুসারে যাকে বলা হচ্ছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তখন বস্তুতান্ত্রিক নাস্তিক্য বুদ্ধিসম্পন্ন আদর্শবাদী সমাজে তাকে হয়ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হবে না; অন্তত বিষয়ের দিক থেকে। অন্য কোনো কৃতিকে তখন মহৎ বলে গণ্য করা হবে। রক্ত করবী, তাসের দেশ, জুতা আবিষ্কার তখন হয়ত ভিন্নতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। গীতাঞ্জলির বক্তব্য তখন হয়ত ধিকৃত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ভাষাবদান, তাঁর শিল্পকর্মের গঠন রূপ, তাঁর পরিচর্যার উপযোগিতা, তাঁর সুর-ছন্দ-ভঙ্গি সংনা, তাঁর শিল্প কৌশলের অন্তর মূল্যের সামগ্রিক অবদান, অবশ্যই স্বীকৃত হবে। কারণ রবীন্দ্র-সাহিত্যের ঐতিহাসিক মূল্য, তার সাংস্কৃতিক অবদান ও শৈল্পিক মূল্য অস্বীকার করা অসম্ভব। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও দেখা যায়,

তাঁরা পূর্ববর্তী মহৎ শিল্পীদের রচনাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রহণ করেছেন, তার মূল্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মও তেমনি নতুন মূল্যায়নের মাধ্যমে, পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে, পৌনঃপুনিক মূল্যায়নের মাধ্যমে গৃহীত হবে।

হুমায়ুন কবির

নষ্ট বিশ্বাস ও ক্লাসিক চর্চা

চারিদিকে প্রসারিত রয়েছে সময়ের সাদাকালো ছক। নানাবিধ আবর্তের জটিলতা দিয়েছে সংশয় আর যন্ত্রণার সুনির্মম তরবারী। গীন্‌স-বার্গ বড় বেশী সত্যবাদীর মত বল্লেন—'উন্মত্ততার মাঝে আমি আমার কালের সর্বোত্তম হৃদয়সমূহের অবক্ষয় দেখেছি।' চল্লিশ বছর পরেও একই স্বরে নেতির এলিয়টী নান্দীপাঠ করলেন তিনি—'এখানে নেই তৃষ্ণার পানীয়।' আমরাও বলছি, প্রায় বিশ্বময় বলাবলি হচ্ছে সময়ের এই দায়ভাগ এবং অশালীন সেই তমসার গ্রাসাচ্ছাদনে লিপ্ত রয়েছি সবাই। বড় বেশী জাগ্রত বড় বেশী বিবেকবান কেউ নেই যার শুদ্ধসত্তার আলোক-সম্পাতে বিভাবান হবে অন্তত একটি বাগান সেখানে আমরা আমাদের প্রার্থিত গন্তব্যে গমনের প্রয়োজনীয় শাস্ত্র সংগ্রহ করব, জ্বালিয়ে নেব উদ্বোধিত চৈতন্যের দীপ। থাকতেন যদি একজন সক্রেটিস আমরা তাঁকে ঘিরে থাকতাম—প্লেটো থেকে পিণ্ডার—আমরা—আমরা সবাই বিশ্বপাঠ নিতাম তাঁর কাছে। নির্বাণের মন্ত্রগাথা নয়, নয় ধ্বংসধ্বজ তন্ত্রাচার। গতিময় জীবনযাপনের, যাত্রার অন্তরে রোপন করতে শিখতাম স্থির জীবনাদর্শ। অস্তিত্বের যে আদর্শ, যে 'স্থিরকেন্দ্র'-এর অন্বেষণ লোর্কার দুয়েন্দে তত্ত্ব থেকে শামসুর রাহমানের 'এখানে আঁতিপাঁতি কি খুঁজছ শামসুর রাহমান' পর্যন্ত উন্মথিত আমরা হয়ত পৌঁছে যেতাম সেই এল-ডোরাডোতে।

শুদ্ধতাই শক্তি। সকল বিশ্বাসের বিনাশে জাগর চৈতন্যও সমাদৃত হয় পঙ্কিল নশ্বরতায়। আমরা আমাদের গণ্ডী থেকে নির্বাসন দিয়েছি বিশ্বাসের, জীবন-জগতের সুসংবাদবাহী সন্তদের; বিনিময়ে গ্রহণ করেছি ঠুনকো লোভনীয় কলিন উইলসন, দুঃস্বপ্নে তাড়িত হেনরী

মিলার, চীৎকৃত গীন্সবার্গ, অসম্ভব বিভ্রমগামী আয়ানেস্কো প্রমুখ এবং তদনুসারী প্রতিবেশী কবি-চিন্তাশীলদের। অথচ নিশ্চিত জানি এ চয়ন আমাদের বিপদফাঁদ। এক একটা ইতিহাস-সন্ধির অন্ধকারে এ ফাঁদ অনতিক্রমণীয়। সময়ের বিপদসঙ্কুল বিভিন্ন বাঁকে সমবেত মানবচিত্তে ক্রিয়ারত যে আত্মবিবাদী বিনাশী বোধ তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত থাকেন সংবেদনশীলরা। এবং এও জানেন আমাদের আশ্রয় নিতে হত সেই মনীষার ছায়ায়, সমাজ ও যুগ পরিবর্তনের ঘোর আরাবে যাঁদের নিষ্ঠা, আত্মার অম্লান গভীরতা আমাদের ধারণ করবে, ঘোষিত প্লাবনে এই সব আমাদের দ্বীপ। তবুও নিখিলের মানুষ যা করে তা রবীন্দ্রনাথের বাণীতে—

স্মরণীয় তারা বরণীয় তারা তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।

১১৯০-এর মিলান পিসা কিংবা ফ্লোরেন্সের মানুষরা কি জানত না রয়েছেন দিব্যদৃষ্টিবান অন্ধ হোমার, ইস্কেলাস, সফোক্লিস, পিণ্ডার, রয়েছেন যুক্তির চাষী থেলস্, লুক্রেটিউস, প্লেটো, এ্যারিস্টোটল। তবুও মিনোসের গোলক ধাঁধা থেকে তাদের পরিত্রাণ ঘটল না দুশো বছরের আগে। এই-ই ঐতিহাসিক মায়া। মানুষের যাত্রাপথে পরীক্ষার সমারোহ। আমরাও কি জানি না ইতিহাসের পর্বে পর্বে আমাদের জন্য অপেক্ষমান যেসব আশ্রয়ী আত্মা তাঁদের হিতকথায় কেটে যেতে পারে আমাদের অনেক বিমার।

বর্তমান পৃথিবী আমাদেরকে যে দণ্ড প্রদান করেছে তার রূপ অবশ্যই অবজেকটিভ। অবশ্যই অবজেকটিভ নিপীড়ন। বিদীর্ণ করছে শিল্পী-চিত্ত, তাঁর আত্মার অহংকার, সত্তার অখণ্ডতা। তার রূপ ত কাম্যু এবং শামসুর রহমান, ফ্রাঁসোয়া সাগা এবং রফিক আজাদের কাছে মোটামুটি একরূপ। সে যন্ত্রণার গাথা একজন অপরজনকে কি শোনাবে? যন্ত্রণার পাঠ ত নিতে হয় না, পাঠ হয় শ্রেয়োতর মন্ত্রণার। একথায় বিশ্বাসী হলেই আমাদের ফিরে যেতে হত সেই সব বিখ্যাত মহীরূহের কাছে যাঁরা বলবেন—বিশ্বাস দৃঢ়তর কর, শুদ্ধ হও অমৃতের পুত্র তোমরা, পৃথিবী তোমাদের। বিশ্বাসী হতে হবে যে কোন সন্তে। মানবের মুক্তির জন্য যাঁরা জ্বালিয়েছেন হোমাগ্নি। তাঁরাই আমাদের কল্যাণের দেবদূত। হতে পারেন তিনি খৃষ্ট—ধুয়ে দিলেন পতিতারও পা। মানুষকে ডেকে বল্লেন—'শিশুদের মত হও, ভালবাস', বল্লেন—'জীবন এবং মৃত্যু এই দুই জগতের মাঝখানে সেতুবন্ধ সম্ভব ভালোবাসায়। প্রতিবেশীকে ভালোবাসো।'—

কিংবা গৌতম বুদ্ধ—আমাদের লোভহীন করবেন। রয়েছেন মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ, তাঁর আদি ইসলামের মরূদ্যান নিয়ে। আছেন মহাত্মা মার্কস শোষণহীন সমাজে সব তার করতলে সমর্পিত হলে। তাঁর প্রোলেটারিয়েট, সেই আইডিয়াল, সেও ত হতে পারে আমাদের স্বপ্ন-স্বর্গের কথা। এখনো রয়েছেন রাসেল, বিশ শতকের যিনি বিবেক, শতাব্দীর ধীমান বৃদ্ধ শ্রেয়োবোধ পুষছেন বক্ষে যেন নিষিদ্ধ প্রদীপ। প্রাচ্য কি প্রতীচ্য মর্ত্যনিষ্ঠ কি অধ্যাত্মমূর্তি যে কোন দর্শন, যে কোন আশ্রয়ের বড় প্রয়োজন। বড় প্রয়োজন যে কোন উত্তুঙ্গ নিষ্ঠার, পৃথিবী ও মানুষের ভাগ্যকে মহান করে দেখবার দায়। কালপ্রবাহ যখন কাল-ভৈরব। স্রোতস্বিনী যখন শবানুগামী তখনই সাহসে বুক বাঁধবে, মূল্য সমৃদ্ধির বার্তা জানাবে কতিপয় মরণপণ মানুষ, জ্বলবে আবার মহান মশাল—প্রবাহ, তোমাকে রুখছি, চৈতন্যে ক্লাসিক উত্তরাধিকার গভীরভাবে আমন্ত্রা কোন অস্তিবাদকে ধারণ করেছি। কিন্তু কোন মঙ্গলময়তাকেই আমরা গ্রহণ করিনি আমাদের সময়, আমাদের পুঁজিবাদী পৃথিবী। শুনেছি, নেশায় উন্মার্গ অভিমুখী সমাজবিরোধী বামাচারী বীটনিক হিপ্পী ইত্যাকার বিবিধ শোভাবাজারে খৃষ্টোপসনা হয়, বুদ্ধের অনুগামীও নাকি রয়েছেন। পড়ে-ছিলেম এক মার্কিন জার্নালে সানফ্রান্সিস্কোর হিপ্পী গুহায় (প্যাড) আঁকা রয়েছে যিশুর বিশাল প্রতিকৃতি আর জানি তাদের মুখপত্রের নাম ওরাকল —দৈববাণী। বুদ্ধ আর খৃষ্ট নেশার নয়, মৃতের মত অমৃতের। তাদের দয়াধর্ম সমাজহিতে। সমাজের বিনাশ ড্রপ আউট আর মাদকের স্থান নেই তাতে। অতএব হিপ্পীদের অধ্যাত্ম-বিশ্বাসের (!) পুলকে আমরাও তাদের পথানুগামী হব সঙ্কল্প ভ্রমণাত্মক। হিপ্পীরা বিশ্বাসী নয়। যেহেতু জানি কোন অধ্যাত্মবিশ্বাস জীবনবিশ্বাস থেকে স্বতন্ত্র নয়। আমাদের বিশ্বাস নেই। বিশ্বাসের বিলয়েই আমাদের শান্তি স্বস্তির বিলয়। মানুষের এই ঐতিহাসিক দুঃখ যাত্রাকে স্মরণ করে জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন:

> ঢের ছবি দেখা হল—ঢের দিন কেটে গেল—ঢের অভিজ্ঞতা জীবনে জড়িত হয়ে গেলো, তবু নক্ষত্রের রাতের মতন সফলতা মানুষের দূরবীনে রয়ে গেছে, জ্যোতিগ্রন্থেঃ জীবনের জন্য আজো নেই।

সম্ভবত আমার বক্তব্য তবুও জীবনের সফলতার অবলম্বন দর্শন ও সাহিত্যের ক্লাসিকসমূহের পুনরুজ্জীবনে। জীবনবাদী মানবের ভালো-বাসার গান সেই সব জ্যোতিগ্রন্থ—সব দূরবীন।

এই মহৎ আশ্রয়সমূহ হচ্ছে লড়ায়ের হাতিয়ার। প্রাচীন ইউরোপে বড বড় সব মল্লরা ছিলেন। ছোট ছোট রাজারা তাদের পুষতে চাইতেন। তাঁরা লড়ত আর তাদের পেছনে লড়ত রাজার সৈন্যরা। সময়রিপুর হন্তারক হতে আমাদের নিতে হবে সুস্পষ্ট ছায়ার হাতকে। তাঁরা দেবেন আমাদেরকে এ্যাকিলিসের মত বর্ম। শেখাবেন জীবন-মৃত্যুর মধ্যেকার সীমারেখাটি—যাকে ভাল করে চেনা না চেনায়ই আমাদের অস্তিত্ব ও বিনাশ। সাধারণ নিসর্গ বা মানুষের ইতিহাস কিংবা আমাদের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রিযাকলাপ যখন আমরা লক্ষ্য করি তখন প্রথমেই নজর করি একটা সম্পর্কজাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিন্যাস। এই যোগাযোগের প্রবাহে আমাদের মহিমা নিঃসন্দেহে আমাদের বোধিবৃত্তের দেদীপ্যমান স্তম্ভসমূহ নির্ভর।

সময়ে পরিবর্তমান ভূমণ্ডল। দু হাজার বছর আগের মানুষ আর আমি ক্ষুৎপিপাসায় সমান উদ্দীপিত। কিন্তু যে চিৎপ্রকর্ষ, চিত্তবৃত্তি আসলে মানুষ ও পশুর মধ্যকার ভেদরেখা—পান করেছে অনেক রূপান্তরের জল; আজ আর কেউ গ্রীকদের মত বলব না, যন্ত্রপাতি দু রকম—সচল আর অচল। গোলামেরা সচল যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। গোলামেরা গোলাম—মানুষ নয়, ভাবব না। এক দলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রেখে শুধু মুক্ত নাগরিকদের সাম্যের কথা বলব না। লোকশ্রুতির কারণে বিসর্জিত হবে না হয়ত আর কোন সীতা, এই পরিবর্তন সত্য। প্রাচীন যুগে ছিল গল, ভাইকিং ভীতি, মধ্যযুগে চেঙ্গিজ আর এটিলা হুন আর আজকে থার্মোনিউক্লিয়াব যুদ্ধের বিভীষিকা। পরিবর্তন সত্য। তবুও সত্য নয়। সহস্র বছরের প্রবাহ আর উত্থান-পতনের মাঝখান দিয়ে আজকের অববাহিকায় দাঁড়িয়ে যে মানুষ একটি মৌলিক গুণ একটি শাশ্বত মানবতা ধারণ করেছে সে তার কালের পরিধানে। সে জিজ্ঞাসু ঘটনা বহির্সংঘাতের অন্তরালে বিদীর্ণ একটি প্রদীপ জীবন ও জগতেব সকল তাৎক্ষণিকতার অন্তরালের হিরন্ময় সূত্রটি ধরতে চায় তার চিত্ত। সমস্ত বিন্যাসেব বলয়ে থেকে কার্যকারণ সম্পর্ক সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়েব মূল-সূত্রটি অনুধাবনেব যে লোকান্তরিত উৎকণ্ঠা সেই মানুষ অপরিবর্তিত। গুহাগর্ভের অন্ধকারে যারা সূর্যচাঁদেব রহস্য ব্যাখ্যা করেছে আদিম অতিকথার গাত্রাবরণে। থিবীর নগরবৃদ্ধদের কণ্ঠে যে গম্ভীর অধ্যয়ন—শ্রবণ কর, থিবীর জনগণ। মহান ইদিপাস, ঈর্ষিত ইদিপাস, সকল রহস্যের চাবি যার করতলে দ্যাখ তার পরিণতি। অনুধাবন কর বিশ্ববিধান। মৃতেরাই সুখী। এ জিজ্ঞাসায় মূর্ত শেক্স-

পীয়রের হ্যামলেট, রবীন্দ্রনাথের শচীশ, টলস্টয়ের আন্দ্রেই, সবাই শাশ্বত মানবের প্রতিনিধিই—মানবাত্মার গহন অতলে চিন্তার সর্বাধিক চূড়োয় আরোহণ করেছেন যে সব বোধিসত্ব—যাঁরা নির্বিশেষে ক্লাসিক আখ্যায় একই সঙ্গে পূজিত ও বিবর্জিত হয়েছেন—তাঁরাই জীবনযাত্রার উলপব্ধির বন্ধুর কান্তার পর্যটনের প্রকরণ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই সমস্ত যাত্রী একই সময়ে যায়নি, যাবে না। কেউ নীটশের মত সহস্র মানুষের মূল্যে পেতে চাইবেন একজন অতিমানুষ—যে তত্ত্ব শ্বেত রক্ত ও জন্মগত শ্রেষ্ঠত্বের ফ্যাসিস্ট বর্বরতাকে তন্ত্রধৃত করল—অথবা বার্ণার্ডশ'র প্রতিটি মানুষে সুপারম্যানলী গুণের সম্ভাবনা দেখবেন কেউ। কিন্তু এর যে কোনটিতে পৌঁছানোর জন্য তাঁদের নিশ্চয়ই গভীর, স্থিতধী এবং জীবনের অপার উৎসারের সামনে বিনয়ী ছাত্র হতে হয়েছিল। আমাদের দুর্বিনীত কালে নিষ্ঠা ও স্থিতির এ সকল শিক্ষা নিখিলের মূল্যবোধহীন চিত্তের অমৃতময় পানাহার।

সর্বসমর্থিত উৎকেন্দ্রিকতায় নিক্ষিপ্ত আমরা। এনার্কিজম প্রতিটি দাঙ্গারত দঙ্গল, সিনেমা, থিয়েটার, খেলার মাঠের প্রতিটি উত্তপ্ত ভিড়ে—প্রতিটি গড় মানুষে উপ্ত। ডস্টয়েভস্কির ইভানের মত আমরা স্বতই ধ্বংসপ্রবণ। সুতরাং কোন বুদ্ধিজীবীরই ক্ষুদ্রবৃহৎ মার্কইস দ্য সাদ কিংবা বাকুনিন হয়ে কাজ নেই। বরঞ্চ স্থিতির উপাসক, স্থির কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে অজস্র ইতস্তত বসবাসযোগ্য দ্বীপ হওয়াই যে-কোন শিবিরের বুদ্ধিজীবীর অন্যতম সার্থকতা। ক্লাসিক সমূহই আমাদের শেখাবে সঙ্কুল সড়কে পদযাত্রার বিধান। কাজেই মানব-সভ্যতার শ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহ পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন শিলালিপি পাঠের মত যত্নে।

ক্লাসিক নিষ্ঠা আসলে ঐতিহ্যচর্চার অপর দিক। ইদানীং আমরা যা কিছু থেকে বঞ্চিত তার একটি শ্রদ্ধাবোধ। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির তথা বিশ্ব সাহিত্য-সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থানই আমাদের সময়কার বুদ্ধি-জীবীর ধারক। অনেক পূর্বসূরীর হাত ধরেই আমার পৌঁছতে হয়েছে এখানে। হয়ত তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই, তাঁদের অবদানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও আমি সচেতন। তবুও কি করে অস্বীকার করব মননশীলতার যে পূর্বাপর শৃঙ্খলে আমার অবস্থান তারা সবাই মিলে তাকে রচনা না করলে আমার উত্তরাধিকার হত সীমিত। আমরা ইকনোক্লাস্ট এই আত্মপ্রসাদে তুরীয় হয়ে সাম্প্রতিক জনসোল্লাসে উড়িয়ে দেন যে কোন ব্যক্তিত্বকে অথচ জানি সামাজিক এই অস্বীকৃতিতে নিজেকেও অস্বীকার

করা হয়। পূর্বসূরী সমালোচনার সাথে সাথে যথাযথভাবে তাকে স্বীকার করার বিনিময়ের মধ্যেই আমার নিষ্ঠার সততা। ক্লাসিক চর্চায় আমরা সেই শ্রদ্ধাবোধ লাভ করতে পারি। যা আসলে আত্মশ্রদ্ধারই নামান্তর।

মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করেন, সাহিত্য-সংস্কৃতি সমাজের উপরিতল। সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তনে তারও রং-রূপ পরিবর্তিত হয়। বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া সংস্কৃতির নবতম রূপায়ন অসম্ভব। অথচ যে সমাজ বিপ্লবে তাঁরা আস্থা রাখেন তাকে আশু সম্ভব করতে হবে জনগণের ভাবনা চিন্তায়। মোটামুটি প্রত্যেকের মানসিক বিন্যাসকে সমাজতন্ত্রাভি-মুখী করে তুলতে হবে। তাহলে দাঁড়াল প্রথম বিপ্লবটি সাধিত হয় চিন্তায়। চৈতন্যের এই নবায়ন ধীরস্থির। এ রূপান্তরের কর্মী যারা তারা এবং এক অর্থে সবাই কেন্দ্রাতিগ, বিশ্লেষণী গহনগম্ভীর না হলে এ রকম কি কোন রকম বাস্তব পরিবর্তনই অসম্ভব। তাই সিরিয়াসনেস ছাড়া পৃথিবীর কোন বড় রকমের কাজই সম্পন্ন হয়নি। চটুল জনতা বেহিসেবী 'মব' হতে পারে। সৃষ্টি অংশীদার নয়। সেই গাম্ভীর্য, সেই চূড়ান্ত সিরিয়াস-নেস-এর চর্চাই ক্লাসিক চর্চা। এর যদি কোন সামাজিক উপযোগিতা—চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও থাকে তাহলেও তা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ।

অসীম সাহা

শিল্প-শিল্পী সামাজিক দায়িত্ববোধ

শিল্প কি? শিল্প কি সেই সচল শব্দমালা—যা অনুভূতির গোপনতম প্রাসাদ থেকে উৎসারিত হয়ে বাক্যের বাগানকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে এবং যা অনিবার্যভাবেই সমাজের প্রতিটি অনু-পরমাণু থেকে রস সংগ্রহ করে সজীব ও সবল হয়ে ওঠে? যে-কোনো সচেতন ও বস্তুদৃষ্টিসম্পন্ন পাঠক (মানুষ) অবশ্যই এই ঋজু ও সুবেশ সত্য সংগঠনার প্রতি আত্ম-সমর্থন জ্ঞাপন করতে বাধ্য। কেননা এই অনিবার্য বৃত্তের মধ্যে জলের আবর্তের মতো তাঁরাও পাক খাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। অনুভূতি দিয়ে, আবেগ দিয়ে, রক্তাক্ত মানসতা দিয়ে, এমনকি জীবন দিয়েই তাঁরা এই সত্য-স্বীকৃতির উপাদান হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। যে সমাজের মর্মমূলে তাঁদের অস্তিত্ব, তাঁদের জীবনের শিকড় আমূল প্রোথিত, সেখানে একটু হাওয়া লাগলেই দুলে ওঠে; ঝড়, জলোচ্ছাস কিংবা প্লাবনে তাঁদের অবস্থা মৃত্যুগ্রাসী হয়ে দাঁড়ায়। এ কোনো নতুন কথা নয়, পুরনো কথাই নতুন করে বলা। ইতিহাসের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সামাজিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এটাই সত্য, এটাই শাশ্বত। মানুষ তাঁর পরিপার্শ্ব, তাঁর সমাজের সাথে সম্পৃক্ত। এ কারণেই সমাজ-সম্পৃক্ত সামগ্রিক উত্থান-পতনে শিল্পী ব্যক্তিজীবনে, শিল্পী জীবনেও আলোড়িত। এই আলোড়ন কতোটুকু সার্থকভাবে তাঁর কর্মে প্রতিফলিত হবে, তা অন্তর-নিভৃতে এই সকল ঘটনাবলী কতোটুকু দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছে, তারই ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। তবে কি শিল্পী সম্পূর্ণত সমাজপ্রেক্ষিতের দাস? সে কি তবে সমাজেরই ক্ষমতাবিহীন বাণীবাহক? সত্য যে, মানুষের চেতনা সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করে না, মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। কেননা মানুষ কোনো সময়ই একটি

বিশেষ কেন্দ্রে সংগুপ্ত থাকার ঘোর বিরোধী। তাই বিবর্তনের ঐতিহাসিক নিয়মেই তাঁরা সমাজবদলের অনিবার্য তাগিদে আলোড়িত। সামন্ত সমাজ থেকে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় উত্তরণ এবং বর্তমান বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার দিকে মানুষের একাভিমুখিতার অন্তর্নিহিত কারণও সেখানেই ভিত্তিত। এই বোধ কিংবা এই অভিমুখিতা আকস্মিক উৎসারণের ফলশ্রুতি নয়, সমাজ দেহের অভ্যন্তরে ফুটে ওঠা তাগিদেরই বহিঃপ্রকাশ। মানুষের বোধ, বোধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা, প্রভৃতি সমাজগঠনের একটি সু-স্থিত পরিকল্পনা মনের গভীরে এঁকে দেয়ার ফলে মানুষ নিজের ইচ্ছে মতো সমাজকাঠামো বদলে নিচ্ছে, গড়ে নিচ্ছে নতুন সমাজ—কারো কারো মনের গহনে এ ধারণা সংস্থিত রয়েছে। কিন্তু এই জ্ঞান, বিজ্ঞান কিংবা সভ্যতা গড়ে ওঠার পেছনে যে চিন্তা-চেতনা সক্রিয়, তার জন্মস্থান, নাম, ঠিকানা কোথায়? নিশ্চিতভাবেই বলা চলে, সমাজ নামক একটি আলোকোজ্জ্বল নগরীতে—যাকে এড়িয়ে গিয়ে কিছুই করা সম্ভব নয়। ফলে এ সত্যকে যে কোনোভাবেই সমুখ-কপাটে উন্মোচন করা হোকনা কেন, সমাজপ্রেক্ষিত-বিমুক্ত অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। আর এ কারণেই মানুষের চৈতন্য-নিয়ন্ত্রণ এবং বর্তমান 'সমাজ' নামক উপলব্ধিও মূলত সামাজিক অস্তিত্বেরই অকৃত্রিম প্রতিভাস। অবশ্য বর্তমান বিশ্বে বিভিন্নভাবে শিল্পের বিচার বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। পৌরাণিক ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে তীব্র আঘাত হেনে স্থিরিত করার প্রয়াস চলছে এমন সব ধ্যান-ধারণা, যার সাথে পৌরাণিক মূল্যবোধের মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। পূর্বে যা ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত, বর্তমানে তা-ই অবভাসিত। কুক্রিয়াশীল (**Reactionary**) মানসতার প্রক্রিয়াসমূহ এই পৌরাণিক মূল্যবোধ সমূহের 'ইমেজ'-কে নতুন করে জাগিয়ে দিয়ে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার ঘৃণ্য প্রয়াসে মেতে উঠছে এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পের বিশ্লেষণে সামাজিক প্রেক্ষিতকে গৌণ করে দেখবার প্রয়াস চলছে। শিল্পের শূন্যতাস্পর্শী সংজ্ঞারোপ, অন্ধকারগর্ভী চীৎকার প্রভৃতির উদ্দেশ্য মানুষের চেতনাকে ভোঁতা করে দেয়া, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শ্রেণীর স্থান নির্ণয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে শিল্পকে জীবন-বিমুখ করে তোলা। বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিস্তৃতির ফলে শিল্পের ওপরে দেশে দেশে যে প্রবল অভিঘাত সৃষ্টি হয়েছে বা হচ্ছে, তা শুধুমাত্র কুক্রিয়াশীল আচ্ছন্নতা সৃষ্টিরই ফলশ্রুতি। যার সচেতন বা অবচেতন শিকারে পরিণত শিল্পী কিংবা

শিল্প। ফলে শিল্পের প্রচলিত সংজ্ঞারোপে যেমন, তেমনি ব্যতিক্রমী উপলব্ধির ক্ষেত্রেও দৃষ্টিত বিরাটতম ফাটল—যা শিল্পের মৌলিক স্পন্দন স্তব্ধ করে দেয়, হত্যা করে শিল্পীকে। এ প্রয়াস অবশ্য নতুন নয়। শিল্পের বস্তুগত আলোচনা অর্থাৎ উৎপাদন সম্পর্কের সাথে শিল্পের বিশ্লেষণের নতুনতম পথের যেখান থেকে শুরু, এবং যখন থেকে শুরু, তখন থেকেই পাশাপাশি এই প্রতিবোধী-প্রকল্প চালু হয়েছে—যে প্রকল্প শিল্প সম্পর্কিত অন্ধধারণা জিইয়ে রেখে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার গোপনতম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

সত্য, এই বহুবিধ বাধা অতিক্রম করেই শিল্পের সামাজিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে। এটা অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী। কেননা এর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি এতো প্রবল এবং এর মূল শিকড় এতোদূর পর্যন্ত সমাজ-ভূমির গভীরে নিহিত যে, তা আপনিই জেগে ওঠে, বিস্তৃত ও ব্যাপ্ত হয়ে যায়; যুগে, যুগান্তরে। এ কারণেই বারবার, পুনর্বার বহুমুখী ধ্বংসযজ্ঞের পরে, আলোড়ন-বিলোড়ন, উত্থান-পতনের পরেও শিল্পকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব হয়নি, তা কোনো না কোনো ভাবে আপন অস্তিত্ব সুস্থিত করেছে। দেখা যায়, শিল্পকর্মের সেই সবই যুগান্তরে অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছে, যার সামাজিক ভিত্তি দৃঢ়, ঋজু ও সুঠাম—যা জীবন-কল্যাণের সপক্ষে বলিষ্ঠতম উচ্চারণে নির্দ্বিধ। এ ক্ষেত্রে শিল্পের উদ্দেশ্যমূলকতার প্রশ্ন এসে যায়। কেননা শিল্প যদি জীবনের কল্যাণের সপক্ষে কাজ করে তা হলে তার শিল্পমানতার প্রসঙ্গটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে বলে অনেকের ধারণা। তাঁদের মতে শিল্প কখনো উদ্দেশ্যমূলক হতে পারে না, শিল্পীও পারে না উদ্দেশ্যের শিকারে পরিণত হতে। শিল্প হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত, ফলে উদাসীন, নির্লিপ্ত। 'জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী' শিল্পের অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণা। শিল্প উদ্দেশ্যমূলক হওয়ার অর্থ তার 'ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী' খসে পড়া।

এই ধারণা শুধু অযৌক্তিক নয়, অবাস্তব এমনকি শিল্প-সম্পর্কিত মৌলিক ধারণারও বিরোধী। কোনো কিছুই নিরবলম্ব কিংবা উদ্দেশ্যবিহীন হতে পারে না। শুধু মাত্রাজ্ঞানের ব্যবধান অথবা অ[illegible]তো থাকতে পারে। যদি ধরা হয়, শিল্প শিল্পীর আনন্দের জন্যে, তাহলেও সে ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের ধারক শিল্পী নিজে। আর ব্যাপকতম অর্থে শিল্প ব্যক্তির, সমাজের, জীবনের। শিল্পের জন্য শিল্প কিংবা জীবনের জন্য

শি। যেভাবেই বিশ্লেষণ করা হোক না কেন, আসল কথা এ ব্যাপারে শিল্পীর ভূমিকার ওপরই পুরো ব্যাপারটা নির্ভরশীল এবং শিল্পী জীবনকে কীভাবে দেখেন, সমাজকে কীভাবে দেখেন, তা-ও তাঁর আত্ম-উপলব্ধির যথার্থতার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তাঁর পক্ষে সমাজ-বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব নয়। কেননা শিল্পী অন্য কোনো নক্ষত্রের জীব নন। যেখানেই স্পন্দন, গতি, সংঘর্ষ, উদ্যম, চিন্তা; কাজ ও সমাজ; সেখানেই, সেই কেন্দ্রীয় ভুবনেই তাঁর অধিবাস। একজন সাধারণ মানুষের সমাজের সাথে যে সম্পর্ক সমাজের প্রতি যে দায়িত্ব, শিল্পীর সম্পর্ক ও দায়িত্বও তা-ই; শুধু মাত্রার তারতম্য। সত্য, শিল্পীর শৈল্পিক মুহূর্ত, তাঁর উপলব্ধির পার্থক্য অবশ্যই আছে। কিন্তু সেই পার্থক্য কি উভয়ের মধ্যে এমন যোজন দূরত্ব সৃষ্টি করে, যা ধরা-ছোঁয়ার অনেক বাইরে? শিল্পী যা সৃষ্টি করেন, তা অবশ্যই বায়বীয় নয়। তার আত্ম-অধিকৃত, সুরেখ এবং স্বতন্ত্র উপলব্ধির, অনুভবের ফসল যে শিল্পকর্ম তা বাস্তবেরই প্রতিকৃতি-বিকল্প; অন্যতর ভুবন নির্মাণ, যা শিল্পীর হৃদয়-নিভৃতে সংগোপনে পাপড়ি মুদে রাখে। যখনই বহির্দৃশ্য, সমাজের ঘাত-প্রতিঘাত, মানবিক ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব-সংশয় প্রভৃতি এসে সেই নিভৃত পাতার ভেতরে হাওয়ার চলাচলের মতো গুনগুনিয়ে ওঠে, তখন শিল্পের প্রয়োজন তীব্রতা পায়, প্রসব হয় শিল্পকর্মের। শিল্পী কি ইচ্ছে করলেই একে এড়াতে পারেন? পারেন না। এ পর্যন্ত এমন কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়নি, যা এর সপক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি-যোজনায় সমর্থ। হতে পারে, শিল্পী এমন বিষয় বেছে নিতে পারেন, এমন সব চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন, যাদের সাথে মানুষের প্রতি-দিনের দেখার বিষয় কিংবা চরিত্রের মিল নেই। শিল্পকর্ম, সে যে কোনো শাখারই হোক না কেন, স্বেচ্ছাচারী, নিয়ম না-মানা, অবাধ্য, উচ্ছৃংখল চরিত্রহীন ও বদমাশ, তাতেও কিন্তু এ সত্য প্রমাণিত হয় না যে, সেসব সমাজ বিচ্ছিন্ন, জীবন বিচ্ছিন্ন। আসলে সে হচ্ছে অন্যরকম করে দেখা। সেই অন্যরকম করে দেখার ভেতরে শিল্পী প্রকৃতপক্ষে প্রতিদিনের আত্ম-উপলব্ধি থেকে বিকল্প জগত নির্মাণ করেন। সেই জগতের চেহারা এক-একজনের কাছে এক এক রকম। প্রধানভাবে তা দ্বৈত। ক. সুন্দর খ. অসুন্দর। যাঁদের ধারণা, শিল্পকর্ম যা, তা অবশ্যই সুন্দর, তাঁরা শিল্পের মৌলিক দিকটিকেই স্পর্শ করে থাকেন। কিন্তু এর পাশাপাশি শিল্পে অসুন্দরের দিকটিও এসে যায়। কেননা শিল্পে প্রচলিত ইমেজ এর

যে ব্যাপারটি রয়েছে, তা শিল্পকর্মের স্বার্থেই ভেঙে দেয়া প্রয়োজন। অনেক সময় অপেক্ষাকৃত গৌণ 'শিল্পী'ও শিল্পের বহির্জগতে আত্ম-আসন অধিকৃত করে নেন; যদিও সে আসনের স্থায়িত্ব সুনির্ধারিত নয়। বিশেষত বুর্জোয়া প্রচারণা, কুক্রিয়াশীলদের সৃষ্ট আচ্ছন্নতা প্রভৃতির ফলে জীবন-বিরোধী, দায়িত্বহীন অনেক রচয়িতাও 'শিল্পী' শিরোপা ম্যানেজ করে নিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে জীবনবিরোধিতার প্রসঙ্গটি বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে। যাঁরা এই শব্দ প্রয়োগের বিরোধী, তাঁরা বলবেন, কোনো শিল্পীই জীবনবিরোধী নন। কোনো না কোনো জীবন শিল্পকর্মের বিষয় হতে পারে। সত্য, পারে। কিন্তু কী ভাবে? অবশ্যই ব্যাপকতম জীবনের বিরুদ্ধে না গিয়ে, তাদের ক্ষতি না ক'রে। শিল্পীর দায়িত্ব এই কেন্দ্রে বন্দী। যদি মুষ্টিমেয় লোকের জীবন-চিত্রণ বৃহত্তর অংশের জীবনের বিপক্ষে সক্রিয় হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তা অনিবার্যভাবেই অগ্রাহ্য হতে বাধ্য। শিল্পী জীবনকে তুলে ধরতে গিয়ে কিছুতেই মানব কল্যাণের বিরোধী হতে পারেন না। পারেন না সময়ের, সমাজের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে। যদি তিনি তা করেন, তাহলে বুঝতে হবে, তিনি পেছন দিকে তাকিয়ে আছেন, যা অনিবার্যভাবেই তাঁকে বৃন্ত-বিচ্যুত করে দেবে। অবশ্য শিল্পকর্মের টিকে থাকা না-থাকার ব্যাপারটা পুরোপুরিভাবেই যুগাত্যয়ী স্থায়িত্বের ওপর নির্ভরশীল। এ জন্যে এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ অসম্ভব। কিন্তু অনস্বীকার্য, শিল্পীর সামাজিক দায়িত্বের ব্যাপারটি তাঁর সমসাময়িক উপলব্ধি কিংবা তার আত্ম-প্রকাশের ওপরই নির্ভর করে। সৃষ্টিকর্মের সার্থকতার নির্ভরতা আসলে তার শিল্প-মানতার ওপরেই হয়ে থাকে। কিন্তু কোনোক্রমেই তা তাঁর বিষয় এবং সামগ্রিক দৃষ্টিকোণকে এড়িয়ে নয়। বস্তুত সামগ্রিক দৃষ্টিকোণের প্রশ্নটিই শিল্পীর সামাজিক দায়িত্বের সাথে জড়িত। যদি এমন হয়, শিল্পী প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে যা দেখছেন, যা অনুভব করছেন, উপলব্ধি করছেন, তাকে এড়িয়ে, লুকিয়ে, ঢেকে রেখে প্রকাশ করছেন সম্পূর্ণ এর বিপরীত, তাহলে বুঝতে হবে, শিল্পী সামাজিকভাবে শুধু দায়িত্বহীন নন, অপিচ বিশ্বাসঘাতক এবং আত্মপ্রতারক। বোদলেয়ার যে জীবনকে স্পর্শ করেছেন সমস্ত জীবনকে যেভাবে নেতিবাচক দিক থেকে অবলোকন করেছেন, তাঁর কবিকর্মে তারই প্রতিফলন ঘটেছে অবিকলভাবে। তা সত্ত্বেও তিনি বিতর্কিত। কেননা তিনি জীবনের অন্ধকার দিক ছাড়া আর কিছুই দেখেননি।

কাফ্‌কা কিংবা র‍্যাবো অথবা এজরা পাউণ্ডও জীবনকে অস্বাভাবিকভাবে দেখেছেন, হতাশাগ্রস্ত, অন্ধকারস্পর্শী, জীবনবিমুখ হয়ে। কিন্তু বোদলেয়ার যতোখানি প্রভাবিত করে, আক্রান্ত করে; আক্রমণ করে, অন্ধকারের দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকেন, কাফ্‌কা, র‍্যাবো, কিংবা এজরা পাউণ্ড ততোখানি ডাকেন না। অথচ এঁদের একজন ফ্রান্সের সেই আত্মহননী কথাশিল্পী, একজন কবিতাকে ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে মেনে না নেয়া শিল্পের জগত থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত তরুণ কবি; আর একজন ফ্যাসিবাদের সপক্ষে সোচচার দুর্বোধ্য ও বিতর্কিত কবি-গুরু। বলার অবকাশ রাখে না, একজন শিল্পীর আত্ম-হননের পথ বেছে নেয়া, শিল্পের জগত থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন, ফ্যাসিবাদের সপক্ষে সোচচার হওয়া কিংবা শিল্পকর্মে দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি তাঁদের জীবন বিমুখতা কিংবা শুদ্ধতা ও সুন্দরের বিরোধিতারই আত্মপ্রকাশ। কিন্তু যেহেতু এই সামগ্রিক অসুস্থতা ব্যাপকভাবে তাঁদের জীবন-কেন্দ্রেই বন্দী, সেহেতু এঁদের শিল্পী পরিচয় অস্বাভাবিক নয়। অথচ বোদলেয়ার শুধু তাঁর জীবনেই নয়, তাঁর কবিতাতেও অশুদ্ধতা ও জীবনবিমুখতার প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন। ফলে তাঁর শিল্পী-পরিচয় নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জেগেছে, জাগছে। ব্যক্তির দুঃখবোধ, হতাশা, জীবন-বিমুখতা প্রভৃতি শিল্পের বিষয় হতে পারে। সে ক্ষেত্রে শিল্পীর দায়িত্ব তাঁর সংহতি ও পরিমিতিবোধ সম্পর্কে সচেতনতা। যদি শিল্পী তাঁর ব্যক্তিক দুঃখবোধ ও হতাশাকে বৃহত্তর পটপ্রেক্ষায় ছড়িয়ে দিয়ে অন্যকে প্রভাবিত ও আক্রান্ত করেন, তাহলে সে ক্ষেত্রে শিল্পীর উদ্দেশ্য অ-মহৎ বলে ধারণা করবার যথেষ্ট কারণ থাকতে পারে। কেননা শিল্পীর ব্যক্তিক দুঃখবোধ, হতাশার সাথে একাত্ম হওয়া এক কথা, তাঁর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ভিন্ন কথা। বলার অবকাশ রাখে না, বোদলেয়ারের ব্যক্তিক জীবন এদেশের কবিদের জীবনকে যে ভাবে আক্রান্ত করেছে, তা যে কোনোভাবেই হোক না কেন, কোনোক্রমেই শিল্পীর স্বভাবিকতার পরিচয় যেমন বহন করে না, একই সঙ্গে যাঁরা এর দ্বারা প্রভাবিত হন, তাঁদের আত্ম-বিশ্বাসের ফাটল সম্পর্কেও দ্বিধার কোন অবকাশ রাখে না।

সত্য, যিনি যথার্থই শিল্পী, তাঁর শিল্পকর্ম কিছুতেই সমাজ বিচ্ছিন্ন ও দায়িত্ব-হীন হতে পারে না। পৃথিবীর যে কোনো যুগের, যে কোনো কালের শিল্পকর্ম, যা মহৎ শিরোপা লাভে সমর্থ, তার অন্তর্বৃত্তে শিল্পীর সেই

হৃদয়-স্পন্দন ধ্বনিত, যা মানুষের-কল্যাণ ও মানবতার দৃঢ় উচ্চারণে সোচ্চার। এমন অবশ্য হয়, শিল্পী হিসেবে চিহ্নিত, অথচ তাঁর সৃষ্টিকর্ম আদৌ শিল্প শিরোপা লাভে সমর্থ কিনা, এইভাবে বিতর্কিত; তাঁদের বিষয় গ্রহণে সমাজের সাথে আত্মীয়তা, সামাজিক দায়িত্ববোধ তীব্রতর হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টিকর্ম শিল্প না হয়ে ওঠায় তা গ্রাহ্য নয়। অনস্বীকার্য, শিল্প যা, তা অবশ্যই সার্থকতার শিকড় স্পর্শ করতে সক্ষম। অবশ্য 'শিল্প কি'—এ সম্পর্কিত বিতর্ক বিভিন্নমুখী হওয়ার ফলে মহৎ শিল্প হিসেবে স্বীকৃত সৃষ্টিও অগ্রাহ্য। বিপরীতে, অপেক্ষাকৃত গৌণ সৃষ্টিও শিল্প হিসেবে স্বীকৃত। এটি পুরো-পুরিভাবেই নির্ভরশীল দৃষ্টিকোণের ওপর। অবশ্য মহৎ সৃষ্টিকর্মের ব্যাপারে মোটামুটিভাবে একটা নির্দিষ্ট মানদণ্ড স্থিরিত থাকে। যদিও সময়ভেদে, কালভেদে তার 'উপযোগিতা'র রূপান্তর ঘটে। যতো বিতর্কই থাক না কেন, মহৎ সৃষ্টিকর্মের ব্যাপারে যে কোনো দৃষ্টিকোণের ধারকই হন না কেন, মোটামুটিভাবে একটা স্থিরিত সিদ্ধান্তে পেঁাছুতেই হয়। তা না হলে মহৎ সৃষ্টি বলে কোনো কিছুই থাকতো না। কিন্তু এ ছাড়াও অন্যতর বিতর্ক রয়েছে। যেমন, যাঁরা বিশ্বাস করেন, শিল্পের জন্যে শিল্প (**art for art's sake**), কিংবা যাঁরা বিশ্বাস করেন জীবনের জন্যে শিল্প (**art for life's sake**), তাঁরা দুই বিপরীত মেরুতে বাস করেন। যাঁরা প্রথম মতের সমর্থক, তাঁদের ধারণা, শিল্প, যেহেতু সীমাবদ্ধ নয়, সেহেতু জীবনের জন্যে একে নির্দিষ্ট করে দেয়ার মধ্যে একধরনের সংকীর্ণতা কাজ করে। আর যাঁরা দ্বিতীয় মতের সমর্থক, তাঁদের ধারণা, শিল্পের জন্যে শিল্প এই ধারণা ভাববাদী, বিলাসী, অবাস্তব, অযৌক্তিক ও কুক্রিয়াশীল। শিল্প কাদের জন্যে? নিশ্চয়ই শিল্পের কোনো উদ্দেশ্য আছে। যদি তা জীবনের জন্যে না-ই হয়ে থাকে, তাহলে কি তা হাওয়ায় ভাসমান কোনো কিছু? কিন্তু প্রথম মতের সমর্থক যাঁবা, তাঁরা এ মতকে খণ্ডন করতে চান এভাবে: শিল্পের চাহিদা নিশ্চয়ই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের চাহিদার মতো নয়, শিল্পের প্রয়োজনও এতো স্থূল নয় যে, শিল্প কাদের জন্যে তা নিক্তি মেপে দেখতে হবে। এর বিপরীত দিকে পুনরায় এই যুক্তি সোচ্চার হয়ে ওঠে: শিল্পের চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের চাহিদার মতো নয় বটে, কিন্তু এই অনিবার্য প্রয়োজনগুলোকে অস্বীকার করেও নয়। আসলে শিল্পকে হতে হবে জীবনের প্রয়োজনের (অবশ্যই স্থূলার্থে নয়) সাথে সম্পৃক্ত।

প্রকৃতপক্ষে এই পরস্পর বিরোধী মতামতের প্রচলিত ইমেজ বাদ দিয়ে যদি এর মূল শিকড় স্পর্শ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আদৌ নেই। শিল্প অবশ্যই জীবনের জন্যে। কিন্তু শিল্পের জন্যেও বটে। এদের মধ্যে মূলত কোনো কণ্ট্রাডিকশন নেই। কেননা জীবনের জন্যে হয়েও শিল্পের শিল্প হতে বাধা নেই, তেমনি শিল্পের জন্যে হয়েও শিল্পেব জীবনের জন্যে হতে কোনো বাধা নেই। দুটো ধারণা আসলে বিচ্ছিন্ন নয়, সম্পৃক্ত। নিছক আত্মস্বার্থের প্রয়োজনে একে স্থূলভাবে কেটে ছিঁড়ে ভাগ বসানোর এক ঘৃণ্য প্রয়াস চালানো হয়েছে পূর্বাপর। এ ক্ষেত্রে যে জীবন শিল্পের বিষয়, এবং যে শিল্প জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত, তাকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করেছেন, এমন সব লোকেরা যাদের শিল্প সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করার কোনো অধিকারই নেই। বর্তমান বিশ্বে 'জীবন' সম্পর্কে সামাজিক ধারণাসমূহের পরিবর্তন ঘটায় এবং শ্রেণী ব্যবধানের ব্যাপারটি তীব্রতা লাভ কবায় শিল্প বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নতুনতর চিন্তা-চেতনার আবির্ভাব ঘটেছে। ফলে শিল্পের শ্রেণী দ্বন্দের আত্মপ্রকাশের প্রশ্নটি তীব্রতা পাচ্ছে। এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পের বিশ্লেষণ হওয়াতে অনিবার্যভাবেই যে কোনো 'জীবন'-এর রূপায়নই গ্রাহ্য হচ্ছে না। ফলে শিল্পে সীমিতি প্রাধান্য পাচ্ছে। আর এই সীমিতিই সৃষ্টি করছে বিতর্কের। এটা শিল্পীর ওপরে বিধি-নিষেধ ও চাপ সৃষ্টি করছে। জীবন সম্পর্কিত (সে কল্যাণমূলক হলেও) অবাধ ধারণার আত্ম-প্রকাশে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। বলার অবকাশ রাখে না, এটা শিল্পের জন্যে ক্ষতিকারক। শিল্পী অবশ্যই স্বাধীন, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী নন। জীবন সম্পর্কে উদার মুক্ত ভাবনার প্রকাশ শিল্পীর স্বাধীনতার অঙ্গীভূত, কিন্তু যদি তিনি জীবনবিরোধী, সমাজবিরোধী হন, সেক্ষেত্রে তাঁর মাধ্যমে স্বেচ্ছাচারিতার প্রকাশ ঘটে তা কোনোভাবেই গ্রাহ্য হতে পারে না। এটি পুরোপুরিভাবেই নির্ভরশীল শিল্পীর দায়িত্বের ওপর। এ ক্ষেত্রে শিল্পী সমাজ অভিমুখী হতে বাধ্য। তাঁর সৃষ্টিকর্ম জীবনের জন্যে, সমাজের জন্যে ক্ষতিকারক কিনা, শিল্পীকে সেদিকেই সচেতন থাকতে হয়। এ ব্যাপারে শিল্পী পরোক্ষভাবে কিছুটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে আটকে গেলেও, একে অস্বাভাবিক বলা চলে না। তার অর্থ এই নয় যে, শিল্পী সীমাবদ্ধতার ভিতরে আত্মসমর্পিত দাসে পরিণত হবেন। এর মধ্যেই শিল্পীকে আত্ম-স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে মৌলার্থে সৃষ্টির স্বাধীনতাকে গতি দান করতে হবে।

মূল কথা, শিল্পীর দায়িত্ব, জীবনকে কল্যাণকর দিক থেকে যে কোনোভাবে রূপায়িত করা।

যতো বিতর্কই থাক না কেন, শিল্পের উদ্দেশ্যমূলকতাকে অস্বীকার করা যায় না। কারো মতে শিল্প শিল্পীর ব্যক্তিক আনন্দের জন্যে, কারো মতে অন্যকে আনন্দদানের জন্যে। আবার কেউ একে মনে করেন, শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার, কেউ মনে করেন, শিল্প সুবিধা গ্রহণের মাধ্যম। মোট কথা এর একটা না একটা উদ্দেশ্য আছে। শিল্পী যদি নিজে নিজের আনন্দের জন্যে লিখে থাকেন, তাহলে পরোক্ষভাবে তা তাঁর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করছে; যদি অন্যকে আনন্দ দানের জন্যে হয়, তা হলেও তা শিল্পীর নিজের সপক্ষেই কাজ করছে। আর শিল্প শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার বলে যাদের ধারণা, তাদের উদ্দেশ্য ব্যাপক, সুবিধা গ্রহণের হাতিয়ার হলে শিল্পী এবং অশিল্পী উভয়েরই লাভ। বস্তুত শিল্পের উদ্দেশ্যমূলকতার যে প্রশ্নটি তা এখন খুব স্থূল ও সুবিধাবাদী কনটেক্সটে ব্যবহৃত হচ্ছে। আসলে শিল্পের উদ্দেশ্য কিছুতেই স্থূল হতে পারে না। শিল্প যদি মহৎ হয়ে থাকে, তাহলে তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অবশ্যই মহৎ হতে বাধ্য। কে কীভাবে ব্যবহার করছে, সেটা সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত ব্যাপার, যার সাথে শিল্পের অন্তর্গত ও বহির্গত কোনো সম্পর্ক নেই। শিল্পীর মৌলিক দৃষ্টিকোণের ওপরে তা নির্ভর করে। শিল্পী যদি হন এ জাতীয় যে কোনো মতের ধারক, তাহলে 'শিল্পকর্মে'ও এই বিচ্যুতি থাকতে বাধ্য। অবশ্য তাকে শিল্পকর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করা সম্ভব কিনা, তা অবশ্যই পর্যলোচনা করে দেখতে হবে। আশার কথা, যা শিল্প (art) তা কখনো এসব সংকীর্ণতার ছোঁয়ায় কলুষিত হতে পারে না। তা তার অন্তর্নিহিত দ্যোতনা নিয়ে জেগে ওঠে। যাঁরা এই সত্যের প্রতি বিশ্বাসী, তাঁরা সমাজ মৃত্তিকার গভীরে নিজেদের হৃদয়কে এমনভাবে প্রোথিত করে দেন, নিজেদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে এতো বেশী সচেতন হয়ে ওঠেন, যা তাঁদেরকে সেখানেই সংস্থিত করে রাখে, পরিবর্তনের সাথে সাথে তাঁরা নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যান সত্য, কিন্তু বিমুক্ত উদারতায় নয়, সংযুক্ত অন্ধতায়। ফলে সমাজ সেখানে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, শিল্প গৌণ হয়ে যায়। এই দু'টোর সংযুক্তি যাঁদের পক্ষে সম্ভব, তাঁরাই শিল্পী। শুধু এদিক কিংবা শুধু ওদিক নয়, এদিক-ওদিক-এর মিলনে যাঁরা যথার্থ কারিগর, তাঁদের হাত থেকেই বেরিয়ে আসে মহৎ শিল্পকর্ম।

লক্ষণীয় : এ পর্যন্ত শিল্পের যে ইতিহাস, তার ব্যাপকতম উজ্জ্বলতা ঘটেছে বুর্জোয়া মানসতার ধারকদের হাতে। তাঁদের দেখা ও রেখা সেই মানসতাকেই বিম্বিত করেছে। সামাজিক দায়িত্বের দিক থেকে তাঁরা যা করেছেন, তা তাঁদের সমকালীন পটভূমিতে বিশ্লেষিত না হলে শিল্প সম্পর্কিত বিশ্লেষণে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে বাধ্য। যাঁরা শিল্পের বস্তুবাদী বিশ্লেষণে বিশ্বাসী, এ সম্পর্কে তাঁরা যদি সুনির্দিষ্ট ধারণায় আত্মস্থ না হন, তা হলে শিল্পের মূল্যায়ন যথার্থ হতে পারে না। যাঁরা প্রশ্ন তোলেন, শিল্পীর সামাজিক দায়িত্বের অন্তর্নিহিত অর্থ কি, তাঁদেরকে একটা বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা নিতে হবে, তা হলো : সমাজপ্রেক্ষিতে, সময়ের পটভূমিতে বিচার করা। বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থায় একজন শিল্পী যদি সেই সমাজ-অতিক্রমী কোনো সৃষ্টিকর্ম উপহার দিতে না পারেন, তাহলে তা সেই শিল্পীর জন্য খুব অস্বাভাবিক না-ও হতে পারে। যদি কোনো শিল্পী তা পারেন, তাহলে বুঝতে হবে, সামাজিক বিবর্তনের অগ্রগামিতায় অর্থাৎ সমাজ প্রগতির সাথে তাঁর আত্ম-সংযোগ গভীরতর। এটা একজন শিল্পীর জন্যে গৌরবেব। অবশ্য একথা বলার অর্থ এই নয় যে, এভাবে শিল্পীর দায়িত্বকে সমাজ থেকে আলাদা করে দেখা হচ্ছে। সমাজ প্রগতির সাথে যে শিল্পী তাল মেলাতে অক্ষম, তিনি আসলে যথার্থ শিল্পী কিনা, এটা অবশ্যই ভেবে দেখবার বিষয়; কিন্তু বুর্জোয়া শিল্পী, যাঁরা যুগাত্যয়ী অনুভবে গভীরতাস্পর্শী নন, তাঁরা এই দৃষ্টিকোণ থেকে পরিত্যাজ্য হতে বাধ্য—অথচ তাঁরা তাঁদের সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে শিল্পীর সামাজিক দায়িত্বের ব্যাপারটি পুরোপুরিভাবেই শিল্পীর ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। তাঁর ক্ষমতা ? অবশ্যই তাই; কেননা যে কোনো একজন ব্যক্তি সামাজিক দায়িত্ব পালন করলেই শুধু হয় না। যেহেতু প্রশ্নটি শিল্পের সাথে জড়িত, সেহেতু তার শিল্পমানতার ব্যাপারটি অনিবার্যভাবেই এসে যায়। আর শিল্প মানেই তো ক্ষমতার দরকার, প্রতিভার (যে কোনো অর্থেই হোকনা কেন) দরকার। এটা সবার হয় না। বিষয় : যে বিষয় ব্যাপকতর জনগণের হৃদয়-প্রতিবেদন, তাদের কল্যাণের সপক্ষে বলিষ্ঠ উচচারণ, যার সাথে শিল্পীর সামাজিক দায়িত্বের প্রশ্নটি জড়িত, তাকে শিল্প মর্যাদা দান, এটা নিঃসন্দেহে কঠিন ব্যাপার।ময়াকোভস্কি, ম্যাক্সিম গোর্কি, পাবলো নেরুদা, পিকাসো, সুকান্ত ভট্টাচার্য, কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে অসাধ্যসাধন করেছেন। শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ব

পালন করেও যাঁরা বিষয়কে শিল্প মর্যাদা দান করতে পেরেছেন, বিরুদ্ধ-বাদীদের কাছে তাঁরা অবশ্যই ঋজু ও সুরেখ প্রতিবাদ নিয়ে, সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। যাঁরা ভিন্নতর ভাবনায়, আত্মসর্বস্ব সুবিধাবাদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে রেখেছেন, শিল্পের বাজারে যাঁরা জোর করেই একচেটিয়া পুঁজির বিকাশ ঘটাতে চান, উল্লিখিত শিল্পীরা বিতর্কিত হওয়া সত্ত্বেও এই বিকাশের বিরুদ্ধে কতিপয় শব্দ উচ্চারণ করেছেন, যা শিল্প ও শিল্পীর পথ বন্ধনহীন আনন্দধারায় ভরে দেবার সুযোগ করে দিয়েছে। ভবিষ্যৎ শিল্পের গতিধারা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই পথ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

আবুল কাসেম ফজলুল হক

কালের যাত্রার ধ্বনি

পূর্ব বাঙলার এখনকার সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান কবি শামসুর রাহমানের মনে একবার প্রশ্ন জেগেছিল :

লিখতে কহ যে দিনরাত্তির
কাদের জন্যে লিখবো ?
কাদের জন্যে দুঃখের পাঠ
করুণ ভাষ্যে শিখবো ?

—এ প্রশ্ন কবি শামসুর রাহমানের একার প্রশ্ন নয়। শামসুর রাহমানের আগেও পূর্ব বাঙলার 'অভিজাত মহলে'র প্রবীণ ও তরুণ কবি-সাহিত্যিকেরা বহুবার বিভিন্নভাবে এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এই মহলের কবি-সাহিত্যিকদের অভিযোগ হচ্ছে : আজকালকার পাঠকেরা সাহিত্য বোঝে না ; তারা যুগের অগ্রগতির অনেক পেছনে পড়ে আছে; তাদের মন অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ; তাদের গ্রাম্যতা এখনও কাটেনি ; অত্যন্ত উৎকৃষ্ট কবিতার রসাস্বাদনেও তারা অক্ষম, অপারগ ; তারা সাহিত্য-বোধ হারিয়ে ফেলেছে, তাই সব কিছুরই তারা অর্থ অনুসন্ধান করে, অথচ কোন সিরিয়াস জিনিশ তারা পড়তে চায় না—পড়তে পারে না।

লেখকদের উক্ত প্রশ্ন ও অভিযোগের পাশাপাশি লেখকদের উদ্দেশে পাঠকদেরও একটা প্রশ্ন একইভাবে উচ্চাবিত হয়ে এসেছে : কি পড়ব এখন ? কবিতা দুর্বোধ্য, গল্প পাগলের প্রলাপ, উপন্যাস অবাস্তর, রম্য রচনা রসহীন, সুতরাং পড়ব কি ? আজকালকার কবি-সাহিত্যিকদের কোন কবিতাই—কোন লেখাই—মর্ম স্পর্শ করতে পারে না, প্রাণে সাড়া জাগাতে পারে না, জীবনে নতুন নতুন স্বপ্ন সৃষ্টি করতে পারে না, মনকে সজীব ও সরস করে তুলতে পারে না—অনুভূতিকে পরিপুষ্ট করতে পাবে না।

জীবন নিরর্থক, বেঁচে থাকা অর্থহীন—এ উপলব্ধি অর্জনের জন্য সাহিত্য পাঠের প্রয়োজন কি? আসল কথা আজকালকার কবিরা, গল্পকারেরা, ঔপন্যাসিকেরা সৃষ্টিকর্মে অক্ষম; তাদের দৃষ্টি অন্ধ, বিবেক বিশুষ্ক, বুদ্ধি হৃদয়হীন, অনুভূতি বিকৃত, রচনা অন্তঃসারশূন্য; —এ অবস্থায় তাদের সাহিত্যপাঠের সার্থকতা কোথায়?

লেখক এবং পাঠকদের এই পারস্পরিক অভিযোগ লক্ষ্য করে সমালোচকেরা মোটামুটি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, একটি বিশেষ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে এ কালের মানবজীবন সঙ্কটাপন্ন। জীবনের এই সঙ্কটই সাহিত্যে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। এ যুগে জীবনই প্রকৃতপক্ষে মানুষের কাছে অর্থহীন ও দুর্বোধ্য বলে প্রতীয়মান। সুতরাং সাহিত্যেও বাস্তব জীবনের এই দুর্বোধ্যতা ও অর্থহীনতার প্রতিফলন ঘটা স্বাভাবিক। পূর্ব বাঙলার সাহিত্যও এসব কারণেই দুর্বোধ্য ও অর্থহীন। লেখক ও পাঠকদের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে সমালোচকেরা সমালোচনার বেলায় মূল্য-বিচারের কোন মানদণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়াই সমালোচনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, দুর্বোধ্যতা ও অবক্ষয়ের সপক্ষে ওকালতি করছেন, এবং এমনকি মানদণ্ডের প্রয়োজনকে পর্যন্ত অস্বীকার করছেন।

লেখকেরা তাঁদের প্রশ্নের একটা সমাধান ঠিক করে নিয়েছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, পাঠকের সংখ্যা কমে যাক—তাতে আপত্তি নেই; কিন্তু যে কয়জন পড়বে তাদেরকে ভাল পাঠক হতে হবে।

এই সমাধান অনুযায়ী লেখকেরা লিখে চলেছেন, এবং মনে মনে ভেবে আসছেন: সমজদার না থাকলেও তাঁরা ভাল জিনিশ লিখছেন এবং জীবনকালে তাঁদের কদর কম হলেও মৃত্যুর পর উত্তর পুরুষদের নিকট থেকে তাঁরা অশেষ কদর লাভ করবেন। লেখকদের উত্তরপুরুষদের প্রতি প্রীতি একটু বেশি প্রকাশ পাওয়ার ফলে তাঁদের রচনার যে স্বল্পসংখ্যক পাঠক অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁরাও অভিমান অনুভব করলেন ও একে একে বিদায় নিতে লাগলেন; এবং এত দিনে দেখা যাচ্ছে যাঁরা লেখেন কেবলমাত্র তাঁরাই পাঠক, লেখকেদের বাইরে পাঠক অস্তিত্বহীন, আর এমনকি সব লেখক পাঠক নন।

পূর্ব বাঙলার অভিজাত সাহিত্যের স্রষ্টারা প্রত্যেকেই এখন হয়ে পড়েছেন **'a hero with no place to display his prowess.'** অর্থাৎ তাঁদের বীরত্ব এতই অসাধারণ যে তা প্রদর্শনের আর কোন স্থানই নেই! বর্তমান অবস্থা দেখে এই সিদ্ধান্তেই আমাদের পৌঁছুতে হয় যে, পূর্ব বাঙলার বর্তমান 'অভিজাত সাহিত্যের ধারা' অচিরেই এমন একটি অবস্থার সম্মুখীন হবে, যখন যিনি লেখেন কেবলমাত্র তিনি ছাড়া তাঁর লেখার দ্বিতীয় আর কোন পাঠক থাকবে না। সে অবস্থায় সাহিত্যের এই ধারাকে অতীতের গর্ভে নির্বাসিত করে—মিউজিয়ামে স্থানান্তরিত করে—নতুন কোন ধারার সূত্রপাত না হলে পরিণতিতে লেখকদের কোন অস্তিত্বই সমাজ আর স্বীকার করবে না। অবশ্য সম্প্রতি অন্য একটি সম্ভাবনা লক্ষ্য করে এটাও ভাবা যায় যে, শিল্প-সাহিত্যের পরিমণ্ডলে কেবলমাত্র এক বিশেষ শ্রেণীর মনুষ্যাকৃতি শিল্পী নামধারী গৃহপালিত প্রাণীরই অস্তিত্ব থাকবে—যারা অর্থের বিনিময়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রচারযন্ত্রের অঙ্গ হিশেবে নিজেদের ভাড়া খাটাবে, কিংবা রূপজীবীদের মত মানবতার শত্রুদের কাছে নিজেদের সামর্থ্য বিক্রি করবে।

পাঠকেরা তাঁদের প্রশ্নের যে সমাধান ঠিক করেছিলেন তা হল: উৎকৃষ্ট সাহিত্য যখন সৃষ্টি হয় না তখন দুর্বোধ্য ও অর্থহীন বিষয় থেকে রসাস্বাদনের প্রয়াসে লাভ নেই। পাঠকেরা সমকালীন শিল্প-সাহিত্যকে বর্জন করলেন। কেউ কেউ জীবনের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসা, নীতি-সন্ধিৎসা ও মূল্য-চেতনাকে পরিতৃপ্ত কবার জন্য অতীতের পুস্তক ও বিদেশের পুস্তকে সাহিত্য-পিপাসা মেটাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন; কাবণ অতীতের ও বিদেশের জিনিশ—যত উৎকৃষ্টই হোক—বর্তমানে এ দেশে যে বিশেষ সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে তা পাঠক-সমাজের নতুন জীবন-জিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তি ঘটাতে অক্ষম। অতীতের সম্পদ আর বিদেশের সম্পদ, যত উৎকৃষ্টই হোক, কখনও ভিন্ন দেশ-কালের সৃজনশীল কর্মের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না—তার বিকল্প হিশেবে গৃহীত হতে পারে না।

এ অবস্থায় পাঠকদের সামনে আর্টের বদলে তথাকথিত এন্‌টারটেইন্‌-মেণ্টের সামগ্রী আমদানি করা হল এবং তা দিয়ে সাহিত্য ও শিল্পকলার স্থান পূরণ করা হল—সেগুলোকেই আর্ট বলে চালিয়ে দেওয়া হল। অসৎ ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা, খ্যাতি অর্জনের হীন পন্থা, আনন্দ লাভের বিকৃত উপায় ও আত্মঘাতী আয়োজন সর্বত্র প্রাধান্য লাভ করল। প্রকাশনা সংস্থা,

সাহিত্য সমিতি, সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষাকেন্দ্র এবং বিভিন্ন সরকারি আধাসরকারি ও বেসরকারি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান মুষ্টিমেয় কর্তাব্যক্তির অর্থ-নৈতিক স্বার্থ ও হীন উপায়ে প্রসিদ্ধি অর্জনের দুর্নীতিপরায়ণ সংগঠনে রূপান্তরিত হল। যে-সব প্রতিষ্ঠান প্রগতিশীল বলে নিজেদের প্রচার করল, তারাও হয় উপস্থিত অস্থিরতায় বিচলিত হয়ে আত্মঘাতী পথেই পা বাড়াল, না-হয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থ হাসিলের জন্য আদর্শের নাম ভাঙিয়ে আদর্শহীন উদ্দেশহীন লক্ষ্যহীন ভাবেই চলল,—আদর্শ অনুসন্ধানের প্রয়োজন পর্যন্ত অস্বীকার করল এবং অবক্ষয়ী স্রোতেই গা ভাসিয়ে দিল। যৌনবিকৃতি-মূলক পত্র-পত্রিকা ও চলচ্চিত্র আর্টের স্থান দখল করে নিল, মানুষের কাছ থেকে আর্ট নির্বাসিত হল, আর্টের প্রকৃত সাধকের সামনে আত্মপ্রকাশের স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ হল এবং বিকৃতির শিকারে পরিণত হওয়ার সকল আয়োজন তার সামনে উন্মুক্ত হল।

বর্তমানে পূর্ব বাঙলার 'অভিজাত' পাঠক সমাজের বৃহত্তর অংশে জীবনের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসা, নীতি-সন্ধিৎসা ও মূল্য-চেতনা এক চরম বিকৃত ও বিপর্যস্ত রূপ লাভ করেছে, এবং তাদের শিল্পানুশীলনের 'বর্তমান ধারা' অব্যাহত থাকলে তারা অচিরেই যে নিশ্চিত পরিণতির সম্মুখীন হবে তা হল: এই শ্রেণী সামগ্রিকভাবে এক কুৎসিত মনোবিকৃতির ও পরিশেষে শারীরিক বিকৃতির শিকারে পরিণত হবে এবং অপমৃত্যুর মুখোমুখী হবে।

লেখকের সংখ্যা অবশ্য আমাদের দেশে 'অভিজাত' শ্রেণীতে কমেনি, কিন্তু সমালোচকের সংখ্যা কেবল কমেইনি, বরং বিলুপ্ত-প্রায়। যাঁরা প্রথমে কবিতা লেখেন, গল্প লেখেন, প্রবন্ধ রচনা করেন, কিছুদিন পর তাঁরাই সাহিত্যের ঐ-সব আসর ত্যাগ করে সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং একদিন নীরবে, নিঃশব্দে, বিনা-সম্বর্ধনায় সাহিত্যের আসর থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। স্বতঃপ্রণোদিত সমালোচকের অভাবে লেখকেরা নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের ধরে তাঁদেরকে দিয়ে ইচ্ছামত বইয়ের সমালোচনা লিখিয়ে নেন। ফলে সমালোচকের দায়িত্ব পালনের প্রশ্নই দেখা দেয় না; সমালোচনা হয়ে দাঁড়ায় পারস্পরিক পিঠ চুলকানির ব্যাপার। শোনা যায়, সমালোচকের অভাবে অনেকে নিজের বইয়ের সমালোচনা নিজেই লেখেন ও ভিন্ন নামে সেগুলো প্রকাশ করেন। পূর্ব বাঙলার অভিজাত সাহিত্যের সমালোচকেরা বর্তমানে কেবলমাত্র নিজের ভাল-লাগা না-লাগার কথা বলে, কিংবা আলোচ্য বইয়ের বহুল প্রচার কামনা করে, অথবা

আলোচ্য লেখকের কাছ থেকে আরও উৎকৃষ্ট রচনা আশা করেই ক্ষান্ত। উৎকৃষ্ট রচনা বলতে তাঁরা কি বোঝেন, সেই মৌলিক কথাটিতে তাঁরা কখনও যান না। মূল্য-বিচারের জন্য মানদণ্ডের প্রয়োজন; পুরোনো মানদণ্ড যদি বর্জনীয় হয়, তা-হলে তা বর্জন করে নতুন মানদণ্ড অনুসন্ধান করতে হবে, উদ্ভাবন করতে হবে একটি নতুন মানদণ্ড এবং সেই নতুন মানদণ্ডেরই আশ্রয় নিতে হবে সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে--এ কথা যেন আজ পূর্ব বাঙলার প্রতিষ্ঠিত সমালোচকদের সম্পূর্ণই অজ্ঞাত।

* * *

পূর্ব বাঙলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের এই যে অনভিপ্রেত অবস্থা, এর সৃষ্টি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়; এর পশ্চাতে রয়েছে এক সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া।

পূর্ব বাঙলার বর্তমান অভিজাত সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের ধারা লক্ষ্য করলেই এই প্রক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যাবে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে বাঙালি জনগণের একাংশের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্রে ঐ-বাঙালিদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে পশ্চাৎবর্তী সামন্তবাদী বাঙালি সমাজকে অগ্রবর্তী ধনতান্ত্রিক সমাজের ছাঁচে পুনর্গঠিত করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। এই প্রবণতার ফল হিশেবেই প্রথমে রামমোহনের সংস্কার আন্দোলন, তারপর ইয়ং বেঙ্গলদের দেশীয় সকল ব্যবস্থা ও আদর্শের (সামন্তবাদী ব্যবস্থা ও ধর্মীয় আদর্শ) বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ, পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার এবং সেইসঙ্গে ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক আদর্শের আলোকে বাঙালি-সমাজের সংস্কার সাধনের জন্য বহু মনীষীর বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করেছিল।

সামন্তবাদী ব্যবস্থা ও তার অপরিহার্য অঙ্গ ধর্মীয় আদর্শের চেয়ে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও তার অপরিহার্য অঙ্গ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় গণতন্ত্রের আদর্শ উন্নততর; এই দুই ব্যবস্থা ও আদর্শের মধ্যকার ব্যবধান একটি সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক যুগের ব্যবধান—মানব সমাজ বিকাশের দুইটি স্তরের মধ্যকার ব্যবধান। সামন্তবাদী বাঙলাদেশ যখন ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হল, দুর্ভাগ্যক্রমে তখন সে ব্রিটিশ উপনিবেশ; তাই বাঙলাদেশে তখন ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ না ঘটে বিকৃত রূপ নিয়ে তা

ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি রূপে আত্মপ্রকাশ করল। উনিশ শতকের প্রথমে সূচিত বাঙলাদেশের সেই ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির ধারা বয়েই এসেছে পূর্ব বাঙলার বর্তমান সংস্কৃতি।

যাদের দ্বারা এই সংস্কৃতি লালিত ও বিকশিত হয়ে এসেছে তাদের, এবং সেই সঙ্গে এই সংস্কৃতির নিজস্ব বিকাশের ইতিহাসটি অনুধাবন করেই এর পরিণতি সম্পর্কে ধারণা করতে হবে আমাদের।

[দুই]

পলাশির যুদ্ধের অব্যবহিত অগে নবাবি আমলে বাঙলার সমাজ এক ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে বিকশিত হচ্ছিল। সমাজে তখন সামন্ত শ্রেণী ও কৃষক-জনতা ছাড়াও একটি নতুন মধ্য শ্রেণী গড়ে উঠছিল। এই শ্রেণীর ধনাগমের উপায় ছিল মহাজনি ও দাদনি কারবার, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য, ইউরোপ থেকে আগত বণিক কোম্পানি সমূহের চাকরি ও দালালি ইত্যাদি। পর্তুগীজ, ফরাসি, ইংরেজ প্রভৃতি যে সব বণিক দল বাণিজ্য ব্যাপদেশে তখন বাঙলায় আগমন করেছিল, বাঙলার সামাজিক পরিবর্তনে তাদের প্রভাবও এক বিরাট শক্তি হিশেবে কাজ করেছিল। তা ছাড়া বর্গী বলে অভিহিত মারাঠি দস্যুদের উৎপাতও বাঙলার সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করে দিয়েছিল।

তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত সামন্ত শ্রেণী আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়ে ক্রমেই তখন ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলছিল। আর ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক ও শাসনযন্ত্রের পেষণে বিপুল জনগণ তখন প্রতিষ্ঠিত শাসক শ্রেণী এবং প্রচলিত সামাজিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানাদির প্রতি ক্রমেই হয়ে উঠছিল আস্থাহারা। সমাজের আইন-শৃঙ্খলা রীতিনীতি, প্রথা-পদ্ধতি, আদর্শ-বিশ্বাস এবং বহুকালের প্রচলিত ভাল-মন্দ বোধ ইত্যাদি পড়ছিল ভেঙে। এই অবস্থায় বাঙলার তৎকালীন উদীয়মান মধ্য শ্রেণী আত্মপ্রসার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজছিল। আর সামন্ত শাসকেরা চেয়েছিল এই শ্রেণীকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এই দুই শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্বের ফলে উদীয়মান মধ্য শ্রেণী এক পর্যায়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার প্রয়োজন অনুভব করে। এ-সময় স্বার্থান্বেষী ইউরোপীয় বণিকেরাও বাঙলায় বাণিজ্য বিস্তারের সুযোগকে অবাধ করার জন্য বিশেষ তৎপর হয়ে উঠে। তাদের বাণিজ্য বিস্তারের

পথে বাঙলার প্রতিষ্ঠিত শাসক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণই ছিল সবচেয়ে বড় প্রতি-বন্ধক। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত শাসক শ্রেণীর প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় দেশের উদীয়মান মধ্য শ্রেণীর ও বিদেশী বণিকদের সম্মিলিত শক্তি। তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত সামন্ত শাসক শ্রেণীকে উৎখাত করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে গিয়ে তখনকার উদীয়মান বাঙালি মধ্য শ্রেণীর একাংশ দেশের জনগণের দ্বারস্থ হওয়ার স্বাভাবিক পথ পরিহার করে ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করল। তাদের ষড়যন্ত্র সফল হল, কিন্তু সেই সঙ্গে ইংরেজদের অধীনতাকেও তাদের বরণ করতে হল। পলাশির যুদ্ধের ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে ইংরেজ বণিকদের নেতৃত্বে তৎকালীন অসংগঠিত বাঙালি মধ্য শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করল এবং এই শ্রেণীর নেতা মিরজাফর হল বাঙলার নবাব। কিন্তু নবাব মীরজাফরকে কাজ করতে হত 'ক্লাইভের গর্দভ' হিশেবে। এই রাজ-নৈতিক উত্থানের নেতৃত্ব যেহেতু ইংরেজ বণিকদের হাতে ছিল, এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেহেতু বাঙালি মধ্য শ্রেণী সামন্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে ওঠেনি, তাই পরিণতিতে বাঙলাদেশে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল।

বাঙলাদেশের অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের যে অঙ্কুর কিংবা সম্ভাবনা তখন দেখা দিয়েছিল, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার পর ইংরেজেরা তা নষ্ট করে দিল এবং বাঙলাদেশ হয়ে রইল বিলেতের কল কারখানার কাঁচামাল সংগ্রহের ক্ষেত্র। পূর্ব বাঙলার পাট দিয়ে ডাণ্ডির চটকল চলল, ভারতবর্ষের তুলা দিয়ে ম্যানচেস্টারে কাপড়ের কল চলল। কল কারখানার বিকাশ ঘটল না বাঙলাদেশে। উপরন্তু বাঙলার মসলিন ও অন্যান্য বিখ্যাত শিল্পসমূহ সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। যে উদীয়মান বাঙালি মধ্য শ্রেণীর সহযোগিতায় ইংরেজরা সেদিন বাঙলার রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইত্যাদির মাধ্যমে পরবর্তীকালে বাঙলার ভূমি-ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করে ইংরেজরা তাদেরকে নিজেদের পদলেহী একটি শ্রেণী হিশেবে প্রতিষ্ঠা দান করল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ও তার অব্যবহিত পরে বাঙলার তৎকালীন উদীয়মান মধ্য শ্রেণীর সদস্যেরা জমিদারি ইত্যাদির মালিক হল এবং উনিশ শতকের বাঙলার বিত্তশালী ও তথাকথিত সম্ভ্রান্ত পরিবার সমূহের প্রতিষ্ঠা ঘটাল আর দেশকে শোষণ ও শাসন করার কাজে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করল ও ইংরেজদের

উচ্ছিষ্ট লাভ করে পরিতৃপ্ত হল। অথচ স্বাধীন দেশে স্বাধীনভাবে বিকশিত হলে এই শ্রেণীর, একটি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বুর্জোয়া শ্রেণীর মত, পূর্ণাবয়ব বুর্জোয়া শ্রেণী হিশেবে আত্মপ্রকাশ করার সম্ভাবনা ছিল।

*   *   *

প্রাক ব্রিটিশ যুগের যে সামন্ত শ্রেণী ইংরেজদের ও ইংরেজদের সহযোগী উদীয়মান বাঙালি মধ্য শ্রেণীর হাতে পরাজিত হল, তা পুনরুজ্জীবনের জন্য দীর্ঘকাল চেষ্টা চালিয়েছে। ১৮৫৭ সালের ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধেরও নেতৃত্ব ছিল এই শ্রেণীরই হাতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই শ্রেণীর আত্মরক্ষার ও পুনরুজ্জীবনের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয় এবং এই শ্রেণী ক্রমে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বাঙলাদেশে যে মধ্য শ্রেণীর উদ্ভব আরম্ভ হয়, এবং পরবর্তীকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে শ্রেণীর সদস্যেরা ভূস্বামী হিশেবে একটি সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়ায়, তাতে প্রাক-ব্রিটিশ বাঙলার পুরাতন সামন্ত শ্রেণীর সদস্যও অবশ্যই প্রবেশ করেছিল; তবে এ কথা নিশ্চিত যে পুরোনো শ্রেণীর সদস্যেরা নবপ্রতিষ্ঠিত শ্রেণীতে প্রবেশ করে তাদের পুরোনো চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারেনি, তাদেরকে গ্রহণ করতে হয়েছে সম্পূর্ণভাবে নতুন শ্রেণীরই চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য।

*   *   *

উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণের ইতিহাস হল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাঙলাদেশে যে নতুন জমিদার শ্রেণী—তথা ইংরেজ শাসকদের সহযোগী মধ্য শ্রেণী—গড়ে ওঠেছিল, তারই বিকাশের ইতিহাস। ইংরেজ শাসকদের ও এদেশের জনসাধারণের মাঝখানে অবস্থান করে ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে তারা তাদের শ্রেণীস্বার্থ হাসিল করেছে। এই শ্রেণীর মুসলমান অংশ ও হিন্দু অংশের মধ্যে বিরোধের প্রকাশ ঘটে উনিশ শতকের শেষ পাদে। পূর্ব বাঙলার আজকের সামন্ত-বুর্জোয়া শ্রেণী ইংরেজদের সহযোগী এই মধ্য শ্রেণীরই মুসলমান অংশের বর্তমান স্তর।

আঠারো শতকের গোড়া থেকে কিংবা তারও পূর্ব থেকে এই শ্রেণীর প্রাথমিক উপাদান সমূহ সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্তর থেকে আত্ম-প্রকাশ করতে শুরু করেছিল, বিকাশের এক পর্যায়ে নিজস্ব শক্তির ওপর নির্ভর করে গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চেষ্টা না করে ইংরেজ বণিকদের সহায়তায় আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজতে গিয়ে এরা মাতৃ-

ভূমিকে পরাধীনতার কলঙ্কে কলঙ্কিত করেছিল, তারপর ইংরেজদের প্রভুত্বকে মেনে নিয়ে আত্মপ্রসারের পথ খুঁজেছিল, আরও পরবর্তী কালে স্বাধীনতার প্রয়োজন অনুভব করে স্বাধীনতা অর্জনের আশায় ইংরেজ প্রভুদের সঙ্গে এক মিলন-বিরহের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের এক স্তরে এই শ্রেণীর হিন্দু অংশের সঙ্গে মুসলমান অংশের স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়, পরিণতিতে সেই সংঘাত বৈরিতার রূপ নেয় এবং এই বৈরিতাকে তারা ধর্মের নামে জনগণের স্তরে বিস্তৃত করে—দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও দাঙ্গা। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভিত্তিতেই ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়। সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টির পশ্চাতে ইংরেজ শাসকদেরও যথেষ্ট অবদান ছিল। তারা এই বিরোধকে ব্যবহার করেছিল নিজেদের শাসন ও শোষণের কাজে।

উনিশ শতকের ইংরেজদের সহযোগী নবপ্রতিষ্ঠিত বাঙালি জমিদার শ্রেণী ও ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছিল বাঙালি সমাজের বুর্জোয়া উপাদান সমূহও। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাহায্যে ইংরেজরা বাঙলাদেশের যে শ্রেণীকে জমিদার শ্রেণী হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, সেই শ্রেণীরই বুর্জোয়া শ্রেণী হিশেবে আত্মপ্রকাশ করার সম্ভাবনা ছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সামন্ত যুগের অন্তিম পর্বে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজের গর্ভ থেকে যে মধ্য শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, তা থেকেই পরবর্তী কালে বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। ঐ পর্বের ইউরোপের বিভিন্ন দেশের উদীয়মান মধ্য শ্রেণীর সঙ্গে আঠারো শতকের উদীয়মান বাঙালি মধ্য শ্রেণীর কিছু না কিছু সাদৃশ্য অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু বাঙলাদেশের এই শ্রেণীর বিকাশ বিকৃত ও বাধাগ্রস্ত হয় ইউরোপীয় বণিকদের বাঙলাদেশে আগমন, প্রভাব বিস্তার ও ইংরেজদের উপনিবেশ স্থাপনের ফলে।

বাঙলাদেশে ইংরেজদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে উদীয়মান বাঙালি মধ্য শ্রেণীর এক বিরাট অংশ বাঙলাদেশে আগত ইউরোপীয় বিভিন্ন বণিক কোম্পানিতে চাকুরিতে নিয়োজিত হয়েছিল। অনেকে ঐ সব কোম্পানির এজেন্ট হিশেবেও কাজ করত। আর এই শ্রেণীর একাংশ মহাজনি ও দাদনি কারবার, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য—ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছিল। কিন্তু উপনিবেশ-দেশে এই বিভিন্ন পেশার লোকদের সঞ্চিত অর্থ পুঁজি হিশেবে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ পায়নি।

ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙলাদেশে বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠার পথ তিরোহিত হয়, সমৃদ্ধিমান কুটির শিল্পসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, আর সেই সঙ্গে একান্তভাবে সীমিত হয় পুঁজি বিনিয়োগের ও পুঁজি বিকাশের ক্ষেত্র। এই অবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর বাঙলার নব-গঠিত পুঁজির প্রধান অংশ নিয়োজিত হয় জমিদারিতে। তা ছাড়া ইংরেজ শাসকেরা নিজেদের শাসন শোষণের প্রয়োজনে পরবর্তীকালে এ দেশে সামান্য শিল্পের প্রসার ঘটিয়েছিল এবং তাতেও বাঙালি পুঁজির কিয়দংশ নিয়োজিত হয়েছিল। বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালি ব্যবসায়ীদের ভূমিকা সীমিত ছিল দেশের অভ্যন্তর থেকে মাল সংগ্রহ করে তা ইংরেজ ব্যবসায়ী-দের হাতে তুলে দেয়া পর্যন্ত।

ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙলার গ্রাম-সমাজের বিচ্ছিন্নতা, যোগাযোগহীনতা ও আত্মসর্বস্বতা ভেঙে যেতে থাকল এবং বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে তার স্থাপিত হল যোগসূত্র। রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর বাঙলার শাসন ব্যবস্থায়ও ইংরেজরা নিজদের সুবিধা অনুযায়ী বিরাট পরিবর্তন সাধন করেছিল। রাজভাষা হিশেবে ফারসির জায়গায় ইংরেজিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সরকারি কাজে নিয়োগ করার জন্য বাঙালিদের ইংরেজি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরবর্তী কালে সিভিল সার্ভিসেও বাঙালিদের নিয়োগ করা হত। ইংরেজ শাসনামলে বাঙলায় একটি শিক্ষিত চাকুরিজীবী সমাজ গড়ে উঠেছিল। অপেক্ষাকৃত স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত শিক্ষিতেরাও—যেমন উকিল, মোক্তার, শিক্ষক, অধ্যাপক, সাংবাদিক, চিকিৎসক প্রভৃতি—সমাজে গড়ে উঠেছিল। পরাধীন বাঙলার এই-যে শিক্ষিত সমাজ, এর সদস্যরাও নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজদের সহযোগী ঐ জমিদার ও ব্যবসায়ীদের থেকে—তথা মধ্য শ্রেণী থেকে এসেছিল। সাধারণ কৃষকদের ও দরিদ্র লোকদের নবপ্রবর্তিত শিক্ষা লাভের কোন সুযোগ ছিল না। শিক্ষিত লোকদের পীঠস্থান ও নব্য সংস্কৃতির কেন্দ্র হিশেবে গড়ে উঠেছিল কলকাতা ও অন্যান্য শহর—গ্রাম পদানত হয়েছিল শহরের।

* * *

উনিশ শতকের ইংরেজদের সহযোগী নবপ্রতিষ্ঠিত বাঙালি সামন্ত শ্রেণীর মানসিকতা জীবন-ভাবনা আচার-আচরণ ও আশা-আকাঙক্ষা বাঙলাদেশের পূর্ববর্তী সামন্তদের থেকে পৃথক। এই শ্রেণীর উচ্চতর অংশ অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষিত বিত্তশালী অংশ ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক সভ্যতা ও

বুর্জোয়া সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল—বুর্জোয়া আশা-আকাঙক্ষা ও জীবন-ভাবনারও বিকাশ ঘটেছিল তাদের হৃদয়ে। কিন্তু স্বদেশে উপ-নিবেশবাদী শাসনের চাপে এদের জীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও বাস্তব সামাজিক অবস্থা ছিল প্রধানত সামন্তবাদী ; তাই ধনতান্ত্রিক তথা বুর্জোয়া আদর্শের যথেষ্ট পরিচয় থাকা সত্ত্বেও উনিশ শতকের অভিজাত বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাস মূলত সামন্তবাদী জীবনোপলব্ধি ও বুর্জোয়া জীবনো-পলব্ধির দ্বন্দ্বের ইতিহাস। আর প্রাক বৃটিশ বাঙলার সামন্ত শ্রেণীর মানসিকতা জীবন-ভাবনা, আশা-আকাঙক্ষা ও আচার-আচরণ ছিল সর্বাংশেই মধ্যযুগীয় বা সামন্তযুগীয়।

*　　　　*　　　　*

উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙলার এই নব প্রতিষ্ঠিত মধ্য শ্রেণীর সামনে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক, বিশেষত সাংস্কৃতিক বিকাশের সম্ভাবনা ছিল অফুরন্ত, এবং সে বিকাশ এক শতাব্দীর অধিক কাল ধরে বাঙলাদেশে ঘটেছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইংরেজদের আশ্রয়ে দেশের জনগণকে শোষণ করে দিন দিন এই শ্রেণী স্ফীত হয়েছিল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইয়ং বেঙ্গলরা প্রথমে পুরোনো সামন্তবাদী ও ধর্মীয় আদর্শের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ করে থাকলেও বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি উপনিবেশবাদ-আশ্রিত সামন্ত অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে ঐ বিদ্রোহ অল্পকালের মধ্যেই স্তিমিত হয়ে আসল এবং সংস্কারবাদী রূপ লাভ করল। এই সংস্কারবাদিতার চিহ্ন সমগ্র উনিশ শতকের বাঙালি অভিজাত শ্রেণীর কর্মে ও সংস্কৃতিতে সুস্পষ্ট। সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্মান্দোলনে, জীবনাদর্শে, রাজনীতিতে—সর্বত্রই এই সংস্কারপ্রচেষ্টা ও সংস্কারচেতনার অগুনতি স্বাক্ষর বর্তমান। এই শ্রেণীর মুসলমান অংশের সম্প্রসারণ ঘটে অপেক্ষাকৃত পরে। উনিশ শতকের বাঙলার সামন্ত-বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্য থেকে অনেক দানবীর, সমাজ ও ধর্ম সংস্কারক, রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছে।

উনিশ শতকে বাঙলাদেশ নবনির্মিত হয়েছিল ইংরেজ শাসকদের ও তাদের সহযোগী বাঙালি সামন্ত-বুর্জোয়াদের স্বার্থ ও আশা-আকাঙক্ষা অনুযায়ী। তৎকালীন শাসকদের সহযোগী বাঙালি সমাজের এই শ্রেণীর জাগরণের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হতে থাকে উনিশ শতকের গোড়া থেকেই এবং সমগ্র উনিশ শতক ধরেই এর বিকাশের ধারা অব্যাহত থাকে। বিশ শতকে এই বিকাশের ধারায় প্রধান হয়ে ওঠে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ।

এই শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান অংশের প্রতিযোগিতা তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয় এবং তাতে শেষ পর্যন্ত এই শ্রেণী দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায় এবং ভারত ও পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্রে এই শ্রেণীর দুই অংশের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তা-ছাড়া রুশ বিপ্লব, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং চীন বিপ্লবও এই শ্রেণীর বিভিন্ন অংশ ও স্তরের ওপর বিভিন্ন রকম প্রভাব বিস্তার করে।

এই শ্রেণী উদ্ভবের সময় নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি, ইংরেজদের নেতৃত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল ও পরাধীনতাকে বরণ করে নিয়েছিল; বিকাশের সময় মেরুদণ্ড সোজা করে পথ চলতে পারেনি, প্রতি মুহূর্তে উপনিবেশবাদী শাসন ও শোষণের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়েও প্রভুভক্ত প্রাণীর মত ইংরেজ প্রভুদের অনুগ্রহের জন্য লালায়িত হয়েছিল। এই শ্রেণীর উচ্চতর অংশ অর্থাৎ রাজনীতিবিদেরা ও চিন্তাবিদেরাও মূলত একই চরিত্রের পরিচয় দিয়েছে, নিরেট বৈষয়িক স্বার্থ ছাড়া কোন সক্রিয় আদর্শ সামনে নিয়ে আপোশহীন হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

এই শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান এই দুই অংশের দ্বিধা বিভক্তির পেছনে ধর্মীয় আদর্শকে ভিত্তি হিশেবে দাঁড় করানো হলেও প্রকৃতপক্ষে ধর্ম তখন সর্বাংশেই ব্যবহৃত হয়েছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের বর্ম হিশেবে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ভূমিকা পর্যালোচনা করলেই এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পাকিস্তান সৃষ্টির আগে মুসলিম লীগের দাবি ছিল ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ধর্মীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা। দ্বি-জাতিতত্ত্বের সিদ্ধান্ত ছিল তা-ই। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তারা এই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করার কোন চেষ্টাই করেনি; তবে জনগণকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে ধর্মের নাম তারা বার বার উচ্চারণ করেছে। বদরুদ্দীন উমর যথার্থই বলেছেন, "এ ধর্মীয় রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের যে কোন তত্ত্বগত সম্পর্ক নেই—এ কথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাব পর পরই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলো। মুসলিম লীগের নেতারা যে অর্থে পাকিস্তানে ইসলাম ধর্মের পূর্ব গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন সে অর্থে ইসলামকে পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত করা আর কিছুতেই সম্ভব হলো না। কিন্তু মূলত যে উদ্দেশ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল।" বলাবাহুল্য, পাকিস্তান আন্দোলনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ ছিল: ইংরেজ শাসকদের সহযোগী ভারতবর্ষের সামন্ত-

বুর্জোয়া শ্রেণীর মুসলমান অংশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য বৈষয়িক স্বার্থ হাসিলের একটা স্বতন্ত্র সুব্যবস্থা করা। মুসলিম লীগ ছিল এদেরই প্রতিষ্ঠান। দেশের জনগণ তখন তা বুঝতে পারেনি। মুসলিম লীগ আন্তরিক ভাবেই ভারতবর্ষের মুসলিম জনসাধারণের স্বার্থে স্বতন্ত্র ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে আন্দোলন করছে—এই ভেবেই জনগণ তখন এই প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই জনগণের কাছে মুসলিম লীগের যথার্থ চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠল।

* * *

মুসলিম লীগের আন্দোলনকে অনেকে ওহাবি ও ফরাজি আন্দোলনেরই সম্প্রসারণ বলতে চেয়েছেন। বিশেষত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যাঁরা ইতিহাসের নবরূপ দানের চেষ্টা করেছেন এবং ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে ব্রতী হয়েছেন, তাঁরা সকলেই এই চেষ্টা করেছেন। আমার মনে হয়, এই ধারণা মোটেই ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তিশীল নয়। একটা ভ্রান্ত কাল্পনিক পূর্বধারণা নিয়েই তাঁরা এই মত প্রকাশ করেছেন।

ওহাবি ও ফরাজি আন্দোলন ছিল পুনরুজ্জীবনবাদী আদর্শভিত্তিক আন্দোলন। ঐসব আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল পরকাল—ইহকাল নয়। ইহকালে বাস করে পরকালের সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করার জন্য যে-টুকু ঐহিক তুচ্ছতায় জড়িত হওয়া প্রয়োজন, সে-টুকুই তাঁরা হয়েছিলেন। তাঁরা শাহাদাৎ বরণ করতে কুণ্ঠিত হতেন না পারলৌকিক জীবনের দিকে তাকিয়েই; দেশের জন্য, সমাজের জন্য, জাতির জন্য উজ্জ্বলতর কোন নতুন ভবিষ্যতের বাস্তব ভিত্তি স্থাপন করে যাওয়ার কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য তাঁদের ছিল না।

তাঁদের দৃষ্টি ছিল অতীতের দিকে। অতীত যে কখনও ফিরে আসে না, ইতিহাসের যে কস্মিন কালেও পুনরাবৃত্তি ঘটে না, এই আধুনিক বোধ তাঁদের ছিল না। ভবিষ্যতকে যে অতীতের চেয়েও সুন্দর করে গড়ে তোলা যেতে পারে—এটাও তাঁদের ধারণায় ছিল না। অতীতের স্বর্ণযুগই ছিল তাঁদের সুখস্বর্গ—ভবিষ্যতের স্বর্ণযুগকে যে অতীতের স্বর্ণযুগ থেকে পৃথক হতে হবে, এ বোধ তাঁদের জাগেনি। তাঁদের আন্দোলন ছিল আদর্শ-ভিত্তিক, আপোশহীন, রক্তক্ষয়ী ও চূড়ান্ত। ইসলামের আদি ও অকৃত্রিম রূপটিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার ও ইসলামের অতীত গৌরবকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য দ্বারাই তাঁরা পরিচালিত হতেন।

ইসলামকে তাঁরা অবলম্বন করতেন এক পরিপূর্ণ জীবনদর্শন, সমাজ-পদ্ধতি ও জীবন-সাধনা হিশেবে। তাঁরা সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন যে, ইসলাম সর্বজনীন, সর্বকালীন—চিরকাল ইসলাম পৃথিবীর সকল স্থানের সকল মানুষের সকল সমস্যার সমাধানের শ্রেষ্ঠতম উপায়। স্থান-কালের পার্থক্য যে জীবনাদর্শেরও বিভিন্নতা দাবি করে—এ বোধ তাঁদের ছিল না।

তিতুমীর, শরিয়তুল্লাহ প্রমুখের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন সমূহের পাশাপাশি যদি আমরা মুসলিম লীগের আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করি তা হলে দেখতে পাব শেষোক্ত আন্দোলনের অন্তঃস্থিত লক্ষ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুসলিম লীগের মূল লক্ষ্য ছিল ঐহিক স্বার্থ এবং ঐহিক স্বার্থ হাসিলের প্রয়োজনেই এসেছিল ইসলামের কথা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজদের সহযোগী মধ্য শ্রেণীর হিন্দু অংশের সঙ্গে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাই ছিল মুসলিম লীগের মূল লক্ষ্য। দ্বিতীয়ত, মুসলিম লীগের আন্দোলনের পদ্ধতি ছিল ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও আপোশ—আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মত কোন আপোশহীন পদ্ধতি তারা কোন দিনই গ্রহণ করেনি। তৃতীয়ত, মুসলিম লীগের আন্দোলন কোন পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন, জীবন-পদ্ধতি ও জীবন-সাধনাকে অবলম্বন করেনি—বুর্জোয়া আদর্শের আলোকে ইসলামের আধুনিকীকরণেরই পক্ষপাতি ছিল এ প্রতিষ্ঠান। যদিও ইসলামই মুসলিম লীগের আদর্শ বলে ঘোষিত হয়েছিল, তবু ইসলামের অনুসরণে সাধারণভাবে মুসলিম লীগের নেতাদের কোন আন্তরিকতা লক্ষ্য করা যায় না। প্রতিষ্ঠার সময় ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র স্বাধীন আবাসভূমি সৃষ্টি করা মুসলিম লীগের উদ্দেশ ছিল না; ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা ও দর কষাকষি করে এবং মধ্য শ্রেণীর হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভারতবর্ষের মুসলমান চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী ও সামন্তদের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা আদায় করাই ছিল তখন এর উদ্দেশ। পরবর্তীকালে মুসলীম লীগ যখন ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাস-ভূমির দাবি তুলল, তখন সেই আবাসভূমির ভবিষ্যত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা কেমন হবে, সে সম্পর্কে কোন ধারণাই এই প্রতিষ্ঠান ব্যক্ত করেনি।

এইসব দিকের প্রতি লক্ষ্য করলে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা যায় যে মুসলিম লীগের আন্দোলন পূর্ববর্তী ঐ-সব আন্দোলন থেকে গুণগতভাবে

—চরিত্রগতভাবে—পৃথক। এই দুই ধরনের আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে দুই পৃথক ঐতিহাসিক যুগের আন্দোলন, এদের জাত আলাদা, প্রক্রিয়া আলাদা, লক্ষ্য আলাদা। মুসলিম লীগ পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলোর কোন স্বীকৃতি দেয়নি, মুসলিম লীগের দলিলপত্রে সে-সব আন্দোলনের প্রায় কোন উল্লেখই নেই—এমনকি সে-সব আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে পর্যন্ত মুসলিম লীগ গ্রহণ করেনি।

*   *   *

মুসলিম লীগের ইতিহাস ও পূর্ব বাঙলার আজকের সামন্ত-বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস পেতে হলে আমাদের তা অনুসন্ধান করতে হবে প্রাক-বৃটিশ বাঙলায় যে মধ্য শ্রেণীর উদ্ভব আরম্ভ হয়েছিল এবং ইংরেজ রাজত্বে যে শ্রেণী ইংরেজ শাসকদের সহযোগী সামন্ত শ্রেণী হিশেবে বিকশিত হয়েছিল, সেই শ্রেণীরই উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাসে। বিকাশের এক পর্যায়ে এই শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান অংশের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয় এবং তা শেষ পর্যন্ত সমগ্র সমাজে সাম্প্রদায়িকতার রূপ নিয়ে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ হিশেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং সমাজের অন্তঃস্থিত অন্যান্য বিরোধ, যেমন সামন্তবাদের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিরোধ ইত্যাদি, অপ্রধান হয়ে পড়ে। এর ফলে দেশের জনগণ তখন বিদেশী শাসকদের সহযোগী সামন্ত-বুর্জোয়া নেতৃত্বের আসল চেহারা চিনতে পারেনি।

এখানে যে কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন তা হল: যদিও ভারত উপমহাদেশের হিন্দু মুৎসুদ্দি সামন্ত-বুর্জোয়া ও মুসলমান মুৎসুদ্দি সামন্ত-বুর্জোয়াদের মধ্যকার বিরোধ শেষ পর্যন্ত চরম আকার ধারণ করেছিল এবং এই দুই সম্প্রদায়ের জনগণও সেই বিরোধে পক্ষ অবলম্বন করেছিল, তবু এই বিরোধে উভয় পক্ষের নেতৃত্বেরই মূল চরিত্র ছিল মোটামুটি একই রকম। অবিভক্ত ভারতবর্ষে এই দুই সম্প্রদায়েরই উচ্চতর স্তর একই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। কংগ্রেসে প্রথমে ইংরেজদের সহযোগী হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সামন্ত-বুর্জোয়ারাই ছিল। কিন্তু পরে ইংরেজদের সহযোগী মুসলমান সামন্ত-বুর্জোয়ারা স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত হওয়াকে, এবং আরও পরে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে নিজেদের শ্রেণী-একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠাকে বেশি সুবিধাজনক বলে মনে করল, এবং সে-উদ্দেশে মুসলিম লীগ গঠন করল ও স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি তুলল। ইংরেজদের সহযোগী দুই সম্প্রদায়ের সামন্ত-

বুর্জোয়াদের মধ্যে বিরোধ থাকলেও শ্রেণী-চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় উভয়েরই চরিত্র এক, জন্ম ও বিকাশ মোটামুটি একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এবং বিরোধও একই স্বার্থ নিয়ে। তাদের মধ্যে পার্থক্য সে-টুকু, সে-টুকু স্বার্থের সংঘাতে নিজ নিজ অবস্থানের পার্থক্য।

* * *

ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাঙলায় যে নতুন সামন্ত-বুর্জোয়া শ্রেণী গড়ে উঠেছিল—যারা ইংরেজ শাসক ও বাঙালি জনগণের মধ্যস্থলে অবস্থান করে বাঙলাদেশকে শাসন ও শোষণ করার কাজে ইংরেজদের সাহায্য করেছে ও ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে বিবিধ সুযোগ সুবিধা লাভ করে পরিতৃপ্ত হয়েছে, উনিশ শতকের বাঙলার নতুন সাহিত্য ও সংস্কৃতির নির্মাতা তারাই। তাদের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠ-পোষকতায়ই এই সাহিত্য ও সংস্কৃতি লালিত হয়েছে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষারই এতে রূপায়ন ঘটেছে, তাদের মধ্য থেকেই এর লেখক-পাঠক, শ্রোতা-দর্শক এবং প্রযোজক-পরিবেশক এসেছে।

পলাশির যুদ্ধের কিছুকাল আগে থেকেই এই শ্রেণী আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করছিল, পলাশির যুদ্ধের সময় একটি সামাজিক শক্তি হিশেবে এদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজদের অধীনে এরা একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি অনুসন্ধান করছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ইংরেজরা তাদেরকে সেই অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমি দান করে, ইংরেজদের শাসনযন্ত্রেও তাদের একাংশ নিয়োজিত হয়, সীমায়িত বাণিজ্য ও শিল্পেও তাদের কিছু অংশ আত্মনিয়োগ করে, তারপর বাঙলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন ও ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক সমাজের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে তারা উন্নততর ধনতান্ত্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয় এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় গণতন্ত্রের চেতনা লাভ করে। ইংরেজদের কাছ থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় গণতন্ত্রের চেতনা লাভ করার পর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে ইংরেজ শাসকদেরকেই এরা প্রথম ও প্রধান প্রতিবন্ধক হিশেবে দেখতে পায়। ফলে ইংরেজদের সঙ্গে এই শ্রেণীর দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং আন্দোলনের সূচনা হয়। প্রথম পর্যায়ে এই শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান এই দুই অংশের সম্পর্ক ছিল সহযোগিতামূলক। পরবর্তীকালে স্বার্থের প্রতিযোগিতায় সেই সম্পর্ক বৈরিতামূলক রূপ ধারণ করে। ইংরেজ-

দের বিরুদ্ধে এই শ্রেণীর আন্দোলন কোন দিনই পারম্পর্যশীল আপোশহীন রূপ গ্রহণ করেনি। আন্দোলনের ফাঁকে ফাঁকে এই শ্রেণীর অনেকেই ইংরেজদের পদলেহন করে স্যার, নাইট, নবাব বাহাদুর, রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর, ইত্যাদি 'তমঘা' নিয়েছে। এদের নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলনও পরিচালিত হয়েছে মূলত আপোশ করার অভিপ্রায় নিয়েই। এই শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান এই দুই অংশের নেতৃত্বে ভাবত ও পাকিস্তান স্বাধীন হওয়া সত্বেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীব সঙ্গে এই দুই রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি—এমনকি সে সম্পর্কে কখনও কোন ভাটাও পড়েনি।

* * *

প্রকৃতপক্ষে কৃষক-জনতার বিভিন্ন আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ সরকারের ও তাদের সহযোগী জমিদারদের ভিত সব সময়ই কম্পিত ছিল। ফকির-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ, চোয়াড় বিদ্রোহ, চাকমা বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, রংপুর বিদ্রোহ, যশোর-খুলনার প্রজা বিদ্রোহ, পাহাড়িয়া বিদ্রোহ, পাবনার কৃষক বিদ্রোহ, ময়মনসিংহের হাতী-খেদা বিদ্রোহ, পাগলপন্থী বিদ্রোহ, ওহাবি বিদ্রোহ, গারো বিদ্রোহ, ফরাজি বিদ্রোহ, ত্রিপুরার কৃষক বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ, সন্দ্বীপেব বিদ্রোহ, সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন প্রভৃতি এবং বাঙলাদেশ ও ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানের অসংখ্য বিদ্রোহ ও আন্দোলন বৃটিশ সরকারের ও তাদের এ দেশীয় সহযোগীদের প্রায় সর্ব মুহূর্তেই প্রকম্পিত রেখেছিল। এইসব বিদ্রোহ জাতীয় চরিত্র নিয়ে ঐক্যবদ্ধ বিরাট অভ্যুত্থান আকারে আত্মপ্রকাশ করতে পারে—এই ভয়েই ইংরেজরা ভারতবর্ষ ছেড়ে যায় এবং বুদ্ধিমানের মত তাদের বিশ্বস্ত ও অনুগত সহযোগীদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে যায়।

পরাধীন ভারতবর্ষে জাতীয় বুর্জোয়ারা কখনও ব্যাপক স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব নিতে পারেনি। হয় তারা অতিবাম উগ্রতার পরিচয় দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে, নতুবা মুৎসুদ্দি নেতৃত্বের প্রতি মোহ প্রদর্শন করেছে। এব ফলে তাদের আন্দোলনের দ্বারা মুৎসুদ্দি নেতৃত্বই লাভবান হয়েছে—ইংবেজরা মুৎসুদ্দিদেরকেই আরো বেশি সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে ও কাছে টেনেছে। বিশ শতকে সন্ত্রাসবাদীরা যে সংগ্রাম চালিয়েছিল, জাতীয় স্বাধীনতার চেতনাই ছিল তার উৎস। কিন্তু এই সংগ্রাম সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করেনি বলে অপরিণত অবস্থাতেই ধ্বংস হয় এবং এইসব আন্দো-

লনে ভীত হয়ে ইংরেজরা নানা কৌশলে মুৎসুদ্দি শ্রেণীকে আরও কাছে টেনে নিয়ে ও মুৎসুদ্দি শ্রেণীর মধ্যকার সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য বিরোধকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে এ দেশকে শাসন করতে চেয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত মুৎসুদ্দিদের হাতেই তারা রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করে গিয়েছে।

জমিদারদের বিরুদ্ধে যে অসংখ্য কৃষক-বিদ্রোহ ব্রিটিশ আমলে হয়েছে, সেগুলো দমন করার জন্য প্রায়শ সরকারি পুলিশ বাহিনী ও সেনাবাহিনী এগিয়ে এসেছে। ফলে এইসব আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু এই আন্দোলন সমূহ কখনও সঠিক যুগাদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়নি। জাতীয় বুর্জোয়ারা এই সব আন্দোলন পরিচালনায় অগ্রসর হয়নি। ফলে এগুলো প্রায়শ স্থানীয় বিদ্রোহের রূপ অতিক্রম করে কোন বৃহত্তর বিস্তৃতি লাভ করেনি। সামন্ত যুগীয় আদর্শ ও বিচ্ছিন্নতার মনোভাব নিয়েই পরিচালিত হয়েছে এগুলো। বিশ শতকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও রুশ বিপ্লবের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যাঁরা ভারতবর্ষে বিপ্লব সংঘটনের কথা ভেবেছিলেন, তাঁরাও কার্যক্ষেত্রে তেমন কিছুই করেননি। কৃষক-জনতাকে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে জাতীয় ভিত্তিতে সংগঠিত করার কাজে সামান্যই অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁরা, আর মুৎসুদ্দিদের স্বরূপ উন্মোচনেও ছিলেন তাঁরা নিষ্ক্রিয়। তাঁদের আন্দোলনের ফলও ভোগ করেছে মুৎসুদ্দিরাই।

দেশের সমাজ কাঠামোতে সে-দিন যেসব বিরোধ ছিল, তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক চক্র ও সেই চক্রের সহযোগী দেশীয় সামন্ত-বুর্জোয়া শ্রেণীর মিলিত শক্তির সঙ্গে দেশের সমগ্র জনগণের বিরোধেরই প্রধান বৈরিতামূলক বিরোধ হিশেবে আত্মপ্রকাশ করার কথা ছিল। সমাজের বাস্তব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই ধরনের বিরোধেরই ভিত্তি তৈরি ছিল। কিন্তু তা হল না; কারণ এই সত্যটিকে উপলব্ধি করে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার মত কোন সৎ প্রতিভা সেদিন দেশে জন্ম গ্রহণ করেনি—ফলে দেশের কোন আভ্যন্তরীণ শক্তি সে-দিন এই সত্যের প্রতিষ্ঠায় যথার্থভাবে আত্মনিয়োগ করেনি। কেউ কেউ যদি এই বিরোধের স্বরূপ উপলব্ধি করেও থাকেন, তবু দেশকে মুক্ত করবার লক্ষ্য নিয়ে পারম্পর্যশীলভাবে সততার সঙ্গে জনগণকে পরিচালিত করতে তাঁরা অগ্রসর হননি।

এইসব কারণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সহযোগী সামন্ত–বুর্জোয়া মধ্য শ্রেণীর প্রচেষ্টাই ফলবতী হয়েছে।

*　　　　*　　　　*

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই শ্রেণীর যে-অংশই আজ পর্যন্ত পাকিস্তানের ক্ষমতায় গিয়েছে, তারাই আগাগোড়া সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ে লালিত হয়েছে কিংবা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দর কষাকষি ও আপোশ করে চলেছে এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দেশের জনগণকে শোষণ করে সমৃদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করেছে। রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিশেবে ইসলামের কথা প্রচারিত হলেও প্রকৃত পক্ষে এদের হাতে ইসলাম ব্যবহৃত হয়ে এসেছে শাসন ও শোষণের হাতিয়ার হিশেবে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই শ্রেণীর যে অংশ রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ–সুবিধা অর্জন করতে পারেনি, তার বিভিন্ন দল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণকে সংগঠিত করার চেষ্টা করে থাকলেও আজ পর্যন্ত কোন দলই সফল হতে পারেনি। এর কারণ, এইসব রাজনৈতিক দলও মূলত একই শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্ব করছে। মুসলিম লীগের দলত্যাগীরাই এসে নতুন দল গঠন করেছে এবং সেই দলের ভাঙনের ফলে পুনরায় আরও নতুন নতুন দল গঠিত হয়েছে ও হচ্ছে। এর ফলে এইসব দলের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে কোন নতুন রাজনীতি আসেনি, কোন আদর্শও গড়ে ওঠেনি এবং কোন নতুন শ্রেণীও সংগঠিত হয়ে ওঠেনি। সমগ্র পাকিস্তানের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এই শ্রেণীর যে অংশ এতদিন প্রাধান্য খাটিয়ে এসেছে, জনগণের সামান্য সমর্থনও আজ তাদের প্রতি নেই। নিরেট বল প্রয়োগের মাধ্যমেই তারা আজ তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য বহাল রাখছে। তাদের প্রতি পাকিস্তানের কোন অংশের জনগণেরই কোন প্রকার সমর্থন আজ আর নেই। অপরদিকে সমাজকে কোন কিছু দান করার কোন প্রকার যোগ্যতাও তাদের এখন নেই। তাই তাদের চূড়ান্ত ধ্বংসের দিন ঘনিয়ে আসছে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যদিও আঞ্চলিক বৈষম্যের ফলে পূর্ব বাঙলার এই শ্রেণী পাকিস্তানের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি, তবু পূর্ব বাঙলার জনগণকে শোষণ করে এবং সাম্রাজ্যবাদী সাহায্যের আংশিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে এই শ্রেণী উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রসার ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং এই শ্রেণীর সদস্যেরা প্রতিনিয়ত

আরও বিকশিত ও সমৃদ্ধ হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, এই শ্রেণীর সমৃদ্ধি ও পূর্ব বাঙলার জনসাধারণের উন্নতি বিপরীত-ভাবে আনুপাতিক—অর্থাৎ এই শ্রেণী সমৃদ্ধ হলে জনগণ আরও দুর্দশাগ্রস্ত হবে, কারণ পূর্ব বাঙলার জনগণকে শোষণ করার উপরই এর সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। এই শ্রেণীর সমৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান থাকতে পারে পূর্ব বাঙলার বর্তমান সমাজব্যবস্থা টিকে থাকলেই। কিন্তু এই সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে পূর্ব বাঙলার জনগণের বিক্ষোভ আজ দানা বাঁধছে। পূর্ব বাঙলার জনগণ আজ সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি চায়—তাদের চোখে আজ মুক্তির স্বপ্ন—সকল প্রকার শোষণ, অন্যায় ও অবিচার থেকে মুক্তি। এই অবস্থায় পূর্ব বাঙলার মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া-সামন্ত শ্রেণীর স্বাভাবিক বিকাশের সম্ভাবনা আজ শেষ হয়ে এসেছে। আঞ্চলিক শোষণ থেকে পূর্ব বাঙলাকে মুক্ত করার যে আকাঙ্ক্ষা—শুধুমাত্র তাই পূর্ব বাঙলার জনগণের সমগ্র আকাঙ্ক্ষা নয়। পূর্ব বাঙলার জনগণের আজ আঞ্চলিক শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার যেমন তীব্র তাগিদ রয়েছে, তেমনি তাগিদ রয়েছে সামন্ত শোষণ, বুর্জোয়া শোষণ, আমলাতান্ত্রিক শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকেও মুক্ত হওয়ার। সেই সঙ্গে তাদের চোখে অন্যায়মুক্ত, অভাবমুক্ত, প্রেম প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যপূর্ণ নতুন সমাজব্যবস্থা, জীবন-পদ্ধতি ও জীবনেরও স্বপ্ন দেখা দিচ্ছে। পূর্ব বাঙলার জনগণের সকল তাগিদ মেটার ও স্বপ্ন সফল হবার সম্ভাবনা নিশ্চিত না হলে জনগণের অসন্তোষের অবসান ঘটতে পারে না।

*　　　　*　　　　*

সমগ্র ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া লক্ষ্য করে বলা যায়: বাঙলাদেশে আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজে প্রথম যে একটি নতুন শ্রেণীর প্রাথমিক উপাদান সমূহের জন্ম হয়েছিল, আঠারো শতকের মাঝামাঝিতে যে শ্রেণী সামন্ত শাসনের চাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বাঙলাদেশে আগত বিদেশী বণিকদের সঙ্গে আঁতাত করতে গিয়ে খাল কেটে কুমির এনেছিল —দেশ মাতৃকাকে পরাধীনতার অভিশাপে অভিশপ্ত করেছিল, আঠারো শতকের অন্তিম পাদে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থান নিশ্চিত করে নিয়েছিল, সমগ্র উনিশ শতক ধরে পরাধীন স্বদেশে বিদেশী শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে—স্বদেশের জনগণকে শোষণ করে—স্বদেশের সম্পদ বিদেশী শাসক-শোষকদের হাতে তুলে দিয়ে সেই শাসক-শোষকদের উচ্ছিষ্ট লাভ করে বিকশিত হয়েছিল, বুর্জোয়া সভ্যতা

ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে সেই আলোকে বিদেশী শাসকদের সহ-যোগিতায় পরাধীন স্বদেশের পশ্চাতবর্তী সমাজের সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেছিল, এক সমৃদ্ধ বাঙলা সাহিত্য উপহার দিয়েছিল, বিশ শতকের গোড়াতে যে শ্রেণী হিন্দু ও মুসলমান এই দুই অংশে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, যে শ্রেণীর মুসলমান অংশের নেতৃত্বে বিশ শতকের মাঝামাঝিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পাকিস্তানোত্তর কালে পূর্ব বাঙলায় যে শ্রেণী আঞ্চলিক শোষণের চাপের মধ্যে থেকেও জনগণকে শোষণ করে ও শাসকদের সঙ্গে নানা রকম মিলন-বিরোধের সম্পর্কে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী সাহায্যেব আংশিক সুযোগ সুবিধা লাভ করে যথেষ্ট বিকাশ লাভ করেছে ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছে, সেই শ্রেণী আজ তার বিকাশের অন্তিম পর্বে এসে পেঁৗচেছে এবং এই শ্রেণীর প্রতিপক্ষের আত্মপ্রকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বাস্তব অবস্থা আজ তৈরি হয়ে আছে।

[তিন]

এই-যে শ্রেণীর রূপটি ফুটিয়ে তুলতে এতক্ষণ চেষ্টা করলাম, বিগত এক শিতাব্দীর অধিক কাল জুড়ে বিস্তৃত বাঙালিব সাহিত্য ও সংস্কৃতির 'স্বর্ণ যুগে'র ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীরই সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনার ইতিহাস। এই শ্রেণীর প্রতিটি অগ্রগতির সঙ্গেই সাধিত হয়েছে এই শ্রেণীর সাহিত্যেরও অগ্রগতি। আর এই সাহিত্য সর্বাংশেই ইউরোপীয় —বিশেষত ইংরেজি—সাহিত্যের প্রভাবে স্পষ্ট।

ইতিহাসের মঞ্চে যখন কোন নতুন শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে তখনই সেই শ্রেণীর সাহিত্যের রূপটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে না। নবোদ্ভূত শ্রেণী যখন একটা বিশেষ পরিণত অবস্থায় পেঁৗছায়, তখনই তার সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপটি স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়। আমাদের আলোচ্য শ্রেণীর সাহিত্য ও সংস্কৃতিও এর বিকাশের এক বিশেষ পর্যায়েই সুস্পষ্ট রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

উনিশ শতকের মধ্য সময়ে ও শেষোর্ধে এই শ্রেণী থেকে যাঁরা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁদের সৃষ্টি ও কর্মের মধ্য দিয়েই এই শ্রেণীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপটি পূর্ণ অবয়ব ও ভরা যৌবনের কান্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের জীবন-কালই এই শ্রেণীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ। এই সময়টাতেই তাঁর পূর্ব-

সূরীদের শ্রেষ্ঠ রচনা সমূহ প্রকাশিত হয়—উত্তরসূরীদেরও। আবার তাঁর জীবনকালেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় জীবন-ভাবনার ও সাহিত্যের প্রভাবে এই শ্রেণীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির অবক্ষয়ও সূচিত হয়। অপর দিকে তাঁর জীবনকালেই রুশ বিপ্লব ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রভাবে বাঙলাদেশে আর এক নতুন শ্রেণীর ও নতুন যুগের সাহিত্যেরও কিছু কিছু উপাদান দেখা দিতে থাকে।

রামমোহন রায়, হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, কেশব চন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মীর মোশাররফ হোসেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, বেগম রোকেয়া, লুৎফুর রহমান, এয়াকুব আলী চৌধুরী, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মোতাহের হোসেন চৌধুরী প্রমুখকে আশ্রয় করে অগ্রসর হয়েছে এই শ্রেণীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা। এঁদের প্রত্যেকের উপরই ইউরোপের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে।

* * *

ধনতান্ত্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির আকর্ষণে এই শ্রেণীর আলোকপ্রাপ্ত অংশ সম্মোহিত হয়েছিল। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকবৃন্দও ইউরোপীয় সাহিত্যের দ্বারা একইভাবে সম্মোহিত হয়েছিলেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ বিরাট আকারে প্রকাশ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা ঐ ব্যবস্থার ত্রুটির দিক লক্ষ্য করেননি।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সামনে বিকাশের সম্ভাবনা ছিল প্রচুর—তখনও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল। কিন্তু এই ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিকাশের পর বিশ শতকের প্রথম দিকে যখন এর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সঙ্কটসমূহ প্রকটভাবে প্রকাশ পায় এবং প্রথম মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়, তখন বাঙলাদেশে এই শ্রেণীর তরুণদের একাংশের মনেও মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। কিন্তু বাঙলাদেশের পরিবেশে এই শ্রেণীর সঙ্কট তখনও প্রকট হয়ে ওঠেনি। বরং এই শ্রেণীর সামনে বিকাশের সম্ভাবনা তখনও

প্রচুর। এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য-প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ তখন বাঙলা সাহিত্যকে আলোকিত করে রেখেছিলেন। রাজনীতি, সমাজ সংস্কার, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও তখন এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভারা বাঙলার আকাশে দেদীপ্যমান ছিলেন। কিন্তু ধনতন্ত্রের জন্মভূমি ইউরোপে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির স্বাভাবিক বিকাশের সম্ভাবনা তখন নিঃশেষ হয়েছে, ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির সামনেও তখন সঙ্কটের কালো মেঘ দেখা দিয়েছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সঙ্কটের আবর্তে ধনতান্ত্রিক সমাজের মানুষের জীবন তখন সম্পূর্ণভাবে ক্ষতবিক্ষত, পঙ্গু, বিকৃত ও জরাগ্রস্ত। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব থেকেই ইউরোপের শিল্প-সাহিত্যে এই অবক্ষয়ের চিহ্ন প্রকাশ পেতে থাকে।

ইউরোপের সমাজ ও সাহিত্যের ঐ অবস্থার প্রভাব তৎকালীন বাঙালি সমাজের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকম হয়েছে। বাঙালি মধ্য শ্রেণীর শিক্ষিত তরুণদের একাংশ তখন সঙ্কট-বিধ্বস্ত ইউরোপের অবক্ষয়ক্লিষ্ট সাহিত্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তাঁরা ইউরোপীয় সাহিত্যের বুর্জোয়া যুগের এই অবক্ষয়ের পর্বটাকে মনে করেছিলেন ঐ সাহিত্যের একটা নতুন যুগ বলে। বাঙলা সাহিত্যেও তখন তাঁরা এর অনুসরণে একটা নতুন যুগের জন্মদানের প্রেরণা অনুভব করেছিলেন। 'কল্লোল' 'কালি-কলম' 'প্রগতি' প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে তাঁদের এই নবযুগ স্থষ্টির আন্দোলন অগ্রসর হয়। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুসারীদের বিরুদ্ধে এঁদের ছিল প্রবল বিদ্রোহ—রবীন্দ্র-সাহিত্যের শান্ত সমাহিত ও কল্যাণকামী আদর্শের প্রতিও এঁদের ছিল চরম অস্বীকৃতি। 'শিল্প শিল্পের জন্যই'—এই তত্ত্ব এঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর বিশেষভাবে জীবনের ক্লান্তি, অবসাদ, হতাশা, যৌনতা অবক্ষয়, বিকৃতি, দারিদ্র্য, পরাজয় ও ক্লেদাক্ত দিককে এঁরা সাহিত্যে রূপদানের প্রয়াস পেয়েছিলেন। সকল প্রকার সামন্ত প্রভাব থেকে বাঙলা সাহিত্যকে মুক্ত করতে এঁরাই সচেতনভাবে চেষ্টা করেছিলেন এবং অবক্ষয় পর্বের বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবন-ভাবনার উপর সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের পর বাঙলার মধ্য শ্রেণীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির এই ধরনের পরিণতিরই সম্ভাবনা ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে দিয়ে যায়। ইউরোপের ঐ সাহিত্য যে কোন নতুন ঐতিহাসিক যুগের, বা নতুন সামাজিক শ্রেণীর সাহিত্য নয়, তা-যে বুর্জোয়া শ্রেণীর সাহিত্য-প্রতিনিধিদের দ্বারাই রচিত ও বুর্জোয়া

যুগেরই অবক্ষয় পর্বের সাহিত্য—এটা কল্লোল গোষ্ঠী উপলব্ধি করতে পারেনি। এ জন্যই নিজেদের সাহিত্যকে নবযুগ সৃষ্টিকারী সাহিত্য বলে প্রচার করবার এবং 'কল্লোল যুগ' কথাটাকে চালু করবার এত চেষ্টা ছিল তাঁদের। কল্লোল গোষ্ঠীব লেখকেরা অপেক্ষাকৃত পরে সম্ভবত তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাতে তাঁদের রবীন্দ্র-অসহিষ্ণুতা প্রশমিত হয়েছিল।

কল্লোলের অনতিপরে যাঁরা বাঙলার সাহিত্যাঙ্গনে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শান্ত সমাহিত ভাবমণ্ডল অতিক্রম করে যাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন, অথচ রুশ বিপ্লবের আদর্শ যাঁদের উদ্বুদ্ধ করেনি, তাঁরা হতাশা ও অবক্ষয়ের চেতনাই হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত করে উত্তরকালে কেউ যে বলতে পারেননি "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে" কিংবা "এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি" তার কারণ সম্ভবত মোটেই ব্যক্তিগত নয়, সম্পূর্ণই ঐতিহাসিক। "অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ" এটাই যেন সমগ্র বুর্জোয়া বিশ্বের মর্মবাণীতে পরিণত হয়েছে তখন থেকে। রবীন্দ্রনাথে যে মর্ত্যপ্রীতি, মানবমহিমা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, অতীন্দ্রিয় অনুভব, জাতীয় চেতনা ও আন্তর্জাতিকতাব সাক্ষাত মেলে, তাকে লালন করার মত মানব-পরিস্থিতি উত্তরকালে ক্রমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

রুশ বিপ্লবও—যা প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালেই ঘটে—বাঙালি মধ্য শ্রেণীর শিক্ষিত তরুণদের একাংশের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এর ফল রাজনীতি ক্ষেত্রে যতটা প্রভাবশালী হয়েছে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ততটাই হয়েছে—তার বেশি নয়। নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়—প্রমুখের মধ্য দিয়ে বাঙলা সাহিত্যে এই চেতনা আত্মপ্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে এই সাহিত্য এক নতুন যুগ ও নতুন শ্রেণীর সাহিত্য। এই নতুন যুগ হল সমাজতন্ত্রের যুগ এবং নতুন শ্রেণী শ্রমজীবী শ্রেণী।

* * *

যে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের সমাজ হিন্দু ও মুসলমান—এই দুই প্রতিপক্ষে বিভক্ত হয়েছিল, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনেও তার রূপায়ন ঘটেছে।

উনিশ শতকের শেষ দিকে বঙ্কিমচন্দ্র একবার বলেছিলেন, "দেশীয় লোকের অর্দ্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল? কেন স্বধর্ম ত্যাগ করিল?

কেন মুসলমান হইল? কোন্ জাতীয়েরা মুসলমান হইয়াছে? বাঙ্গালীর ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব আর নাই।" বলা বাহুল্য, বাঙলার মানুষ যে হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত—এটা বঙ্কিমচন্দ্রকে পীড়িত করেছিল। সনাতন হিন্দু ধর্মের অনুরাগী বঙ্কিম স্বাভাবিকভাবেই সেদিন হিন্দু জাতীয়তাবাদের উদ্বোধনের জন্যই চেষ্টা করেছিলেন। বাঙালি হিন্দু অভিজাতেরা বঙ্কিমের বক্তব্যকেই সেদিন আপন রূপে অনুভব করে-ছিলেন ও তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। মুসলিম অভিজাত সমাজের প্রভাবশালী অংশ তখনও বাঙলাদেশকে স্বদেশ বলে ভাবতে পারেনি। এমনকি বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের দিকেও বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা বাঙলা না উর্দু—এই প্রশ্ন নিয়ে তাঁদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক চলে। হিন্দু সমাজের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই এই আভিজাত্যবাদীদের মনোভাব উদার ছিল না।

বিশ শতকে মুসলমান লেখকদের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তা ছাড়া অসংগঠিত ভাবেও হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই বহু লেখক সাম্প্রদায়িকতার ভাবধারা প্রচার করতে থাকেন। বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রহিতের পর এই মনোভাব দ্রুত তীব্রতা লাভ করতে থাকে।

বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি ছিল ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি মুসল-মানদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান বাঙলার মুসলমান সমাজের মানস-পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তবে সামন্ত-যুগীয় ভাবধারা থেকে এই প্রতিষ্ঠান মুক্ত ছিল না।

কল্লোলের সমসাময়িক কালে ঢাকায় 'শিখা গোষ্ঠী' আত্মপ্রকাশ করে-ছিল। এই গোষ্ঠীর আদর্শ ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি'। এঁরা বিশেষভাবে কামাল আতাতুর্কের রাষ্ট্র বিপ্লবের আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এঁদের চিন্তাধারা ছিল সামন্তবাদের বিরোধী ও বুর্জোয়া আদর্শ অভিমুখী। কিন্তু তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এঁদের যাত্রা ছিল একান্ত নিঃসঙ্গ। 'বুদ্ধির মুক্তি'র মতবাদের পরিবর্তে বাঙলার শিক্ষিত মুসলমান সমাজ তখন ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল 'আত্মনিয়ন্ত্রণের মন্ত্রে'। এ জন্য তৎকালে তাঁরা সমাজে মোটেই প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। পাকি-স্তান আন্দোলনের সময় এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার সময় সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন সাহিত্যিকদেরই একচ্ছত্র প্রাধান্য ছিল পূর্ব বাঙলায়।

*   '   *   *

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকা গড়ে উঠল পূর্ব বাঙলার নতুন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিশেবে। পাকিস্তানের রাজনীতিতে ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তখন যাদের একচ্ছত্র আধিপত্য, তারা নিজেদের আদর্শ হিশেবে ইসলামের কথা প্রচার করলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের আদর্শ সাম্প্রদায়িকতা। ধর্মের নাম ব্যবহার করে নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য নগদ বৈষয়িক স্বার্থ হাসিল করাই ছিল তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

এই পরিবেশে কলকাতার হিন্দু লেখক-লেখিকাদের চেয়ে ঢাকার মুসলমান লেখক-লেখিকারা কম নন—এটা প্রমাণ করার নানা ধরনের উত্তেজনাকর আনুষ্ঠানিক প্রচেষ্টা ও সঙ্কীর্ণ বিকৃত চেতনা তখন একচ্ছত্র প্রাধান্য লাভ করেছিল। "পাকিস্তানের অভাব কি ভাই পাকিস্তানের অভাব কি" জাতীয় মানসিকতারই ছিল তখন রাজত্ব। সে-অবস্থায় এখানকার অভিজাত সমালোচকেরা সব মুসলমান লেখককেই উৎসাহিত করতেন, সাহিত্যের আসরে ইসলামের পতাকা হাতে যে-ই আসতেন তাঁকেই বাহবা দেয়া হত। ইসলামের পতাকা প্রতারণার পতাকা কি-না, তা বিচার করে দেখার প্রয়োজন তখনও উল্লেখযোগ্যভাবে অনুভূত হয়নি। বাহবা দানটা ছিল মূলত কলকাতা-বিদ্বেষ প্রসূত এবং কোন পজিটিভ লক্ষ্যহীন। এই অবস্থায় যে-লেখক সৃজনশীল প্রতিভাব সম্ভাবনা নিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেন তাঁর সঙ্গে যিনি খ্যাতিলোভী অক্ষম লেখক তাঁর পার্থক্য চিহ্নিত হত না—রচনার উৎকর্ষ অনুৎকর্ষের কোন বিচার হত না। রাষ্ট্র-ক্ষমতায় যাঁরা আসীন ছিলেন—এই জাতীয় সাহিত্যই তাঁদের কাম্য ছিল, এ-গুলোকেই তাঁরা পৃষ্ঠপোষকতা দান করতেন। মুক্তবুদ্ধি ও মানব-তান্ত্রিক চিন্তা প্রকাশে যাঁরা অগ্রসব হতে চাইতেন, তাঁদের সম্ভাবনা ছিল ভারতের দালাল, কমিউনিস্ট ,কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহী বলে চিহ্নিত হওয়ার।

এই পরিবেশের বিরুদ্ধে ক্রমেই বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছিল। ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেই বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটে। ভাষা আন্দোলনের বাঁধ-ভাঙা স্রোত চরম নির্যাতন ও দমনমূলক ব্যবস্থার প্রাচীর ভেঙে তখনকার রুদ্ধশ্বাস অবস্থার সাময়িক অবসান ঘটিয়েছিল।

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাঙলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন একটি গতি লাভ করেছিল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুক্ত বুদ্ধি, মানবতান্ত্রিক চিন্তা ও বিজ্ঞান ভিত্তিক ইতিহাস-চেতনায় উদ্বুদ্ধ অনেক শিল্পী,

সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও সংস্কৃতিসেবী আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু ভাষা আন্দোলন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন মুক্তির সঠিক পথ ধরে যৌক্তিক পরিণতির দিকে আজও এগুতে পারেনি, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তেমনি তা আজও যৌক্তিক পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে পারেনি। ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাঙলার সাহিত্যে যে নতুনের ইঙ্গিত বহন করে এনে-ছিল, সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণের পথে অগ্রসর হতে না হতেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে তা হতাশার কালো অন্ধকারে নিমগ্ন হল। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে নতুন সাহিত্য ও সংস্কৃতি সেবীরা আত্ম-প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের রাজনৈতিক পরিপূরকেরা যখন ১৯৫৪ সনের নির্বাচনে জয়লাভ করেও পরাজিত হলেন, তখন আর ঐ সাহিত্য ও সংস্কৃতি-সেবীদের কোন আশ্রয়স্থল রইল না। 'তমদ্দুনপন্থী'দের সঙ্গে একই প্লাটফর্মে দাঁড়াতে হল তাঁদের। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির পর তাঁদের কর্মোদ্যম পীড়িত হল, ক্লান্ত হল, অবসিত হয়ে আসলো।

সামরিক শাসন ও স্বৈরতন্ত্রের অবসানকল্পে ১৯৬২ সাল থেকে দেশে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তাকে আদর্শহীন উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন ও কর্মসূচীহীন পথে অগ্রসর হতে দেখা গেছে। তার পাশাপাশি পূর্ব বাঙলার সাহিত্যকেও উদ্দেশহীন অভিযাত্রায় পা বাড়াতে দেখা গেছে এবং তার অসারতা প্রমাণিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে সমাজে আজ দেখা দিয়েছে গভীর হতাশা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব। ১৯৬২ সাল থেকে দেশে যখন আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে, তখন থেকে প্রগতিশীল লেখক-লেখিকা ও সংস্কৃতিসেবীদের উচিত ছিল তমদ্দুনপন্থীদের থেকে আলাদা হয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্য নিজস্ব স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। কিন্তু তা না করে যে-পথে তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন তা তো সম্পূর্ণই আত্মবিক্রয়ের পথ!

*　　　*　　　*

ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী পনের বছরের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করে নিঃসন্দেহে এ মন্তব্য করা যায় যে, ভাষা আন্দোলনকে যৌক্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত কোন শক্তি আজ পর্যন্ত পূর্ব বাঙলায় আত্মপ্রকাশ করেনি। দেশের জনগণের মন থেকে ভাষা আন্দো-লনের চেতনা আজও বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, বরং চাপা বিক্ষোভ জমে জমে সে চেতনা হয়েছে আরও প্রখর—আরও বলিষ্ঠ—আরও তীব্র। কিন্তু ইতিহাসকে

এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশে সেই চেতনাকে কাজে লাগাবার মত কোন প্রতিভা বা সংগঠন আমাদের দেশে, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কোন ক্ষেত্রেই আজও জন্ম নেয়নি। প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও তাদের পদলেহীরা কিছু দিন পর পর বিভিন্নভাবে পূর্ব বাঙলার সংস্কৃতির উপর আঘাত হানে, আর যাঁরা প্রগতিশীল বলে পরিচিত তাঁরা শুধু ঐ আঘাতের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার উদ্দেশে প্রতিবোধ সৃষ্টির চেষ্টা করেন; আঘাতের সম্ভাবনাকে চিরতরে নির্মূল করার কথা ভাবেন না। ফলে পূর্ব বাঙলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন ক্রমাগত একই অন্ধকাব আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে, মুক্তির পথ পাচ্ছে না।

যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে মানুষের জীবনে হতাশার অন্ধকার নেমে এল, তা যে অপরিবর্তনীয নয়—মানবিক চেষ্টা দ্বারা যে তার পরিবর্তন সম্ভব, এবং সে পরিবর্তন সাধন যে অপরিহার্য দাযিত্ব—এ কথা লেখকদের ধারণায় যেমন ধরা দেয়নি, সমালোচকদের ধারণায়ও তেমনি ধরা দেয়নি। ফলে লেখকেরা যেমন সকল দিক থেকে জীবনেব প্রতি না তাকিয়ে নিতান্ত উপস্থিত অস্থিরতায় বিচলিত হয়ে কেবলমাত্র জীবনের অন্ধকার দিককেই মহিমান্বিত করার সঙ্কীর্ণ চেষ্টায় লিপ্ত হলেন, সমালোচকেবাও তেমনি লেখকদের ভূমিকাকে যুগোপযোগী এবং অপরিবর্তনীয ধবে নিয়ে তার পশ্চাতে সমর্থন যোগালেন মাত্র।

অবস্থাব চাপেব কাছে আত্মসমর্পণ না করে এখনও যে মানুষ ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টায় নিয়োজিত আছে—এ চিত্র পূর্ব বাঙলার সাহিত্যে প্রায অনুপস্থিত। শ্রেণী উত্তরণের সঙ্কীর্ণ চিন্তা বিসর্জন দিয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ যে আজ মুক্তির নতুন পথের কথা ভাবছে এবং সে উদ্দেশে সংগ্রামে পা বাড়াচ্ছে—ব্যর্থ হচ্ছে, ব্যর্থতার গ্লানি ভুলে পুনরায় একই লক্ষ্য সামনে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং বার বার হোঁচট খাচ্ছে—এ চিত্রও পূর্ব বাঙলার সাহিত্যে অনুপস্থিত। পরিপূর্ণ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সাহসিকতার সঙ্গে আমাদের দেশের এখনকার জীবনের বাস্তব ভিত্তি ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় অন্তর্জীবনের সামগ্রিক চিত্র অবলোকন করেছেন, তার ঐতিহাসিক পটভূমি জানতে চেষ্টা করেছেন, এবং চিরন্তনের আকুতি নিয়ে তার শিল্পরূপ দান করতে প্রয়াসপর হয়েছেন তেমন সাহিত্য-শিল্পী গত একুশ বছরে একজনকেও আমরা দেখতে পাই না।

সমাজ ও জীবনের অনেক দিকই আমাদের সাহিত্যে চিত্রিত হয়নি এবং সে-সব বিষয়ের কথা সমালোচকেরাও একটুও উল্লেখ করেননি।

পুস্তকের প্রকাশনা অবশ্য উন্নত হয়েছে। পুস্তকের গুণগত মানের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন যখন অস্বীকৃত হল, তখন সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ হল কেবলমাত্র বহিরঙ্গ-সর্বস্ব সৌন্দর্যের প্রতি। পুস্তক হয়ে দাঁড়াল ধনিকের বৈঠকখানার সাজসজ্জা—কারুকার্য, আব ব্যবসায়ীর পুঁজি বিনি-য়োগের সামগ্রী। পুস্তক প্রকাশিত ও রচিত হতে থাকল নিছক ব্যবসায়িক প্রয়োজনে। পুস্তক প্রকাশনায় বহিরঙ্গ-সর্বস্ব সৌন্দর্যের এই অবাধ প্রতি-যোগিতার ফলে অচিরেই পুস্তক ব্যবসায় একচেটে পুঁজির করায়ত্ত হতে চলেছে এবং এতে প্রকাশনা সংস্থার নিতান্তই করুণার পাত্রে পরিণত হতে হচ্ছে লেখককে।

*　　　　*　　　　*

শোনা যায় চীনের তরুণ সমাজ একদা আফিমে আসক্ত হয়ে নেশাগ্রস্ত জীবন যাপন করত এবং তখন তারা শিল্প-সাহিত্য দর্শন-বিজ্ঞান সমাজতত্ত্ব রাজনীতি—প্রভৃতি বিষযেব চর্চা থেকে দূরে সরে থাকত। সাম্রাজ্য-বাদীরা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশে চীনের যুব-সমাজকে আফিম খাওযায় উৎসাহিত করেছিল এবং চীনের প্রতিক্রিয়াশীলেরা, সামন্ত প্রভুরা, ও ধনিকেরা নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থে—সাম্রাজ্যবাদীদেব উচ্ছিষ্ট লাভের লোভে—সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল; ফলে চীনের জনগণ তখন একটি মেরুদণ্ডহীন জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

এখন যুগের পরিবর্তন হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীরা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন নতুন অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তেমনি তারা এখন নতুন ষড়যন্ত্র আঁটছে। আমার মনে হয়, সাম্রাজ্যবাদীরা যে উদ্দেশ্যে সে-দিন চীনের যুব-সমাজের মধ্যে আফিমের প্রচলন ঘটিয়েছিল, সেই একই উদ্দেশ্যে আজ তারা বিশেষ ধরনের চলচ্চিত্র নির্মান করছে এবং প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে সেগুলো পরিবেশন করছে। হলিউডি চলচ্চিত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যুব-সমাজের—তরুণদের—জীবনের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য-চেতনার বিকৃতি সাধন, প্রতি মুহূর্তে তাদেবকে যৌন উত্তেজনায় উত্তপ্ত কবে রাখা, যৌবনের প্রারম্ভেই তাদেরকে বিকৃত পঙ্গু পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও বার্ধক্যজীর্ণ করে তোলা এবং তাদের অন্তঃস্থিত মহৎ মানবিক গুণাবলীর মৃত্যু ঘটানো;

কারণ তা হলেই তারা রাজনীতি সাহিত্য দর্শন প্রভৃতির চর্চা থেকে দূরে সরে থাকবে এবং কোন দিন সাম্রাজ্যবাদীদের ও তাদের পদলেহী দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের অন্যায় স্বার্থ হাসিলের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে না। চলচ্চিত্র সম্ভবত এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প-মাধ্যম। কিন্তু এই মাধ্যম আজ ব্যবহৃত হচ্ছে শিল্পের নামে মানুষকে প্রতারিত করার সবচেয়ে সক্রিয় কার্যকর বৃহদায়তন ব্যবস্থা হিশেবে।

বলা বাহুল্য, আমাদের দেশ আজ এই সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের করুণতম শিকারে পরিণত হয়েছে। বিশেষত আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী শাসক-চক্রের বিষাক্ত ছোবলের আঘাতে আমাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন তো বটেই, সাংস্কৃতিক জীবনও আজ ধর্ষিত, ক্ষত-বিক্ষত। দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলেরাও আজ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এবং তারাই হচ্ছে এ দেশে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি। হলিউডি মডেলের চল-চ্চিত্র এদেশেও আজ নির্মিত হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে প্রচারিত হচ্ছে একই আদর্শের পত্র-পত্রিকা—যেগুলোতে বিকৃত যৌন আবেদন পূর্ণ নগ্ন-অর্ধনগ্ন নারী-পুরুষের চিত্র একমাত্র আকর্ষণ। দেশের শিল্পী-সাহি-ত্যিকেরা—তথা সৃজনশীল ব্যক্তিরা—আজ এই অশুভ চক্রান্তের নিকট নিজেদের ভাড়া খাটাচ্ছেন—কেউ সজ্ঞানে—সচেতনভাবে, কেউ অজ্ঞানে—নিজের অজান্তে, কেউ বা অপারগ হয়ে—অসহায় অবস্থায় পড়ে। প্রতিক্রিয়াশীলদেব অনেক ধূর্ত পদলেহী এখনও প্রগতির মুখোশ এঁটে জনগণের শ্রদ্ধা অর্জনের হীন অপচেষ্টায় লিপ্ত। আর যাঁরা এই সব অপকৌশল সম্পর্কে সচেতন, তাঁদের সচেতনতাও আংশিক এবং দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডিত, কারণ এগুলো সম্পর্কে প্রচুর তথ্য অবগত হওয়ার চেষ্টা এবং এগুলোর বিরুদ্ধে কোন আপোশহীন বক্তব্য ও কর্মসূচী তাঁদের নেই।

এক দিকে আমাদের সৃজনশীল সাংস্কৃতিক বিকাশের সম্ভাবনাকে সাম্রাজ্যবাদ গ্রাস করে রেখেছে, অপর দিকে লোক-সংস্কৃতির নামে পুরোনো প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাতপদ সামন্তবাদী সংস্কৃতিকে বিকৃত রূপ দিয়ে আমাদের এ কালের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করার আনুষ্ঠানিক অপচেষ্টা চলছে। সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির প্রভাবে বিগত যুগের সামন্তবাদী সংস্কৃতিকে বিকৃত রূপ দিয়ে জনগণের জীবনেও বিকৃতি সৃষ্টি করে 'অভিজাত' ও 'অনভিজাত' সমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক সেতু নির্মাণের যে দানবিক অপচেষ্টা চলেছে, তা আজ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সাংস্কৃতিক বিকাশের পথকে রুদ্ধ

করে রেখেছে। যে-সব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রগতির দাবিদার, তারাও সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী প্রতিক্রিয়াশীলতার আশ্রয়েই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার অপচেষ্টা করছে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে স্বকীয়তার কোন চিহ্নই তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে আজও পরিস্ফুট হয়ে উঠেনি। বিভিন্ন মহল থেকে অনেক বড় বড় কথা উচ্চারিত হয়ে থাকলেও সুখী সুন্দর জীবন প্রতিষ্ঠার ও সমাজকে পূর্ণতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আদর্শে অটল থেকে জনগণের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের কোন আপোশহীন আন্তরিক প্রচেষ্টাই আজ পর্যন্ত এ দেশে লক্ষিত হয়নি।

* * *

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে নতুন সাহিত্যিকেরা আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা আন্তরিকভাবে সাহিত্য স্থষ্টিতে নিয়োজিত রয়েছেন, তাঁদের রচনা লক্ষ্য করলে দেখা যায় তিরিশের কবিদের নৈরাশ্যই তাঁদের অবলম্বন। কল্লোলের ও কল্লোলের ধারায় আগত পশ্চিম বাঙলার অন্যান্য লেখকদের চেয়ে তাঁরা এক পা-ও অগ্রসর হতে পারেননি। তমুদ্দনপন্থীদের সঙ্গে তুলনায় তাঁদের ধ্যান-ধারণাকে প্রগতিশীল বলে মনে হলেও আজকের দুনিয়াব প্রগতিশীল স্রোত থেকে তাঁরা একান্তই বিচ্ছিন্ন। তা-ছাড়া ব্যাপ্ত স্বদেশের বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গেও তাঁদের কোন প্রকার সংযোগসূত্র নেই।

নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের ধারায় পাকিস্তানোত্তর কালে পূর্ব বাঙলায় উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য-প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। এ-ধারায় তরুণদের দ্বারা বিক্ষিপ্তভাবে সামান্য যা কিছু রচিত হয়েছে, তা কখনও উল্লেখযোগ্য দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়নি।

কল্লোল গোষ্ঠী বাঙলা সাহিত্যে নবযুগ স্ষ্টির যে চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিল, বর্তমান দশকের গোড়ার দিকে পূর্ব বাঙলার অভিজাত সাহিত্যের অঙ্গনে একদল তরুণ পুনরায় সে চেষ্টায় অগ্রসর হয়েছিলেন। কল্লোলের মত তাঁদের প্রচেষ্টা বহিঃপ্রভাবজাত হওয়ার কথা নয়; কারণ কালের ব্যবধানে ঘটনা প্রবাহের আবর্তে পূর্ব বাঙলার অভিজাত শ্রেণী সত্য সত্যই এখন সঙ্কটের সম্মুখীন এবং এই শ্রেণী এখন এমন একটা পরিণতিতে এসে পেঁীচেছে যে স্বাভাবিক উপায়ে এর অবস্থান ও অস্তিত্ব বজায় রাখার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে। এই শ্রেণীর সাহিত্যের অবস্থাও তেমনি। আলোচ্য তরুণেরা বাঙলা সাহিত্যে নতুন যুগ প্রবর্তন করছেন বলে যেসব কথা ঘোষণা

করেছিলেন, তা এখনও অনেকের নিকট আলোচনার বস্তু। কিন্তু তাঁরা নিজেরা যত গুরুত্ব দিয়ে যত উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করেই তাঁদের ঘোষণা প্রচার করে থাকুন না কেন, আসলে আজ পর্যন্ত তাঁরা মধুসূদনের সময় থেকে বাঙলা সাহিত্যে যে-যুগের সূচনা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ যে যুগের শ্রেষ্ঠ ফসল এবং কল্লোল গোষ্ঠী যে-যুগের অবসান ঘটাতে গিয়ে আসলে একই স্রোতে আবর্তিত হয়েছিল, সেই যুগের স্রোতেই অবগাহন করছেন। হুবহু কল্লোল গোষ্ঠীর মতই তাঁদের অভিযাত্রা, খুব বেশি প্রভাবিত তাঁরা কল্লোল গোষ্ঠী দ্বারা। তাঁদের অনুসন্ধিৎসা কি, তাঁরা কি করতে চান, কি বলতে চান, পাঠককে কি বোঝাতে চান, মানুষকে কি জানাতে চান, পৃথিবীর প্রতি কি তাঁদের আবেদন—তা তাঁদের নিজেদের কাছেও স্পষ্ট নয় এবং এ-সব ব্যাপারে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা-তাড়িত বলেও মনে হয় না। তাঁদের ভূমিকায় প্রগতির লক্ষণ এটুকুই যে, আজ যখন নতুন সৃষ্টির প্রয়োজনে সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে প্রচলিত পুরোনোকে অতীতের গর্ভে—মিউজিয়মের অন্ধকার কক্ষে—নির্বাসিত করার প্রয়োজন অপরিহার্য, তখন তাঁরা লক্ষ্যহীন-ভাবে হলেও সে কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন। তবে প্রচলিত ধারাকে ভাঙার জন্য যে বলিষ্ঠতা প্রয়োজন, তা যেন হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত একবার মাত্র একটু চমক লাগিয়ে দিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে—হয়তো তাঁদের লক্ষ্যহীনতার জন্যই। প্রচলিত ধারাকে ভাঙার প্রয়োজন আজও অসমাপ্ত, আর বাস্তব প্রয়োজনে নতুনের আবির্ভাবও আজ অবশ্যম্ভাবী। এ অবস্থায় নতুন সৃষ্টির অভিপ্রায়ে প্রচলিত সবকিছুকে অতীতের গর্ভে নির্বাসিত করার দুঃসাহসিক ও দুঃসাধ্য কাজে নিয়োজিত হলে এবং একটি পজিটিভ লক্ষ্যের অনুসন্ধানে ব্রতী হলে তাঁরা প্রগতিশীলতার পরিচয় দেবেন এবং এই ভূমিকায় তাঁদের সামনে সৃষ্টির সম্ভাবনা অফুরন্ত।

[চার]

পূর্ব বাঙলার সাহিত্য-পরিবেশের পরিবর্তন সাধন করতে হবে—আমূল পরিবর্তন। পরিবেশ না পাল্টালে সঙ্কটের অবসান ঘটবে না।

বাঙলা সাহিত্যে নতুন যুগ প্রবর্তনের উদ্দেশে কল্লোল গোষ্ঠী ও 'স্যাড জেনারেশন'--এর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে থাকলেও, বিশেষত 'স্যাড জেনারেশন'-এর প্রচেষ্টার ফলে পূর্ব বাঙলার অভিজাত সাহিত্যের অঙ্গনে বর্তমানে এমন একটি সামাজিক মনোভূমি প্রস্তুত হয়েছে যে সাম্রাজ্যবাদী,

সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী ও অবিশ্বাসবাদী ধ্যানধারণার মোহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে তরুণ ও প্রতিভাবানেরা জীবনের অন্তর্নিহিত শিল্পানুসন্ধিৎসা ও সত্যানুসন্ধিৎসাকে চরিতার্থ করার সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে সম্ভবত এখন আসন্ন নতুন যুগের সাহিত্যের গোড়া পত্তন করতে পারেন। কিন্তু নতুন যুগের সাহিত্যের গোড়া পত্তন করতে হলে বিগত যুগের ভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হলে কোন ফল হবে না। নতুন যুগের সাহিত্যের গোড়া পত্তন করতে হলে অবশ্যই তাঁদের শ্রেণীগত ভূমিকা বদলাতে হবে এবং বিগত যুগের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে এ-যুগের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। ঘুণে-ধরা অভিজাত শ্রেণী ত্যাগ করে লেখককে—কবিকে —নেমে আসতে হবে জনগণের ভূমিকায়। শোষকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে শোষিত মানুষের কল্যাণের কথা বললে তা যেমন হাস্যাস্পদ হয়, তেমনি অভিজাত শ্রেণীর আশা-আকাঙক্ষা হৃদয়ে লালন করে মানবতার মহিমা কীর্তন করলে, যত ধূর্ত কৌশলেরই আশ্রয় গ্রহণ করা হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তা হাস্যাস্পদ হয়ে উঠে।

আজ বাঙলা সাহিত্যে নতুন যুগের প্রবর্তনে যে-তরুণেরা আন্তরিকভাবে উৎসাহী তাঁদের প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে, বাঙলা সাহিত্যের যে যুগ মধুসূদনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে, রবীন্দ্রনাথ যে যুগের শ্রেষ্ঠতম ফসল, যে যুগের অবসান ঘটাতে গিয়ে কল্লোলের প্রচেষ্টা পুরোনোর অনুবর্তনে গিয়েই শেষ হয়েছে, সে যুগের স্বরূপকে স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করা ; যে বাস্তব সামাজিক ভিত্তি বাঙলা সাহিত্যের সে যুগের জন্ম দিয়েছিল তা উপলব্ধি করা ; এবং সে যুগের মূলোৎপাটনের ও নতুন যুগের গোড়া পত্তনের কাজ এক সঙ্গে চালানো। বর্তমানের বক্ষ থেকে প্রচলিত ধারার মূলোৎপাটন করে তাকে অতীতের গর্ভে—মিউজিয়মের অন্ধকার কক্ষে—নির্বাসিত করতে না পারলে নতুন ধারার বিকাশের পথ নিষ্কণ্টক হবে না। আমরা এখন এমন একটা সময়ে আছি যখন সত্য সত্যই পুরোনোর সঙ্গে নতুনের কোন আপোশ হওয়া উচিত নয়। বাঙলা সাহিত্যে নতুন যুগ প্রবর্তনের আন্তরিক তাগিদ যিনি বা যাঁরা এখন অনুভব করবেন, তিনি বা তাঁরা প্রচলিত পুরোনোর সঙ্গে আপোশহীন দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে বাধ্য হবেন। উনিশ শতকের স্বর্ণ যুগের পর বিগত কয়েক দশক ধরে বাঙলা সাহিত্য এক যুগসন্ধির মধ্য দিয়ে চলছে, এবং একটি যুগান্তরের সম্ভাবনা এখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আজ কিংবা কাল, যখনই হোক, বাঙলা সাহিত্যে সেই সাহিত্যিক কিংবা সাহিত্যিক-গোষ্ঠীই নবযুগ প্রবর্তন করতে পারবেন যিনি কিংবা যাঁরা সচেতনভাবে অথবা অসচেতনভাবে নতুন শ্রেণীগত ভূমিকা নিয়ে অগ্রসর হবেন এবং সেই সঙ্গে এ দেশের মানুষ হিশেবে কালের যাত্রার ধ্বনি শ্রবণ করে এ যুগের বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টি ও জীবন-দর্শন অনুভব করতে পারবেন, এবং আপোশহীনভাবে সকল প্রকার প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েও নিজের যাত্রাপথে অবিচল থাকবেন। এখন আমরা এমন একটা সময়ে আছি যখন আমাদের সাহিত্য ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিশেবে আমরা একজন 'ঈশ্বর গুপ্ত' ও একজন 'মধুসূদনে'র সাক্ষাত পাব। একজন হবেন নতুন ও পুরোনোর দ্বন্দ্বে বিচলিত, আর অপর জন হবেন একটি নতুন ঐতিহাসিক যুগের প্রবর্তক।

বাঙলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের যখন থেকে সূচনা, তখন থেকে বাঙলাদেশের কবি-সাহিত্যিকেরা কাদের জন্য সাহিত্য রচনা করেছেন?

এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে ১৮৩৫ সনে ভারতবর্ষে প্রবর্তিত শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের অন্যতম প্রণেতা ও তৎকালীন ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রিকার সম্পাদক মেকলের এই উক্তি থেকে: "আমাদের এখন যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এমন একটি শ্রেণী তৈরি করতে—যে শ্রেণীর সদস্যেরা হবে আমাদের এবং আমরা যে কোটি কোটি লোককে শাসন করছি সেই শাসিতদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানকারী; এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা হবে রক্তে ও রঙে ভারতীয় আর রুচিতে, মতে, নীতিতে ও বুদ্ধিতে ইংরেজ।" মেকলে প্রস্তাবিত এই শ্রেণী হচ্ছে ইতিপূর্বে আলোচিত ইংরেজ শাসকদের সহযোগী সামন্ত-বুর্জোয়া শ্রেণীরই একটি স্তর। ইংরেজ শাসকদের পদলেহী সামন্ত-বুর্জোয়া শ্রেণীর এই স্তরের—অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষিত অংশের সদস্যেরা পেশাগত দিক থেকে ছিলেন ডেপুটি, কেরানি, পুলিশ, শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী, চিকিৎসাজীবী, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী ইত্যাদি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনাকালে বাঙলাদেশের কবি-সাহিত্যিকেরা এই উদীয়মান শিক্ষিত সমাজের জন্যই সাহিত্য রচনার সূত্রপাত করেন।

শামসুর রাহমান তাঁর যে কবিতাটিতে 'কাদের জন্যে লিখবো ?'—এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, সে কবিতাটির অবশিষ্ট অংশ এবার পড়ে দেখা যাক :

ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার আর
মোক্তার আর রাজনীতিবিদ
আদার ব্যাপারী আর ব্যাঙ্কার
পেডেণ্ডো আর মিহি কলাবিদ
খুঁটবে আমার কাব্য !
তাদের জন্যে লিখবো এবং
তাদের জন্যে ভাববো '?
শকুন-উকিল আর ঘোর ঠিকাদার
আর নিধিরাম সর্দার আব
হুজুরের জী-হাঁ হুঁকোবরদার
বৈদ্য এবং বৈশ্য
ঘাঁটবে আমার প্রাণ-নিঙড়ানো
সাধেব অনেক শস্য !
তাদের জন্যে সকাল সন্ধ্যে
গাধার খাটুনি খাটবো ?
হঠাৎ আলোর ঝলকানি-লাগা
গরু দড়িটায় হাঁটবো ?

শামসুর রাহমান এখানে যাঁদের উদ্দেশ্যে লিখতে গিয়ে নিজের সাধনাকে 'গাধার খাটুনি' বলে অনুভব করেছেন, তাঁরা কারা ? তাঁরা হচ্ছে ইংবেজদের শাসন-শোষনের প্রয়োজন সৃষ্ট সেই সামন্ত-বুর্জোয়া শ্রেণীরই বর্তমান অংশের একটি স্তর, যে শ্রেণী একদা আঠাবো শতকে স্বদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে গিয়ে ইংরেজ বণিকদের নেতৃত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল ও দেশকে পরাধীনতার গ্লানিতে অভিশপ্ত করেছিল, যে-শ্রেণী ইংরেজ রাজত্বের সুদীর্ঘ এক শ নব্বই বছর ধরে ইংরেজ শাসকদের পদলেহন করেছে ও নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে দেশের সাধারণ মানুষের শ্রমার্জিত সম্পদ ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়েছে, যে-শ্রেণীর একাংশের রূপরেখা অঙ্কন করেছিলেন মেকলে, যে-শ্রেণীর কোন অংশই কোন দিন কোন আদর্শের পতাকাকে সমুন্নত করে আপোশহীনভাবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দানে সক্ষম হয়নি এবং যে শ্রেণীর কোন কোন অংশ মাঝে মাঝে প্রগতির পতাকা হাতে নিয়ে স্বেচ্ছায়

কিংবা অযোগ্যতার জন্য শেষ পর্যন্ত প্রগতিকে বাধা দিয়েছে—জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে এবং বিগত দুই দশক ধরে আপোশে নীরবে নিঃশব্দে নয়া উপনিবেশবাদী ষড়যন্ত্রের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে হাহাকার করছে ও আঞ্চলিক বৈষম্যের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে আত্মবিকাশের স্বপ্ন দেখছে।

বলা বাহুল্য, উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে বাঙলাদেশের লেখকেরা যে শ্রেণীতে অবস্থান করে যে শ্রেণীর জন্য লিখতেন, পূর্ব বাঙলার লেখকেরা আজও সেই শ্রেণীতে অবস্থান করে সেই শ্রেণীর জন্যই লিখে যাচ্ছেন। এখানকার লেখকেরা আজও সেই অবক্ষয়ক্লিষ্ট নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন সামন্ত-বুর্জোয়া শ্রেণীরই একটি অংশ রূপে অবস্থান করছেন, মাঝে মাঝে দোদুল্যচিত্ততার পরিচয় দিলেও কিছুতেই নিজেদের অবস্থান পরিবর্তনের কথা ভাবতে পারছেন না এবং সেই শ্রেণীর পাঠকদের জন্যই লিখছেন।

পূর্বোদ্ধৃত কবিতাটিতে শামসুর রাহমানের কবি-মানসের যে দ্বিধা ও সংশয়ের অভিব্যক্তি ঘটেছে, সে দ্বিধা ও সংশয় শামসুর রাহমানের একার নয়, পূর্ব বাঙলার অভিজাত মহলের কবি-সাহিত্যিকদের ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা আজ প্রগতিশীল বলে পরিচিত, তাঁদের সকলেরই। এমনকি যারা আজ সাহিত্যাঙ্গনে স্পষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছে তারাও দ্বিধামুক্ত নয়। সকলেই আজ দেশের বর্তমান অভিজাত শ্রেণীর ভবিষ্যত সম্পর্কে দারুণ সংশয় পোষণ করছেন, তবু এই শ্রেণীর উপর থেকে মোহ কাটাতে পারছেন না,—বিচ্যুত হতে পারছেন না এই শ্রেণী থেকে।

*   *   *

এই দ্বিধা থেকে মুক্ত হওয়ার সময় এসেছে এখন। 'কাদের জন্যে লিখবো? কাদের জন্যে কাজ করবো?'—এইসব প্রশ্নের সুস্পষ্ট সমাধান ছাড়া আমাদের দেশে শিল্প-সাহিত্য, দর্শন-বিজ্ঞান, রাজনীতি ও সমাজ-গঠন প্রভৃতি বিষয়কে সৃজনশীল পথে বিকশিত করা আজ অসম্ভব। ঐতিহাসিক পটভূমিতে আমাদের দেশের সমাজ-কাঠামোকে বিশ্লেষণ করে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সকল মানুষের ঐতিহাসিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করে আজ আমাদের ইতিহাসকে এগিয়ে নেওয়ার পথ স্থির করতে হবে—পথের বিঘ্নকে অতিক্রম করতে হবে। মুমূর্ষু অভিজাত শ্রেণীর মুষ্টিমেয় নাম-উঁচু বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে বাহবা লাভের মোহ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে আজ জনগণের দ্বারস্থ হতে হবে সকল সৃজনশীল প্রতিভাকে। ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে যারা সক্রিয়

এবং সহায়ক, জনগণ তারাই ; আর যারা ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে সক্রিয় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং ইতিহাসের গতিকে পশ্চাতাভিমুখী করে দিতে সচেষ্ট, সমাজ প্রবাহে তারা আবর্জনা—মানবতার তারা শত্রু।

ইংরেজরা এ দেশে যে সমাজ-কাঠামো সৃষ্টি করে দিয়ে গিয়েছিল ইংরেজদের বিদায় নেওয়ার পর কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও তার মূল কাঠামো আজও অপরিবর্তিত। এই কাঠামোতে সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনা যেমন আজ সমাপ্ত হয়ে এসেছে, তেমনি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সম্ভাবনাও আজ বিলুপ্ত। পাঁচাগলা-ঘুণেধরা এই সমাজ-ব্যবস্থাকে বরণ করে নিয়ে মানুষ আজ কেবলমাত্র অপচয়ী জীবনই যাপন করতে পারে—আত্মঘাতী পথেই চলতে পারে। এই সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে কায়েমী স্বার্থবাদী মহল সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে তাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে--এমন ধারণা যাঁরা পোষণ করেন তাঁরা আহাম্মকের স্বর্গে বাস করেন ; আর বুদ্ধিজীবী সমাজের যে অংশ আজ সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে এদের সাহায্য করেন তাঁরা মানবতার শত্রু-দের হাতকেই শক্তিশালী করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও একথা সত্য যে, পূর্ব বাঙলার বুদ্ধিজীবীদের কোন অংশই আজও এ সম্পর্কে সচেতন হয়ে কোন স্পষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেননি। ফলে তাঁরা নিজেরাও সমাজ-ব্যবস্থার শিকারে পরিণত হয়েছেন, অবস্থার দাসত্বকে বরণ করে নিয়েছেন, এবং উত্তর পুরুষদের জন্যও একই ভাগ্য বরণের ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন। মানুষ যে কখনও কখনও অবস্থার প্রভুও হতে পারে—এ কথা তাঁরা ভাবতে পারছেন না।

উনিশ শতকে এই ভূখণ্ডের সমাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে যে শিক্ষিতেরা ছিল সমাজের উদীয়মান শক্তি—বিকাশমান শক্তি, দেড়-শতাধিক বৎসরের ব্যবধানে বিকাশের চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করার পর তারা আজ ক্ষয়িষ্ণু—মুমূর্ষু শক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং বর্তমান সামাজিক অবস্থানে তাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে, এখন ইতিহাসের মঞ্চ থেকে তাদের বিদায় নেবার পালা। তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকদেরও বিদায়ের ঘণ্টা-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সিফিলিসাক্রান্ত বারবণিতাদের মতই পদলেহী, সুবিধালোভী, আত্মবিক্রীত, বন্দিবিবেক, বুদ্ধিজীবীরা আজ সমাজ প্রগতির পথে আবর্জনা। স্বার্থলোভী চরিত্রহীন রাজনীতিকেরা ও

স্বর্ণলোভী ধনিকেরা যেমন আজ সমাজ প্রগতির সকল পথ বন্ধ করে দিয়ে কেবলমাত্র শ্রেণীস্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত, তেমনি সুবিধালোভী শিক্ষিতেরাও আজ মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র শাসক-শোষকদের উচ্ছিষ্ট লাভের আশায় প্রতিমুহূর্তে লালায়িত। ব্যাধিগ্রস্ত বারবণিতাদের মতই তাদের মন শুকিয়ে মরে গেছে, দেহ শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। ওই মন আজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ্যা, ওতে আবাদ করতে চাইলে চেষ্টা ব্যর্থ হবে, ওতে ফসল ফলবে না, ফুল ফুটবে না, ফল ধরবে না। ওই মনে কোন প্রকার জীবন-জিজ্ঞাসা, নীতি-জিজ্ঞাসা, সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসা ও মূল্য-জিজ্ঞাসাই আজ আর অবশিষ্ট নেই। সুতরাং ওর উদ্দেশে যত উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করেই আবেদন জানানো হোক না কেন, সকল আবেদন ব্যর্থ হতে বাধ্য। সর্বাপেক্ষা অধিক আন্তরিকতা নিয়ে যিনি আবেদন জানাতে যাবেন, তাঁর কাছেও এক সময় মনে হবে "আমার জীবন যেন সীমাহীন অরণ্যে রোদন"।

চৈতন্যহীন হৃদয়হীন বুদ্ধিহীন আবেগ-অনুভূতিহীন চরিত্রহীন পদলেহী উচ্ছিষ্টলোভী সুবিধালোভী মেরুদণ্ডহীন আত্মবিক্রিত অন্তঃসারশূন্য তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের জন্য সাহিত্য রচনা করতে গেলে লেখককেও অবশ্যই চৈতন্যহীন হৃদয়হীন বুদ্ধিহীন...হতে হবে এবং সকল প্রকার সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসা জীবন-জিজ্ঞাসা নীতি-জিজ্ঞাসা ও মূল্যের বোধ মন থেকে মুছে ফেলে দিয়ে 'শিল্প শিল্পের জন্যই'—এই স্লোগান তুলতে হবে।

* * *

মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্যের অভিজাত কবিরা সাহিত্য রচনা করতেন রাজরাজড়া ও সামন্ত প্রভুদের জন্য। সামন্তবাদী সমাজ-ব্যবস্থা ও তার আদর্শ যেমন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রায় অপরিবর্তিত ছিল, সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যও তখন তেমনি সুদীর্ঘ কাল ধরে প্রায় অপরিবর্তিত ছিল।

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের রচয়িতারা পুরোনো সামন্ত শ্রেণীর ধ্বংসাবশেষের উপর গড়ে-ওঠা ইংরেজ শাসকদের সহযোগী নতুন বাঙালি মধ্য শ্রেণী বা সামন্ত-বুর্জোয়া শ্রেণীর শিক্ষিত অংশের জন্য সাহিত্য রচনা করেছেন। এই শিক্ষিত সমাজের জীবন-পরিবেশ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই যুগের সাহিত্যেরও ঘটেছে বিবর্তন। তবু এই যুগের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যেই কতকগুলো বৈশিষ্ট্য সাধারণ।

মধ্য যুগের বাঙলা সাহিত্য ও ইংরেজ আমলের বাঙলা সাহিত্য গুণগতভাবে—চরিত্রগতভাবে পৃথক। এই পার্থক্যের কারণ কি শুধু এই যে,

এই দুই যুগের সাহিত্যিকদের ব্যক্তি-প্রতিভা ভিন্ন প্রকৃতির? আমার ধারণা, তা নয়। ব্যক্তি-প্রতিভার পার্থক্যের মধ্যে এর কারণ খুঁজতে গেলে ভুল হবে। এই পার্থক্যের কারণ সম্পূর্ণই ঐতিহাসিক। এই দুই যুগের সাহিত্যিকদের সামনে যে দুই ধরনের পাঠক-সমাজ বিদ্যমান ছিল, তাদের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, আশা-আকাঙক্ষা, জীবনাবস্থা ইত্যাদি ছিল গুণ-গতভাবে পৃথক। এই পার্থক্যের জন্যই মধ্য যুগের রাজন্যবর্গ ও সামন্ত-বর্গের জন্য রচিত সাহিত্য থেকে আধুনিক যুগের শিক্ষিত শ্রেণীর জন্য রচিত সাহিত্য গুণগতভাবে পৃথক। এই দুই যুগের লেখকেরা দুই ভিন্ন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে দুই পৃথক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং স্বতন্ত্র দুই ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন হৃদয়ে অনুভব ও লালন করেছেন। তাঁদেব রচিত সাহিত্যও তাই দুটি পৃথক স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যবর্তী যুগসন্ধির সময়টাতে নতুন ও পুরাতন উভয় ধারাই পাশাপাশি অস্তিত্বশীল ছিল। তখন এই দুই ধারার মধ্যে যেমন পার্থক্য ছিল, তেমনি পার্থক্য ছিল এই দুই ধারার লেখক-পাঠক-শ্রোতাদের মধ্যেও।

আজকে আমাদের সাহিত্যে নবযুগের পত্তন ঘটাতে হলে উক্ত দৃষ্টান্ত আমাদের সহায়ক হতে পাবে। ইংরেজ আমলে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের পত্তন ঘটাতে গিয়ে নবযুগের লেখকেরা যেমন পুরোনো ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত শ্রেণীর পাঠক শ্রোতা পৃষ্ঠপোষকদের পরিত্যাগ করে নতুন-গড়ে-ওঠা মধ্য শ্রেণীব পাঠক-শ্রোতা-পৃষ্ঠপোষকদের শ্রেণীভুক্ত হয়েছিলেন, তেমনি আজ নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে পুনরায় বাঙলা সাহিত্যের আর একটি নব-যুগের পত্তন ঘটাতে হলেও প্রচলিত ক্ষয়িষ্ণু ধারার অবক্ষয়-ক্লিষ্ট লেখক-পাঠক-শ্রোতা-দর্শক-পৃষ্ঠপোষকদের থেকে নতুন লেখকদের বিচ্ছিন্ন হতে হবে ও আজকের নতুন উদীয়মান সামাজিক শ্রেণীর সঙ্গে নিজেদের আত্মিক সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

যাঁরা সাহিত্যে নবযুগের পত্তন ঘটাতে অভিলাষী তাঁদের পাঠক-শ্রোতা—দর্শক-পৃষ্ঠপোষক যদি পুরোনো হয় তাহলে নবযুগের ভাবধারা সম্বলিত তাঁদের রচনা কখনও সমাদৃত হবে না এবং সাহিত্য সাধনা তাঁদের কাছে অর্থহীন মনে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন ধারণা করা নিতান্তই ভুল হবে যে, নবযুগের উপযোগী পাঠক-শ্রোতা-দর্শক-পৃষ্ঠপোষক আপনিতেই গড়ে উঠবে এবং তার জন্য লেখকদের কোন ভূমিকা গ্রহণের প্রয়োজন নেই।

আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থাতে সামন্ত-বুর্জোয়া শ্রেণী এবং ঐ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা ও শিক্ষিতেরা এখন ক্ষয়িষ্ণুতার শেষ সীমায় পেঁাছে গেছে। এখনকার উদীয়মান শক্তি হচ্ছে শ্রমিক-কৃষকেরা। সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা যত পেছনেই পড়ে থাক না কেন, তারা যে আজ আমাদের সমাজের উদীয়মান শক্তি—দীর্ঘকাল তারা যে আর বঞ্চনা, শোষণ, নিপীড়ন ও অবিচার সহ্য করবে না—তা এতই স্পষ্ট যে তার জন্য দীর্ঘ আলোচনার দরকার হয় না।

আজকের এই উদীয়মান শক্তির জন্যই—অর্থাৎ শ্রমিক-কৃষক জনতার জন্যই আমাদের সৃজনশীল লেখকদের লিখতে হবে—তাদের মধ্যকার সুপ্ত শক্তির বিকাশ সাধনের পথকে উন্মুক্ত করার জন্যই সকল ক্ষেত্রের সৃজনশীল প্রতিভাবানদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। বাঙলা সাহিত্যের এই যুগ হবে বর্তমান যুগ থেকে গুণগতভাবে পৃথক—বর্তমান ধারার সঙ্গে এই ধারার ব্যবধান হবে একটি সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক যুগের ব্যবধান। নতুন ধারার লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গিও হবে সম্পূর্ণ নতুন। শ্রমিক-কৃষক জনতার জন্য লিখলেই তা নতুন যুগের সাহিত্য হবে না। আজ আমাদের দেশের সাহিত্যে যে বিকৃত ও হতাশাক্লিষ্ট সামন্তবাদী পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী যুগের জীবনভাবনা অভিব্যক্তি লাভ করছে, তাকে যদি জনগণের ভাষায় সহজ করে লিখে জনগণের মধ্যে প্রচার করা হয়, তাহলে তা কখনও এ যুগের নতুন সাহিত্য হবে না। নতুন ধারার সাহিত্য তখনই হবে, যখন সে সাহিত্যে শ্রমিক-কৃষকের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জীবন-ভাবনা রূপায়িত হবে—বিধৃত হবে তাদের জীবনের বাস্তব ভিত্তি ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় অন্তর্জীবন এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনা। কিন্তু কবি বা শিল্পী যদি বুর্জোয়া কিংবা পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকায় দাঁড়িয়ে এবং সে-সব শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে লালন করে এই সাহিত্য রচনা করেন তবে তা নবযুগের সাহিত্য হবে না। নবযুগের সাহিত্য রচনা করতে হলে অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে শ্রমজীবী মানুষের জীবনকে এবং গ্রহণ করতে হবে শ্রমিক-কৃষক-জনতার শ্রেণীগত ভূমিকা। বুঝতে চায়, জানতে চায়, তর্ক করতে চায়, বিদ্রোহ করতে চায় এমন সর্বহারা শ্রমজীবীর

জীবন-ভাবনা ও বিশ্বদৃষ্টিকে আয়ত্ত করতে হবে লেখকের। আজ সকল প্রকার বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া মোহ সংশয় দ্বিধা ও দোদুল্যচিত্ততা থেকে মুক্ত হয়ে গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যে প্রতিভাবান এই নতুন বিশ্বদৃষ্টি নিয়ে শ্রমিক কৃষক জনতার জন্য সাহিত্য রচনায় নিয়োজিত হবেন—নিজের উন্নত চিন্তা ও উচ্চতর জ্ঞান নিয়ে শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণীগত ভূমিকা গ্রহণ করে তাদের জন্য সাহিত্য রচনা করবেন, তিনিই বাঙলা সাহিত্যে এখন নতুন যুগের সূচনা করবেন। শ্রমিক কৃষক—তথা সমাজের নীচের তলার মানুষের জীবন নিয়ে আমাদের দেশে সাহিত্য রচনা কম হয়নি; কিন্তু সেসব লেখাতে লেখকেরা সামন্ত-বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন, তাই সেগুলো দ্বারা এ যুগেব নতুন সাহিত্যের সূত্রপাত হয়নি।

রাজনীতির বেলায়ও একই কথা: বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকায় দাঁড়িয়ে সংস্কারবাদী, ভাববাদী কিংবা বদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে শ্রমিক-কৃষক-জনতার বিপ্লবী রাজনীতির কথা বললে তা হয় প্রকৃতপক্ষে প্রগতির মুখোশ এঁটে বুর্জোয়া শ্রেণীর লেজুড়বৃত্তি করা, কিংবা জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কবা।

*　　　*　　　*

শ্রমিক-কৃষক-জনতাব জন্য সাহিত্য রচনাব কথা বলাতে অনেকে আঁতকে উঠবেন। ভাববেন: শ্রমিক-কৃষক-জনতার জন্য সাহিত্য! তা কি করে সম্ভব? শ্রমিক-কৃষক-জনতা তো অশিক্ষিত! তারা পড়বে কেমন করে? বুঝবেই বা কি? তাদের তো কোন রসবোধ নেই! তারা সাহিত্যকে গ্রহণ করবে কেমন করে?

এই ধরনেব আরও বহু প্রশ্ন হয়তো উত্থাপিত হবে।

এইসব প্রশ্নের জবাবে বলতে পারি: আমাদের দেশের শ্রমিক-কৃষক-জনতা আজ অশিক্ষিত, তার কারণ শিক্ষার সুযোগ তাদের নেই। সামন্ত-বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থেই তাদেরকে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত করে রাখা হয়েছে। দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয়েছে সামন্ত-বুর্জোয়া ও আমলাদের স্বার্থে। এ-ব্যবস্থায় নগদ টাকা দিয়ে শিক্ষা কিনতে হয়। বিত্তহীন ও নিম্নবিত্তদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষালাভ এ-ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অসম্ভব। আর বিত্তবানদের সন্তান-সন্ততি প্রতিভাহীন, এমনকি নির্বোধ হলেও শিক্ষালাভের পরিপূর্ণ সুযোগ পায়। স্বদেশ ও বিদেশ থেকে বিভিন্ন উচ্চ

ডিগ্রী লাভ করে তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়। শ্রমিক-কৃষক-জনতার মধ্যে প্রতিভাবান কেউ জন্ম গ্রহণ করে না, কিংবা তাদের শিক্ষালাভের যোগ্যতা নেই—এ কথা যুক্তিহীন, উদ্ভট ও প্রতারণামূলক, এবং প্রকাশ্যে এ-কথা বলার মত বুকের পাটা হয়তো কোন আভিজাত্যবাদীরই নেই।

তাদের অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অজ্ঞতা সম্পর্কিত প্রশ্নের সমাধান হল: তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা। এই দায়িত্ব সৃজনশীল প্রতিভাবান লোক-দেরই আজ গ্রহণ করতে হবে। শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-রাজনীতি—সকল ক্ষেত্রের সৃজনশীল প্রতিভাবানদের বেলায়ই এ-কথা প্রযোজ্য। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় ও শিক্ষা-পদ্ধতির মাধ্যমে কিংবা সে-ব্যবস্থা ও পদ্ধতির সংস্কারের দ্বারা এ-উদ্দেশ সফল হবে না, এর জন্য ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। সমাজ পরিবর্তন ও নতুন জীবন প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী শিক্ষিতদের এগিয়ে যেতে হবে শ্রমিক কৃষক-জনতার কাছে, তাদের প্রকৃত অবস্থা তাদের কাছ থেকে জেনে তারপর তাদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের উদ্যোগ নিতে হবে। তা করতে না পারলে সামাজিক সঙ্কট আরও ভয়াবহ হবে—জীবনের অবস্থা আরও বিকৃত বীভৎস ও করুণ হবে। তার দুর্ভোগ ভুগতে হবে শ্রেণী নির্বিশেষে সকলকেই। অবশ্য সামগ্রিক সমস্যাটি সামাজিক ও রাজনৈতিক। তাই মূলত সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে সমস্যাটির সমাধানের কথাই ভাবতে হবে সকলকে।

শ্রমিক-কৃষক-জনতাকে শিক্ষিত করে তোলার কাজে—তাদের চিন্তা-ধারা পরিবর্তনের কাজে—শিল্পী-সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে যে-ধরনের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, শ্রমিক-কৃষক-জনতার সে ধরনেব শিক্ষার কোন প্রয়োজন অবশ্যই নেই। তাদেরকে দিতে হবে জীবন ও সমাজের প্রয়োজনীয় মনুষ্যত্বউদ্বোধক শিক্ষা। শিল্পী সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদদের এ-কাজে অগ্রসর হতে হবে। এ কাজে আত্মনিয়োগ করলে সে-চেষ্টা অর্থময় হবে। অন্যথায় সাহিত্যসাধনায় অগ্রসর হলে মনে বারবার প্রশ্ন জাগবে 'কাদের জন্যে লিখবো'। আমাদের সমাজে আজ একজন রবীন্দ্রনাথের চেয়ে একজন রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগরের প্রয়োজন অনেক বেশি।

শ্রমিক-কৃষক-জনতার রসবোধ আজও অমার্জিত, তাদের সাংস্কৃতিক মান অনেক নীচে—এ কথা সত্য। কিন্তু এর পশ্চাতেও তো কারণ

রয়েছে। যে-কারণে তারা শিক্ষিত হতে পারেনি, সেই কারণেই তাদের রসবোধ ও সাংস্কৃতিক মানেরও উন্নতি ঘটেনি। সমাজের শাসক-শোষক ও ভাগ্যবিধাতারা তাদেরকে যে অবস্থায় রেখেছে—যে ধবনের জীবন ধাবণের জন্য বাধ্য করছে--তাতে তাদের রস পিপাসা প্রকাশের ও সংস্কৃতি চর্চার অবকাশ কোথায়? অবস্থার চাপেই তাদের রস পিপাসা ও সাংস্কৃতিক বোধ অবদমিত হয়ে আছে কিংবা বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। অবস্থার এই চাপ থেকে —সমাজ ব্যবস্থার এই নিষ্পেষণ থেকে--তাদের মুক্ত করতে হবে। এই মুক্তি অর্জিত হলেই দেখা যাবে, তাদের রস-পিপাসা ও গ্রহণক্ষমতা অভিজাত শ্রেণীর আত্মবিক্রীত বুদ্ধিজীবী ও খ্যাতিলোভী কৃত্রিম সাহিত্যিক-দের চেয়ে অনেক উন্নত পর্যায়ের। তাদের মধ্য থেকে সৃজনক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিভাবানেরও আত্মপ্রকাশ ঘটবে তখন।

শ্রমিক-কৃষকেরা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পেছনে পড়ে আছে সত্য, কিন্তু তাদের মন আত্মবিক্রীত বুদ্ধিজীবীদের ও তাদের পৃষ্ঠপোষক হৃদয়হীন সামন্ত-বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা-সম্পন্ন লোকদের মনের মত বিশুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হয়নি। যদিও তারা পেছনে পড়ে আছে, তবু মনের সজীবতায়, প্রাণবন্ততায়, হৃদয়ানুভূতির সতেজতা ও গভীরতায়, অন্তঃসম্পদের সমৃদ্ধি ও প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় এবং মহত্ত্বর মানবিক গুণাবলীর ঐশ্বর্যে সমাজের অপর যে কোন অংশ থেকে তাবা আজ অধিকতর সম্ভাব-নাময়। তাদের জন্য শিল্প-সাহিত্য রচনা করতে গেলে কিংবা তাদের জন্য কাজ করতে গেলে তারা এখন যে স্তরে আছে সেই স্তরে নেমে গিয়েই আরম্ভ করতে হবে—এ-কথা সত্য। কিন্তু তারা যেহেতু আজ এ-সমাজের উদীয়মান শক্তি, তাই তাদের সাংস্কৃতিক মানকে উন্নত করে তোলা সম্ভব এবং সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করাই আমাদেব সমাজে আজকের সৃজনশীল ব্যক্তিদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব। পথেব বিঘ্নকে স্বীকার করে একটি পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চললে এ কাজ সমাধা করা অবশ্যই সম্ভব এবং ইতিহাসের নিযমে তা হওয়াই স্বাভাবিক।

শ্রমিক-কৃষক-জনতা শিক্ষিত হয়ে উঠলে এবং সাধারণভাবে তাদেব সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়ন ঘটলে সকল শ্রমিক-কৃষকই একই রকম সাহিত্যো-নুরাগী হয়ে উঠবে—এমন ধারণা অবশ্যই অবান্তর। তারা শিক্ষিত হয়ে উঠলে এবং সাধারণভাবে তাদের সাংস্কৃতিক মান উন্নত হলে তাদের মধ্য থেকে একটি সাহিত্যানুরাগী অংশ অবশ্যই আত্মপ্রকাশ করবে।

আমাদের দেশের প্রতিশ্রুতিশীল সৃজনশীল লেখকদের কি তা-হলে অভিজাত শ্রেণীর জন্য, সামন্ত-বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্য সাহিত্য রচনা করা অনুচিত? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়: সামাজিক ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর সকল অংশের সৃজনশক্তি আজও সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে যায়নি; সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর নিম্নতর ও নিম্নতম অংশের—পেটি-বুর্জোয়াদের—আজও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে; সুতরাং তাদের জন্যও সাহিত্য রচনা করতে হবে। তবে তাদের জন্য সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে লেখককে অবশ্যই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে অটল থাকতে হবে—শ্রেণীগত ভূমিকা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

বর্তমান ব্যবস্থায় শিক্ষা লাভ করে সারা দেশে গ্রামে ও শহরে বহু লোক আজ বেকার ও অর্ধবেকার অবস্থায় জীবন যাপন করছেন। এঁদের মধ্যে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী লোকের সংখ্যাও কম নয়। এঁরা পড়তে ইচ্ছুক, জানতে আগ্রহী, নিজেদের জীবনের অবস্থা পরিবর্তনে নানা ভাবে সচেষ্ট। কিন্তু আমাদের তথাকথিত অভিজাত কবি-ঔপন্যাসিক-গল্পকারেরা যেসব রচনা প্রকাশ করেন, তা তাঁদের জীবন-জিজ্ঞাসার মোটেই অনুকূল না হওয়াতে, আজও তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্রের উপন্যাস, জসীম-উদ্দীনের কবিতা কিংবা 'আনোয়ারা' 'আবদুল্লাহ্' জাতীয় রচনাতেই তাঁদের পাঠের পরিধিকে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হন। এই ধরনের পাঠকের সংখ্যা আমাদের দেশে বিরাট এবং ক্রমবর্ধমান। তাঁদের জীবন-জিজ্ঞাসা ও শিক্ষার উপযোগী করে নবযুগের ভাবধারা সম্বলিত পুস্তক প্রকাশ করা আজ একান্ত প্রয়োজন। উচ্চতর ভাবধারা দ্বারা তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে সমাজ-পরিবর্তনের বিরাট শক্তিতে পরিণত হতে পারেন তাঁরা। আন্তরিকভাবে এ পথে অগ্রসর হলে প্রতিভাবান শিল্পী-সাহিত্যিকেরা অবশ্যই সৃষ্টির নতুন নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন।

[পাঁচ]

আমাদের সমাজে মূল্য বিচারের—তথা ভালমন্দ নির্ণয়ের—প্রচলিত মানদণ্ড এখন আর কার্যকর থাকার যোগ্য নয়—একথা সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনের আর সব ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। কাজেই মূল্য বিচারের প্রচলিত মানদণ্ডকে ইতিহাসের অন্তর্গত করা, মিউজিয়মের বিষয়বস্তুতে পরিণত করা—সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ দেশে আজকের সমালোচকের ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

আমাদের সমাজে মূল্য বিচারের প্রচলিত মানদণ্ড কি? সাহিত্য-বিচারের মানদণ্ডই বা কি?

ধর্মীয় বিধিনিষেধই ছিল ব্যবহারিক জীবনে আমাদের দেশে মূল্য বিচারের মানদণ্ড। কিন্তু সমাজের প্রভাবশালী অংশ সে-মানদণ্ডকে আজ সম্পূর্ণই ত্যাগ করেছে। পক্ষান্তরে নতুন কোন মানদণ্ড তারা গ্রহণ করেনি। মানবিক মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ পদদলিত করে তারা যদৃচ্ছভাবে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা মেটাবার চেষ্টা করছে। অর্থলালসা ও ক্ষমতার লোভ তাদের অধিকাংশকে মানবিক গুণাবলী-বিবর্জিত মনুষ্যাকৃতি পশুতে পরিণত করেছে। অপরদিকে পুরোনো বিশ্বাসকে আজও যাঁরা আকড়ে ধরে আছেন, তাঁরা তাঁদের বিশ্বাসের কোন ভিত্তিই আজ আর বাস্তবে দেখতে পাচ্ছেন না। সর্বত্র তাঁরা বঞ্চিত, প্রতারিত ও নিষ্পেষিত। তাঁদের স্বার্থ সর্বত্র পদদলিত।

এই অবস্থা সম্পূর্ণই নৈরাজ্যজনক ও অনভিপ্রেত।

সাহিত্য ক্ষেত্রেও একটা মানদণ্ড ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা রবীন্দ্রনাথের অথবা তাঁদের সমকালীন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সাহিত্য-চিন্তার প্রতি লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র "বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন"-এ বলেছিলেন "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের ও মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।" রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চিন্তায় সুন্দর ও কল্যাণের সমন্বয়েরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়, আর সে-সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের নিজেরই সৃষ্টি। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর কালে সে মানদণ্ড অপসৃত হয়েছে। 'শিল্প শিল্পের জন্যই' 'চাই আনন্দের সাহিত্য' এইসব উক্তি উত্তরকালের সাহিত্যাঙ্গনে স্লোগানে পরিণত হয়েছে। অথচ আনন্দ কি, শিল্প কি, সাহিত্য কি—এ-সব প্রশ্নে কারও কোন স্পষ্ট বক্তব্য নেই।

এই অবস্থা একটা সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত নৈরাজ্যজনক অবস্থা। মূল্য বিচারের প্রচলিত মানদণ্ডকে ত্যাগ করে নতুন মানদণ্ডের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা কোন অবস্থাতেই উচিত হবে না। কারণ কোন না কোন মানদণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া ভাল-মন্দ নির্ণয়ের কোন উপায়ই থাকে না। আর ভালমন্দ নির্ণয় ও সুন্দর-কুৎসিতের ব্যবধান নিরূপন যে জীবনের

জন্য অত্যন্ত জরুরি, তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। মূল্যবিচারের একটা সাধারণ মানদণ্ড যদি সমাজে না থাকে এবং তার প্রয়োজন যদি সমাজে অস্বীকৃত হয়, তা-হলে মানুষের সহজাত মূল্যচেতনা তথা ভাল মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত, ও কল্যাণ-অকল্যাণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের অনুসন্ধিৎসা বিপর্যস্ত হয়। অবিশ্বাসবাদ বা নৈরাজ্যবাদ প্রাধান্য লাভ করে। অবিশ্বাসবাদীরা সকল ক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খলারই সৃষ্টি করতে পারে মাত্র। প্রচলিত বিশ্বাসকে অস্বীকার করে যারা নতুন বিশ্বাসের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়, কিংবা নতুন বিশ্বাসকে গ্রহণ করার জন্য যারা পুরোনো বিশ্বাসকে অস্বীকার করে, তারা অবিশ্বাসবাদী নয়। অবিশ্বাসবাদী তারাই, যারা মানবজীবনে বিশ্বাসের প্রয়োজনকে সর্বদা—সর্বথা—অস্বীকার করে ও উদ্দেশ্যহীনভাবে নৈরাশ্যকে আশ্রয় করে জীবন ধারণ করে। অবিশ্বাসবাদ কোন সুস্থ জীবনদর্শন নয়। —মানবজীবনের চিরন্তন অন্তর্নিহিত প্রবণতা বিশ্বাসের দিকে। কোন কারণে কারও জীবনে বিকৃতি ঘটলেই কেবল এই প্রবণতা বিলুপ্ত হতে পারে।

যাদের দৃষ্টিভঙ্গি সঙ্কীর্ণ,—জীবন-জগতের সামগ্রিক রূপ অবলোকন করতে যারা ভয় পায়, কিংবা যারা তাতে অক্ষম, সংগ্রাম ও সাফল্যকে—ত্যাগ ও ভোগকে যারা বিচ্ছিন্ন করে দেখে ও সংগ্রামের পথকে—ত্যাগের পথকে সচেতনভাবে এড়িয়ে গিয়ে যারা কেবল সংগ্রামবিহীন সাফল্য ও ত্যাগবিহীন ভোগের স্বপ্ন দেখে এবং পরের কাঁধে বন্দুক রেখে শিকার ধরতে চায়, জীবন তাদের চোখেই নিছক অন্ধকারময়। কিন্তু জীবনের প্রকৃত রূপ—সামগ্রিক রূপ—নিছক অন্ধকাবাচ্ছন্ন নয়; জীবনে দুঃখ, বেদনা, হতাশা, অপ্রাপ্তি, ক্লান্তি, অবসাদ, বিষাদ—প্রভৃতির সম্ভাবনা যেমন রয়েছে তেমনি সুখ, আনন্দ, আশা, প্রাপ্তি, প্রেম, প্রাচুর্য—প্রভৃতির সম্ভাবনাও রয়েছে। বিজ্ঞান-ভিত্তিক জীবন-দর্শনের অনুসন্ধান ও আশ্রয়ের অভাবে আমাদের দেশের সৃজনশীল পরিমণ্ডল আজ শূন্যতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী বলে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা পুরোনোকে অস্বীকার করেছেন, সেই সঙ্গে নতুনের অনুসন্ধিৎসার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছেন, নতুন বিশ্বাসে আজও তাঁরা উত্তরিত হতে পারেননি এবং উত্তরণের প্রয়াসও 'অভিজাত শ্রেণী'তে মোটামুটি অনুপস্থিত। এখানে বুদ্ধিজীবী মহলের প্রগতিশীল অংশ বলে যাঁরা পরিচিত, তাঁদের কর্ম ও জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে তাঁদের যে দর্শনের পরিচয়

মেলে, মোদ্দা কথায় তা অবিশ্বাসবাদ—প্রকৃতপক্ষে তা জীবনের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন মাত্র। এই অবিশ্বাসবাদ থেকেই শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'শিল্প শিল্পের জন্যই'—এ স্লোগান উঠেছিল। আমাদের দেশে এই স্লোগানটিই আজও শিল্প-সাহিত্যের মূল্য বিচারের মানদণ্ড। অবিশ্বাসবাদ যেমন জীবনের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপক একটি তত্ত্ব, তেমনি 'শিল্প শিল্পের জন্যই'—এই তত্ত্বও শিল্পের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপক তত্ত্ব। শিল্পের শিকড় জীবনের গভীরে—শিল্পের অস্তিত্ব জীবনের প্রয়োজনে; যে 'শিল্প' জীবন ও জীবনের বাস্তবভিত্তিকে অস্বীকার করে তাকে শিল্প বলে অভিহিত করলে শিল্প শব্দটির অপব্যবহার করা হয় মাত্র।

অবিশ্বাসবাদকে দর্শন হিশেবে গ্রহণ করে জীবন যাপন করতে গেলে জীবনে হতাশা, বিকৃতি ও অকাল-বার্ধক্য যেমন অনিবার্য, তেমনি 'শিল্প শিল্পের জন্যই'—এই জীবন-নিরপেক্ষ তত্ত্বকে আদর্শ হিশেবে গ্রহণ করে শিল্প রচনা করতে গেলে যা রচিত হবে তাও জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন হতে বাধ্য। পাঠক সে সে-সব রচনাকে বর্জন করবে—তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। অবিশ্বাসবাদীরা যেমন উদ্দেশহীনভাবে অকারণে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেন মাত্র, কলাকৈবল্যবাদীরাও তেমনি শিল্পকলার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র উদ্দেশহীন বিশৃঙখলার ও বিঘ্নেরই সৃষ্টি করছেন। আমাদের দেশে যাঁরা এখন 'শিল্প শিল্পের জন্যই' এই নীতির প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছেন বলে প্রকাশ করেছেন, কার্যত তাঁরাও এই নীতিই আজও অনুসরণ করে চলছেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের বহু বিচিত্র জীবনের প্রতি না তাকিয়ে তাঁরা শামুকের মত নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে রাখছেন, অথচ মানুষের কাছে তাঁদের প্রত্যাশা : মানুষ তাঁদের লেখা পড়ুক এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করুক। মানুষের কাছ থেকে তাঁদের কিছুই জানবার নেই—তাঁরা কেবল নিজেদেরকেই মানুষের কাছে জানাতে চান! অদ্ভুত তাঁদের আকাঙক্ষা! ফেরিওয়ালা সুলভ ছল-চাতুরির সঙ্গেই এর তুলনা হতে পারে মাত্র।

আমাদের সাহিত্যের বিকাশের সহায়তার জন্য সাহিত্য সমালোচনার একটি নতুন মানদণ্ড ও সেই মানদণ্ড অনুযায়ী যথার্থ সমালোচনার প্রয়োজন আজ প্রকট।

মানদণ্ড সম্পর্কে সংক্ষেপে এটাই বলা যায় যে, কোন সাহিত্যকর্মের মূল্য বিচারের বেলায় সব সময়ই দুটো দিকের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে: একটি সাহিত্যকর্মের অন্তঃস্থিত আদর্শগত বা বিষয়বস্তুগত দিক এবং অপরটি বহিরঙ্গের দিক বা শিল্প-কুশলতার দিক। আদর্শগত দিক বাদ দিয়ে কেবল শৈল্পিক দিক বিচার করলে সে সমালোচনা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে, আর শৈল্পিক দিক বাদ দিয়ে কেবলমাত্র আদর্শগত দিক বিচার করলে সে-সমালোচনা হয় অসম্পূর্ণ।

কোন বিশেষ আদর্শকে কোন ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারেন; কিন্তু সেই অস্বীকৃতির পরও তাঁর নতুন আদর্শ অনুসন্ধানের কিংবা ভিন্ন কোন আদর্শকে অবলম্বন করার প্রয়োজন থেকে যায়। প্রত্যেক শিল্পকর্মেই কোন না কোন আদর্শের কিংবা আদর্শ অনুসন্ধানের পরিচয় প্রকাশ পায়। যথার্থ শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু গুরুত্বহীন হতে পারে না, গতানুগতিকও হতে পারে না। কোন সাহিত্যকর্ম মহত্ত্বে ও সার্থকতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখনই যখন তার বিষয়বস্তু মানব জাতির কিংবা তার কোন অংশের পক্ষে কল্যাণকর কোন নতুন আদর্শের স্বতঃস্ফূর্ত অনুসন্ধিৎসাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ও তার শৈল্পিক প্রকাশ অভীষ্ট উদ্দেশ সাধনের উপযোগী হয়। শিল্পকর্মের মূল্য বিচারের সময় তার বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও তাৎপর্য নির্ণয় করতে হবে—লক্ষ্য করতে হবে তাতে বিধৃত স্পষ্ট কিংবা প্রচ্ছন্ন আদর্শের প্রতি। দেখতে হবে সেই আদর্শ প্রগতিশীল না রক্ষণশীল না প্রতিক্রিয়াশীল; প্রগতিশীল হলে তা কতখানি প্রগতিশীল—তাতে নতুনত্ব কতটুকু—রচয়িতার মৌলিকতা, সততা ও আন্তরিকতা কতটুকু—ইত্যাদি। তারপর দেখতে হবে শৈল্পিক নৈপুণ্য: দেখতে হবে রচয়িতা যা ব্যক্ত করতে চেয়েছেন তা যথাযথ ব্যক্ত করতে পেরেছেন কি-না, পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন কি-না, যে-মাধ্যম ও যে-সব কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন সেগুলো উপযোগী হয়েছে কি-না, রচনা-কৌশলে কোন অভিনবত্ব এসেছে কি-না, ইত্যাদি।

যে-সাহিত্য আদর্শগত দিক থেকে প্রতিক্রিয়াশীল অথচ শৈলিক বিচারে উৎকৃষ্ট, তা কখনও উৎকৃষ্ট সাহিত্য হিশেবে মর্যাদা লাভ করতে পারে না। সে-সাহিত্য বরং সমাজ ও জীবনের পক্ষে বেশি অকল্যাণকর, কারণ তা মানুষকে ভুল পথে বেশি আকৃষ্ট করতে পারে। অপরদিকে যে-সাহিত্য শৈল্পিক দিক থেকে নিকৃষ্ট অথচ আদর্শগত দিক থেকে প্রগতিশীল, তাও

উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। কারণ তার কোন আবেদন নেই।

শিল্পকর্মে আমাদের যা কাম্য তা হলো: শিল্পীর আন্তরিকতা আর প্রগতিশীল আদর্শ ও শৈল্পিক সৌন্দর্য এ-দুয়ের সার্থক সমন্বয়।

*　　　　*　　　　*

এই প্রবন্ধে যে বিষয়গুলো আলোচিত হল, তাতে অপূর্ণতা রয়েছে, ত্রুটি-বিচ্যুতিও রয়েছে। সহনশীলতার সঙ্গে বক্তব্যগুলোর উপর বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত হলে আমরা অনেক বিতর্কমূলক বিষয়ের সমাধান করতে পারব, এবং তার মধ্য দিয়ে হয়তো আমরা আমাদের সমাজের বর্তমান ক্রান্তিকালীন সংকটের হাত থেকে মুক্তির পথ নির্ধারণে সক্ষম হব।